শহীদুল জহিরের জীবন, তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্য
ও
প্রকরণ

মো. শরীফুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ফিল ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

গবেষণার শিরোনামঃ

শহীদুল জহিরের জীবন, তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রকরণ

গবেষক

মো. শরীফুল ইসলাম

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৫৬, শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা – ১১০০

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে শহীদুল জহির এক অসামান্য কথাকুশলীর নাম। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবন বাস্তবতার চূড়ান্ত রূপ বিচিত্র ক্যানভাসে ও রঙে অঙ্কন করে শহীদুল জহির বাংলাদেশের পরিবর্তমান ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন নিজের রচনাকর্মে; বিষয়-ভাষা ও করণকৌশলে ক্রমশ প্রমাণ করেছেন নিজের অনন্যতা। আখ্যানবয়নের অভিনবত্বই তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের সাম্প্রতিক ইতিহাসে। বস্তুত, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের অধুনাতর গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণের উপযুক্ত উপাদান মজুত আছে ভেবেই তাঁর কথাসাহিত্যকে এম.ফিল গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি আমি। শহীদুল জহিরের গল্প-উপন্যাস, এবং সাহিত্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও জীবনাভিজ্ঞতার সংশ্লেষ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে গবেষণা-প্রস্তাব প্রস্তুত করতে। বর্তমান অভিসন্দর্ভ সেই অনুপ্রাণনার ফসল।

তবে অভিসন্দর্ভ রচনাকালে ব্যক্তিগত আলস্য বারংবার লিখনক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করলেও আমার তত্ত্বধায়ক, পিতৃপ্রতিম অভিভাবক এবং পথনির্দেশক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন (গিয়াস শামীম) স্যারের সধৈর্য নির্দেশনা ও উৎসাহ শেষপর্যন্ত এর রচনাপর্ব সমাপ্ত করতে সহায়তা করেছে। স্যারের কাছে আমার যে ঋণ, দুই বাক্যের বর্ণনায় তা অসম্পূর্ণ। সোৎসাহে আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে করে আমাকে তিনি বাধিত করেছেন। এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শিক্ষক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী, ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, ড. সৈয়দ আজিজুল হক, ড. নুরুন্নাহার ফয়জের নেসা, ড. বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, ড. সৌমিত্র শেখর, ড. উপল তালুকদার, ড. হোসনে আরা, ড. মোহাম্মদ আজম, জনাব তারিক মন্‌জুর প্রমুখ শ্রদ্ধাভাজনের প্রতি, যাঁরা সর্বদাই গবেষণাকর্মের অগ্রগতি জানতে চেয়ে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে এগিয়ে দিয়েছেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি অধ্যাপক ড. সৈয়দ আকরম হোসেনকে, যিনি পরম প্রজ্ঞায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন অভিসন্দর্ভের শিরোনাম। আমার সাবেক কর্মস্থল ঢাকা সিটি কলেজের অধ্যাপক মইনুদ্দিন খালেদ, কাজলেন্দু দে ও পারভীন সুলতানার প্রতি কৃতজ্ঞতা কর্মস্থলের ব্যস্ততার মাঝেও গবেষণাকর্ম এগিয়ে নেবার তাড়না ও পরামর্শ প্রদানের জন্য। আন্তরিকভাবে স্মরণ করছি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষক ড. সেলিম মোজাহারের স্নেহসিক্ত ভালোবাসা ও দিকনির্দেশনা, জুনায়েদ আহমেদ হালিমের প্রেরণামূলক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহকর্মী ড. হোসনে আরা, ড. আরজুমন্দ

আরা বানু, ড. পারভীন আক্তার জেমী, ড. মাহবুবুল হক, ফজলে এলাহি চৌধুরী, শাহ মো. আরিফুল আবেদ ও জান্নাত আরা সোহেলীর প্রণোদনাসমূহকে; স্মরণ করছি পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক, বন্ধু বিপ্লব হুমায়ুন এবং কথাসাহিত্যিক বন্ধুবর খালিদ মারুফকে। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার পরিজন, বোন – শাহিদা আক্তার ও সুরভী আক্তার; অনুজপ্রতিম বন্ধু আক্তার হোসেন শাহিনের প্রতি – যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া গবেষণাকর্ম এগিয়ে নেয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিলো। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু শ্রাবণকে, সঙ্কটে ও সাফল্যে পাশে থাকার জন্য।

গবেষণাকর্ম চলাকালে আমি প্রধানত ব্যবহার করেছি আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরি, মইনুদ্দিন খালেদ ও ড. সেলিম মোজাহারের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা এবং আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. গিয়াস শামীমের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। আন্তরিকভাবে সবার ঋণ স্বীকার করছি। অসুস্থাবস্থায় থেকেও প্রতিটি সংশোধন চিহ্নিত করে দিয়ে গিয়াস শামীম স্যার যে অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখিয়েছেন, সে ঋণ শোধ হবার নয়। মুদ্রণের কাজে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজ সতীর্থ মো. হাসানুল হককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সবশেষে অনন্য কথাকার শহীদুল জহিরের প্রতি আমার এ-গবেষণা অভিসন্দর্ভটি শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করছি।

মো.শরীফুল ইসলাম

প্রস্তাবনা

একজন লেখক একজন জগৎ ও জীবনদ্রষ্টা শিল্পী। তিনি তাঁর সমকালে স্বকীয় দৃষ্টি নিয়ে অবলোকন করেন পরিপার্শ্ব; সেখানকার মানুষ, তাদের জীবন, প্রকৃতিপটে চিত্রিত জীবনছবি। অতঃপর তিনি তাঁর ক্যানভাসে রঙের তুলির আঁচড় কাটেন; তাতে মূর্ত হয়ে ওঠে মানুষের জীবনপ্রকৃতি; তাদের অনুভব-অনুভূতি। শিল্পীর স্বাভাবিক সহৃদয়সংবেদনগুণ সঞ্চারিত হয়ে একটি বিমূর্ত ভাবনাকে অন্যান্যের চিত্তসংবেদ্য করে তোলে। আর তাতেই সৃষ্টির অস্তিত্বের মহিমা প্রকাশিত হয় এবং পাঠক কিংবা দর্শকচিত্তে আলোড়ন তোলে অতঃপর। শিল্প ও শিল্পী সম্পর্কে তাদের আগ্রহী করে তোলে; ভবিষ্যতের লেখক বা পাঠকের কাছে এসে পৌঁছায় তার মূল্যায়নের দায়িত্ব। বর্তমান গবেষণা সেই দায়িত্ব পালনেরই ক্ষুদ্রপ্রয়াসমাত্র।

নিয়ত নির্জনতাপ্রয়াসী কথাকার শহীদুল জহির(১৯৫৩-২০০৮) জনজীবনের স্রোত থেকে পৃথক থেকেও সেই জীবনের আখ্যান রচনা করেই নিজের পর্যবেক্ষণপারঙ্গমতা, তার তীক্ষ্ণতা এবং বিস্তৃতিপরায়ণতার স্বাক্ষর রেখেছেন সেই সকল আখ্যানে। জনপ্রিয়ধারার আলোচনায় না এসেও শিল্পসৌকর্যের তুঙ্গস্পর্শী এই কথাসাহিত্যিক নিজেকে বাংলা কথাসাহিত্যের মূলধারার অন্যতম প্রধান শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর স্বল্পপ্রজ সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণাত্মক রীতিতে বর্তমান গবেষণাকর্মে উপস্থাপন করা হয়েছে। অধুনাপ্রয়াত কথাশিল্পী হওয়ায় গবেষণার জন্য উপাত্ত হিসেবে তাঁর মৌলিক রচনা ভিন্ন অন্য সূত্র বর্তমান গবেষকের কাছে অপ্রতুল মনে হয়েছে। ফলত তথ্য-উপাত্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রধানত লেখকের মূলগ্রন্থসমূহ। তবে মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সম্পাদিত ‘শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ’-ভুক্ত রচনাসমূহ প্রাসঙ্গিকতা ও যৌক্তিকতা-বিচারে গবেষণাকর্মে দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে দেখানো হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে; যেহেতু জহিরের প্রয়াণপরবর্তী বিভিন্ন আলোচনা এই বইটির মধ্যে সংকলিত এবং বাজারে সহজলভ্য। এছাড়াও বাংলাদেশে যারা শহীদুল জহির পাঠে আগ্রহী তাদের মৌখিক মন্তব্য এবং বিশ্লেষণাত্মক আবিষ্কার যথাযথ মূল্য দিয়ে প্রয়োজনবশত গ্রহণ করা হয়েছে।

একটি সরল বিন্যাসে বর্তমান গবেষণাকর্মের বিষয়সূচি সাজানো হয়েছে। গবেষণার শিরোনাম যেহেতু ‘শহীদুল জহিরের জীবন, তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রকরণ’, সেহেতু গবেষণাপত্র ব্যবস্থাপনায় প্রথমেই তাঁর জীবন, অতঃপর তাঁর কথাসাহিত্য– উপন্যাস ও ছোটগল্পের পরিচয় এবং পর্যায়ক্রমে উপন্যাসসমূহ এবং সেগুলোর বিষয়বৈচিত্র্য, ছোটগল্পের গ্রন্থসমূহ ও তাদের বিষয়বৈচিত্র্য; অতঃপর তাঁর কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত প্রকরণের বিস্তারিত আলোচনা অঙ্গীভূত করা হয়েছে।

যেকোনো মহৎ স্রষ্টার সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও নিহিতার্থ বহুকৌণিক; শহীদুল জহির তার ব্যতিক্রম নন। আপাতদৃষ্টে যে দৃশ্য সাধারণ মানুষের চিন্তালোকে নির্জলা অভিব্যক্তি জাগায়, শিল্পীর ছোঁয়ায় তা-ই হয়ে ওঠে বিস্ময় জাগানিয়া। শহীদুল জহির সে ধরনের শিল্পেরই স্রষ্টা। কার্যত তাঁর সৃষ্টি বিচার করে আজকের গবেষণায় যে তাৎপর্য বিশ্লেষিত হয়েছে, কালের পরিবর্তনে তা প্রতিনিয়ত নিত্যনব মাহাত্ম্যে উদ্ভাসিত হতে পারে। ফলে বর্তমান গবেষণাপ্রকল্প শহীদুল জহিরের রচনা-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শেষকথা নয়। কারণ শহীদুল জহিরের কথাসাহিত্য বিচিত্রমাত্রিক; তার তাৎপর্য সন্ধানের সীমিত প্রয়াস এ গবেষণাপ্রকল্প : 'শহীদুল জহিরের জীবন, তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রকরণ'।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
শহীদুল জহিরের জীবন	৭-১৪
দ্বিতীয় অধ্যায় শহীদুল জহির ও সমকালীন বাংলাদেশের কথাসাহিত্য	১৫-২০
তৃতীয় অধ্যায় শহীদুল জহিরের গল্প: প্রথমপর্যায় পারাপার : বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রকরণ	২১-৪৩
চতুর্থ অধ্যায় শহীদুল জহিরের গল্প: শেষপর্যায় ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প ***এবং*** ডলুনদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প :বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রকরণ	৪৪-৯১
পঞ্চম অধ্যায় শহীদুল জহিরের উপন্যাস : বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রকরণ জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা, আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু সে রাতে পূর্ণিমা ছিল ***এবং*** মুখের দিকে দেখি	৯২-১৪৪
উপসংহার	১৪৫-১৪৬
গ্রন্থপঞ্জি	১৪৭-১৫০

প্রথম অধ্যায়

শহীদুল জহিরের জীবন

বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক শহীদুল জহিরের জন্ম বর্তমান পুরান ঢাকার নারিন্দায়, ভজহরি স্ট্রিটের ৩৬ নম্বর বাড়িতে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর; জায়গাটি লোকমুখে প্রসিদ্ধ 'ভূতের গলি' নামে। পিতা এ কে নূরুল হক ও মাতা জাহানারা বেগমের নয় সন্তানের মধ্যে শহীদুল জহিরের অবস্থান দ্বিতীয়। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবার বড়ো।[১] সরকারি চাকুরে পিতা নূরুল হক ছিলেন সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন)। নিয়মিত বদল হতো তাঁর কর্মক্ষেত্র। সম্ভবত এই বদলির সূত্রেই তিনি ঢাকায় এসেছিলেন ১৯৫৮ সনে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সন্তানদের নিয়ে এখানেই বসবাস করার। এই মনস্কামনা সিদ্ধি করতেই তিনি ঢাকায় একটি স্থায়ী নিবাস গড়তে সক্ষম হয়েছিলেন, ঠিকানা অর্জন করেছিলেন ৩৩১/১ নয়াটোলা, বড় মগবাজার, ঢাকা ১২১৭ ; যদিও তাঁর স্থায়ী নিবাস সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানার হাশিল গ্রামে।

পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় এসেই শহীদুল জহিরের শিক্ষজীবন শুরু হয় ১৯৫৮ সনে, ভর্তি হন র‍্যাংকিন স্ট্রিটের সিলভারডেল কিন্ডারগার্টেনে; ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ সন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানেই তিনি স্ট্যান্ডার্ড-২ সম্পন্ন করে স্ট্যান্ডার্ড-৩ -এ ভর্তি হন ঐতিহ্যবাহী সেন্ট যোশেফ টেকনিক্যাল স্কুলে ১৯৬১ সনে। সেখান থেকে ১৯৬২ সনে চলে যান কলেজিয়েট স্কুলে,এখানে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে ১৯৬৪ সনে পিতার বদলি সূত্রে তাঁকে চলে যেতে হয় ময়মনসিংহে, ভর্তি হন ফুলবাড়িয়া হাই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণিতে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি শেষ করতে করতে তাঁর পিতার আবার বদলির অর্ডার আসে; এবারে চট্টগ্রাম। কিন্তু বছরের মাঝামাঝি হওয়ায় ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার কথা চিন্তা করে পরিবার ময়মনসিংহে রেখে পিতা নূরুল হক চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় কর্মক্ষেত্রে যোগ দেন। ১৯৬৬ সনে শহীদুল জহির পরিবারের সঙ্গে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় গিয়ে বাবার কর্মক্ষেত্রে বসবাস করতে থাকেন। এখানেই সাতকানিয়া মডেল হাই স্কুলে ভর্তি হন অষ্টম শ্রেণিতে।[২]

সাতকানিয়া ও ফুলবাড়িয়া বসবাসের অভিজ্ঞতা শহীদুল জহির অক্ষয় করে রেখেছেন তাঁর রচনায়, 'কোথায় পাবো তারে', 'ডলু নদীর হাওয়া' এই গল্প দুটিতে, এবং কিয়দংশ 'মুখের দিকে দেখি' উপন্যাসে সাতকানিয়ার অভিজ্ঞতা বিশেষত ভৌগোলিক জ্ঞান ও ভাষাভঙ্গি প্রয়োগসূত্রে। এখানেই তিনি এসএসসি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন এবং ১৯৬৯ সনে মানবিক বিভাগ থেকে এসএসসি পাশ করে ঢাকায় এসে ভর্তি হন ঢাকা কলেজের মানবিক বিভাগে। ১৯৭১ সনের এইচএসসি পরীক্ষার্থী

থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল পরিস্থিতিতে তা স্থগিত থাকে এবং স্বাধীন বাংলায় ১৯৭২-এ তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন।

উচ্চ মাধ্যমিক বা কলেজ জীবন শহীদুল জহিরের মনন গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ-পর্যায়ে তিনি বাংলাদেশের প্রাক জন্মমুহূর্তকালের রাজনৈতিক আবর্তসমূহ লক্ষ করেন এবং নিজেই জড়িয়ে যান ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতিতে[৩]। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভর্তি হন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে। যদিও পিতার ইচ্ছা ছিল তিনি ব্যারিস্টার হবেন[৪], কিন্তু নিজের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিলেন তিনি। ১৯৭৬ সনে অনুষ্ঠিত স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষা এবং ১৯৭৭ সনে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি চাকরি গ্রহণ করেন ১৯৭৮ সনে। রিসার্চ অফিসার হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে তিনি চাকরি করেন ১৯৭৮ থেকে ১৯৮১ সন পর্যন্ত। তারপর সরকারি কর্ম কমিশনের (বিসিএস) পরীক্ষায় পাশ করে তিনি ১৯৮১ ব্যাচে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব হিসেবে।।

ছাত্রজীবনেই শহীদুল জহির লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন। সে লেখার উপাদান সংগ্রহ করেন তিনি বাবার বদলির চাকরির বদৌলতে; বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা, বিশেষত পুরান ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের। তাছাড়া কলেজজীবনের ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ এবং মার্কসবাদে বিশ্বাসস্থাপন তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও জীবন সম্পর্কে প্রখর প্রজ্ঞালাভে সহায়তা করে। তারপর মহান মুক্তিযুদ্ধে সপরিবারে আক্রান্ত হওয়ার সূত্রে অর্জিত জীবনাভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে যে সম্পদের যোগান দেয় সেগুলোই পরবর্তীকালে প্রকাশিত তাঁর রচনাগুলোর বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে বারবার। তাছাড়া বাংলা ও বিশ্বসাহিত্যের পাঠাভিজ্ঞতা তাঁর সৃজনশীল মননকে সৃজনপ্রেরণার দিকে ধাবিত করে। ফলত, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেই লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে শহীদুল জহিরের[৫]।

সরকারি চাকরিতে প্রবেশের আগেই তিনি লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশের প্রেরণায় নিজের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'পারাপার'-এর পাণ্ডুলিপি জমা দেন 'মুক্তধারা' প্রকাশনায়। কিন্তু বইটির পাণ্ডুলিপি পাঁচ বছর প্রকাশের অপেক্ষায় থেকে প্রকাশ লাভ করে ১৯৮৫ সনে[৬]।এই গ্রন্থে তিনি শহীদুল জহির নন, লেখক হিসেবে নিজের নাম ব্যবহার করেন শহীদুল হক। নিজের পারিবারিকভাবে প্রাপ্ত এই নাম নিয়েই তিনি আত্মপ্রকাশ করেন সাহিত্যজগতে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বস্তুবাদী রাজনীতির চর্চালব্ধ জীবনবোধ-ই প্রধানত এই গল্পগ্রন্থের প্রধান সুর। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার – বিশেষত নিম্নবিত্ত মানুষের

জীবনের বাস্তবতা, অন্তর্বাস্তবতার স্বরূপ ও জীবনে টিকে থাকার আকুতির দ্বান্দ্বিক বাস্তবতার নিরিখেই তিনি এ-গ্রন্থের পাঁচটি গল্পের বিষয়বস্তু সাজিয়েছেন[৭]।

ইতোমধ্যে তিনি যোগ দিয়েছেন বিসিএস ৮১ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসেবে সরকারি চাকরিতে। সরকারি আমলা হিসেবে যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতাসমূহও তিনি সাহিত্যের আখ্যানে নিয়ে এসেছেন; যেমন 'আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু' নামক উপন্যাসে। যেখানে এক সরকারি আমলার ব্যক্তিজীবনের নানা জটিলতার সঙ্গে প্রধানত ফুটে উঠেছে কর্মক্ষেত্রে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার বিষয় এবং রহস্যজনকভাবে সেই দুর্নীতির বেড়াজালে পড়ে প্রাণ হারানো কর্মকর্তার কাহিনি। জীবনের যে কোনো পর্যায়ের অভিজ্ঞতাকেই তিনি পুঁজি হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এবং বলা যেতে পারে তাঁর জীবনের প্রতিটি স্তরের অভিজ্ঞতারাশিই গড়ে তুলেছিলো এক অনন্যসাধারণ আখ্যানবৃত্ত।

চাকরির প্রথম তিন বছর অর্থাৎ ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ সনে বসবাস করেন সরকারি কোয়ার্টার 'ইলিশিয়াম'-এ। এসময় তিনি দায়িত্ব পালন করেন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক ও সড়ক পরিবহন বিভাগের সহকারী সচিব হিসেবে। এরপর আগস্ট ১৯৮৪ থেকে জানুয়ারি ১৯৯১ পর্যন্ত তিনি বসবাস করেন গেজেটেড অফিসার্স ব্যাচেলর হোস্টেল, গ্রিন রোড, ঢাকার ২ নম্বর বিল্ডিংয়ের ক-১৩ সংখ্যক বাসায়। এর মধ্যে তিনি সড়ক ও পরিবহন বিভাগ থেকে সহকারী সচিব হিসেবে বদলি হন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে, এবং ২৯.০১.১৯৮৪ থেকে ১৯.১০.১৯৮৭ পর্যন্ত পালন করেন সেই দায়িত্ব। তারপর তাঁর পদবি পরিবর্তিত হয়; প্রথমে সহকারী ও কিছুদিন পর সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে ২০.১০ ১৯৮৭ থেকে ৩১.০৭.১৯৯১ পর্যন্ত। ইতোমধ্যে তিনি ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ সময়ের মধ্যে ঢাকাস্থ ফরাসি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ থেকে দুটি ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। লক্ষণীয় যে পেশাগত জীবনের পাশাপাশি লেখালেখির কার্যক্রম যুগপৎ চালালেও তিনি ত্রিশোর্ধ্ব বাঙালি পুরুষ হিসেবে তখনও বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাননি। এই আগ্রহ তাঁর জন্মে নি কোনো অজ্ঞাত কারণে। কেমন এক নির্লিপ্তি ভর করে থাকায় সম্ভবত নর-নারীর পারিবারিক সম্পর্ক গড়ার বিষয়টাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে সক্ষম হন নি শহীদুল জহির[৮]।

তবে নারীর মনোজগতের সঙ্গে বিযুক্ত থাকা শহীদুল জহির এই মধ্যবর্তী সময়েই প্রবলভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন সাহিত্যের সঙ্গে। প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশের পর এই অন্তর্বর্তীকালেই শহীদুল জহিরের জীবনাভিজ্ঞতা ও বিদেশি সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা তাঁকে নতুন করে গড়ে তোলে। একজন মৌলিক শিল্পীর যে মর্যাদা তিনি কামনা করেছিলেন প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের পর, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের

নামকরা প্রতিষ্ঠিত বাঙালি কথাশিল্পীদের রচনার মানদণ্ডে সেগুলো সহজেই অনুকরণ বলে প্রতিভাত হতে থাকে। ফলত শহীদুল জহিরের আন্তরিকতার ঔজ্জ্বল্য ঢাকা পড়ে যায় তৎপূর্ব সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখের শিল্পকায়ার স্বকীয়তানিষ্ঠ বৈশিষ্ট্যের কারণে।

প্রথম পর্যায়ে স্বাতন্ত্র্য অর্জনে ব্যর্থ শহীদুল জহির তাই ব্যতিক্রমী শিল্পভুবন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় অনুশীলন শুরু করেন এই মধ্যবর্তী সময়টুকুতে। সেই প্রচেষ্টাই গড়ে তোলে নতুন শহীদুল জহিরকে। যাঁকে আবিষ্কার করা যায় ১৯৮৯ সনে প্রকাশিত 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' নামক প্রথম উপন্যাসে। এ গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায় এক ভিন্ন শহীদুল জহিরকে। এই উপন্যাসেই তিনি নতুন নাম গ্রহণ করেন। সনদের 'শহীদুল হক' হয়ে যান শহীদুল জহির। নিজের শিল্পীসত্তার যে গুণগত পরিবর্তন ইতোমধ্যেই তিনি ধারণ করেছেন অন্তর্লোকে, তার প্রকাশের চেহারাতেও যেন নতুনত্ব নিয়ে আসার প্রত্যয় প্রতিভাত হয়ে ওঠে এই নাম পরিবর্তনের মধ্যে। লেখক জানিয়েছেন যে, পিতামহের নামের শেষাংশ তিনি নিজের নামের সাথে যুক্ত করেছেন এখানে[৯]।

কিন্তু যা তিনি পরিবারের ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করেননি তা হলো তাঁর এ-পর্বে রচিত সাহিত্যবৈশিষ্ট্য। বিশেষত মার্কেজের লেখার সঙ্গে পরিচয় ঘটায় এক ধরনের উপস্থাপনাগত পরিবর্তন তাঁর ভাবনালোকে ঢেউ খেলে যায় এবং সেটিকেই একটি গল্পবলার পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করে নিজের গল্পসমূহ বলতে শুরু করেন তিনি[১০]।সমসাময়িক কালে তাঁর বিদেশযাত্রা এবং সেখানকার অভিজ্ঞতা উত্তরাধুনিক কালপ্রবাহকে বুঝতে ও বিশ্লেষণ করতে আরও সহায়ক হয়ে ওঠে। তিনি হুবার্ট হামফ্রে ফেলোশিপের ফেলো হয়ে আমেরিকার দ্য আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে একবছর সময় অতিবাহিত করেন অগাস্ট, ১৯৯১ থেকে জুন, ১৯৯২ পর্যন্ত।

১৯৮৯ সনে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসের পরবর্তী রচনাসমূহ এই পেশাগত দায়িত্ব-শূন্যতার সময়েই বিকশিত হতে শুরু করে। এ সময়ে তিনি রচনা করেন তাঁল বিখ্যাত গল্পদ্বয় 'আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল কেন নেই'(১৯৯১) এবং 'কাঠুরে ও দাঁড়কাক'(১৯৯২)। এইসব গল্পে শহীদুল জহির গল্প বলার এক বিশিষ্ট ভঙ্গি প্রদর্শন করেন, 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসে যার অঙ্কুরোদগম লক্ষ করা গেছে। অতঃপর ক্রমশ জহির নিজের স্বকীয় বয়নভঙ্গি রপ্ত করছেন সাফল্যের সঙ্গে। এ-পর্যায়ে 'নিপুণ' জুন ৮, ১৯৯১ সংখ্যায় প্রকাশ পায় জহিরের আরেকটি ক্ষুদ্র উপন্যাস, নাম– আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু[১১]। মার্কেজের 'ক্রনিকল অব এ ডেথ ফোরটোল্ড' উপন্যাসের মতোই একটি পূর্বানুমিত মৃত্যুর কাহিনি বেশ সরল বাক্যবয়নে তিনি এই উপন্যাসে বর্ণনা করছেন। আমলাজীবনের

পরিচিত অনুঘটকে সাজানো একটি ঘটনার সম্ভাব্য পরিণতি এঁকে তিনি নিজের পেশাগত জীবনের মানবিক পরিচয় প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন এই উপন্যাসে।

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তিনি স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে যোগ দেন সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে। ১৮ জুলাই ১৯৯২ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ পর্যন্ত বহাল থাকেন সেই পদে। এরই মধ্যে প্রকাশ পায় তাঁর 'ডুমুরখেকো মানুষ'(১৯৯২) এবং 'এই সময়'(১৯৯৩) নামক গল্পদ্বয়। প্রথম উপন্যাস 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'র শিল্পতরু সংস্করণও প্রকাশ পায় এ সময়েই; ১৯৯৪ সনের ফেব্রুয়ারিতে। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তিনি হোটেল ইলিশিয়ামের ক-১০ সংখ্যক ফ্ল্যাটে ওঠেন। এখানেই তিনি বাস করেন সুদীর্ঘ ১০ বছর, অর্থাৎ– ১৯৯১ থেকে ২০০১ সন পর্যন্ত।। পিতৃগৃহের পর, এই বাসস্থানটিই লেখকের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে।

এরপর উপ-পরিচালক হিসেবে ঢাকার সাভার-স্থিত বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করেন ৩০.০৯. ১৯৯৪ থেকে ৩১. ১২. ১৯৯৫ পর্যন্ত। তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল'[১২]প্রকাশ পায় এই মধ্যবর্তী সময়ে। মাটির অন্তর থেকে প্রাণ পাওয়া বৃক্ষের মতো ক্রমপ্রসারিত মফিজুদ্দিন ও তার পরিবারবর্গের উত্থান এবং তাদের সবার করুণ মৃত্যুর আখ্যান এই উপন্যাসটির পাশাপাশি তাঁর 'কাঁটা'(১৯৯৫) গল্পটিও এই সময়ে প্রকাশিত হয়। গল্পটির নাম যদিও প্রথমে ছিলো 'মনোজগতের কাঁটা' কিন্তু পরবর্তীকালে লেখক এর নাম শুধু 'কাঁটা' রাখেন[১৩]। তাঁর পূর্ণ বিরতিহীন একমাত্র গল্প 'আমাদের কুটিরশিল্পের ইতিহাস' প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সনেই। যেন এক বিরামহীন পরিবর্তনের শিল্পায়নকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন এই গল্পে। পেশাগত জীবনেও তিনি ছিলেন বিরামহীন। উপ-পরিচালকের দায়িত্ব পালন শেষে তিনি সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে যোগ দেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে। ০১.০১. ১৯৯৬ থেকে সে পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ১৯৯৯ সনের ২৫ মার্চ পর্যন্ত। ১৯৯৯ সনের ফেব্রুয়ারিতেই বের হয় তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প'[১৪]।

১৯৯৯ সনের ১৯ এপ্রিল শহীদুল জহির পদোন্নতি নিয়ে উপসচিব হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে যোগদান করেন; কর্মরত থাকেন ৬ নভেম্বর ২০০১ সন পর্যন্ত। তারপর উপসচিবের দায়িত্ব নিয়ে পরিচালক হিসেবে বদলি হন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। এসময় তাঁর আবাসিক ঠিকানাও বদল হয়। গ্রিন রোডের বাসা ছেড়ে তিনি উঠে আসেন বেইলি রোড এলাকায় এবং ২০০৪ সন পর্যন্ত অবস্থান করেন বিল্ডিং-১২, ফ্ল্যাট-১২, বেইলি ডাম্প, ঢাকা – এই ঠিকানায়। প্রধানমন্ত্রীর

কার্যালয় থেকে যুগ্মসচিবে পদোন্নতি লাভ করে পুনরায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে ফিরে যান; সেখান থেকে ২০০৫ সনে অতিরিক্ত সচিব মর্যাদায় উন্নীত হয়ে টিসিবির চেয়ারম্যান হিসেবে যোগ দেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে। এ সময়ে প্রকাশ পায় তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প এবং সেসব গল্প ২০০৪ সনে গ্রন্থভুক্ত হয়ে তাঁর তৃতীয় গল্পগ্রন্থ হিসেবে 'ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প'[১৫] নামে প্রকাশ পায়।

টিসিবির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন শেষে তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়েরই আরেকটি বিভাগ– ডিপার্টমেন্ট অব ইন্স্যুরেন্স–এর চিফ কন্ট্রোলার হিসেবে নিযুক্ত হন। বেইলি রোডে তাঁর ঠিকানা বদল হয়। মে ২০০৪ সন থেকে মে ২০০৬ সন পর্যন্ত তিনি অবস্থান করেন বেইলি স্কোয়ারের ১১১ নং বিল্ডিঙের ফ্ল্যাট- ১৭ তে। ২০০৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে মাওলা ব্রাদার্স থেকেই বের হয় তাঁর চতুর্থ ও শেষ উপন্যাস 'মুখের দিকে দেখি'। শেষ দুটি গল্পগ্রন্থের নানা গল্পে এবং শেষ উপন্যাসটিতে শহীদুল জহির সূক্ষ্মতার সঙ্গে আঁকতে থাকেন তাঁর বাল্যের স্মৃতিবাহিত পুরান ঢাকার জীবনকে– সে জীবনের যান্ত্রিকতা, মানবিকতা, মুক্তিযুদ্ধের ভয়াল স্মৃতি, রহস্যময় লোকবিশ্বাস এবং অদ্ভূত আচার-সংস্কার। বস্তুত এ পর্বেই শহীদুল জহিরের শিল্পকৃতি স্বতন্ত্র ও চূড়ান্ত অভিব্যঞ্জনায় আত্মপ্রকাশ করে।

ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টের চিফ কন্ট্রোলারের দায়িত্ব পালন শেষে তিনি ২০০৬ সনে ফিরে যান অতিরিক্ত সচিবের দায়িত্ব নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে। অতঃপর ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে ২০০৭ সন থেকে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্যচট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে। এসময় পাঠক সমাবেশ তাঁর নির্বাচিত গল্প ও নির্বাচিত উপন্যাস বের করে যথাক্রমে ফেব্রুয়ারি ২০০৬ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সনে। ২০০৮ সনের ২৩ মার্চ তারিখে হৃদরোগ জনিত কারণে বাংলা কথাসাহিত্যের এই ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব মৃত্যুবরণ করেন।

তথ্যনির্দেশ:

১. "শহীদুল জহির-শহীদুল হক-শহীদ ভাই। আমার অগ্রজ। বাবা-মা'র দ্বিতীয় সন্তান, জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমাদের পাঁচ ভাই, চার বোনের পরিবারে ... আমরা ছোটরা তাকে ডাকতাম ভাই বলে।" – অনুজের কথা: হাবিবুল হক; সূত্র – মোহাম্মদ আবদুল রশীদ (সম্পাদিত) শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ; পাঠক সমাবেশ, ঢাকা; ২০১০। পৃষ্ঠা – ৫২৫।

২. "১৯৬৬ তে আমরা গেলাম সাতকানিয়াতে। ভাই সাতকানিয়া মডেল হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন, আমি ষষ্ঠতে।"– অনুজের কথা: হাবিবুল হক; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা –৫২৬।

৩. আসলে রাজনৈতিক সচেতনতা কলেজে ঢোকার পর। যখন আমি ঢাকা কলেঝে পড়ি, লাল বই পড়া শুরু হয় তখন। পকেট সাইজের বই লাল প্লাস্টিকের মলাট দেয়া। আমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আমি ছাত্র ইউনিয়ন করা শুরু করলাম। – কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরকে দেয়া সাক্ষাৎকার; সূত্র:প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৫৬৩।

৪. "আব্বা তাঁর বড় ছেলেকে ব্যারিস্টার বানাতে চেয়েছিলেন"– অনুজের কথা: হাবিবুল হক; প্রাগুক্ত;পৃষ্ঠা- ৫২৭।

৫. শহীদুল জহিরের অনুজ হাবিবুল হকের জবানিতে পাওয়া যায় তাঁর লেখক হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশের সংবাদ :"শহীদ ভাই কবে লেখা শুরু করলেন বলা মুশকিল। যতদূর মনে পড়ে ফুলবাড়ীয়া থাকতে *দৈনিক পয়গাম* পত্রিকার শিশু কিশোরদের পাতায় তার একটি ছোট কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, সেটাই সম্ভবত তার প্রথম প্রকাশিত লেখা।... বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় পুনরায় লেখা শুরু করেন।"– হাবিবুল হক; প্রাগুক্ত;পৃষ্ঠা-৫২৮।

৬. আমার প্রথম বই ১৯৮৫ সালে (প্রকাশিত) *পারাপার*। বইটি প্রকাশ করেছিলো মুক্তধারা। ... আমি পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছিলাম ১৯৮০ সালে। প্রকাশিত হতে পাঁচ বছর সময় লেগেছিলো। – হামীম কামরুল হক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার: সূত্র – মোহম্মদ আবদুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬১১।

৭. "*পারাপার* বইটাই গরিব লোকদের নিয়া লেখা, শহরের গরিব, গ্রামের গরিব।" – কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরকে দেয়া সাক্ষাৎকার; সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৫৬৭।

৮. বিয়ে করছেন না কেন? সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী হামীম কামরুল হকের এমন প্রশ্নের জবাবে শহীদুল জহির জানান: "ব্যক্তিগত কিছু কারণ আছে। তাছাড়া আমি যেকোনো নারীর সাথে থাকতে আগ্রহী না। এটা আসলে ডিফাইন্ডেবল না।" সূত্র: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ; প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৬১৭।

৯. নিজের নাম শহীদুল হখ থেকে পরিবর্তন করে শহীদুল জহির করলেন কেন – এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান: " দেখা গেলো যে, শহীদুল হক নামে লোকে আমাকে চিনতে পারছে না, আমার লেখা ছাপানোর পরেও ভাবছে যে, আমি, আমি না। কারণ তখন অন্য একজন শহীদুল হক ছিলেন, টাইমসের সম্পাদক, লেখালেখি করতেন, আরেকজন আছেন শহীদুল হক খান। এদেও দুইজনের সঙ্গে প্রায়ই আমাকে গুলায়া ফেলা হচ্ছিল। আমি বুঝলাম যে, এরা আমার সমস্যার জন্য নিশ্চয়ই নিজের নাম বদলাবেন না, আমি অখ্যাত, আমাকেই বদলাইতে হবে। জহিরউদ্দিন আমার দাদার নাম। কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরকে দেয়া সাক্ষাৎকার; সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৫৭১

১০. "তখন আমি মার্কেজের ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড পড়ে ফেলায় তার কাছ থেকে জাদুবাস্তবতার রচনাপদ্ধতিটি নেই। আমার মনে হয় যে, আমি আমার কাহিনী তৈরিতে অনেক দূর পর্যন্ত স্বাধীনতা নিতে পারি, আমার কল্পনাকে সম্ভাব্যতার প্রান্ত পর্যন্ত নিয়া যেতে পারি।" – কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরকে দেয়া সাক্ষাৎকার; সূত্রঃ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৫৭৮।

১১. লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশ পায় বইটির শোভন গ্রন্থরূপ : আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। ২০০৯।

১২. সে রাতে পূর্ণিমা ছিল : শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫।

১৩. "এ গল্পের নামটা আমি দুইবার পরিবর্তন করেছে। প্রথম লিখেছি 'কাঁটা' পরে আবার লিখেছি 'মনোজগতের কাঁটা'।... আমার মনে হয়েছে যে, একদম বলে দেয়ার দরকার নেই যে, এটা মনোজগতের কাঁটা। কাঁটা বিভিন্ন রকমের আছে, পাঠক ঠিক করে নিবে।" – আর কে রনি কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার। সূত্রঃ মোহম্মদ আবদুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬২৪।

১৪. ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প : শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা; ১৯৯৯।

১৫. ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প : মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি ২০০৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শহীদুল জহির ও সমকালীন বাংলাদেশের কথাসাহিত্য

একটি নির্দিষ্ট কালখণ্ডে বসবাসরত শিল্পী-সাহিত্যিক এড়াতে পারেন না তাঁর সমকালকে; দৃষ্টি ও বোধের ব্যাখ্যাতীত মাহাত্ম্যযোগে সমকালীনপ্রাণপ্রবাহকে তাঁরা ধরে রাখেন অসাধারণ ভঙ্গিতে। প্রত্যেক সৃজনক্ষম শিল্পীরই রয়েছে স্বতন্ত্র অন্তর্দৃষ্টি। একই সময়ে দেখা একটি বিষয় বিভিন্ন শিল্পীর চোখে বিভিন্ন মাত্রা নিয়ে উদ্ভাসিত হতে পারে। বিভিন্নতাসত্ত্বেও তাঁদের সাহিত্যকর্মহয়ে ওঠে একই কালখণ্ডের বিভিন্ন স্মারকের মর্যাদাসম্পন্ন। এই বিভিন্ন রঙের একত্র আয়োজনেই একটি সময়ের রঙিন মূর্তি আবিষ্কার সম্ভব হয়ে ওঠে। একটি সময়খণ্ডের বিভিন্ন রঙ মিলেই গড়ে ওঠেএকটি বিশদ ক্যানভাস । সেখানেই পাওয়া যায় সেই সময়খণ্ডের পূর্ণ পরিচয়।

মূলত আশির দশকের লেখক হলেও প্রকাশকালের বিচারে শহীদুল জহির সত্তরের দশকের শিল্পী। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ সত্তরের দশকের শেষপর্যায়ে প্রকাশিত হওয়ায় সত্তরের শিল্পছাপ তাঁর সে-সময়ের রচনায় পুষ্ট; কিন্তু যে শহীদুল জহির বাংলাদেশের তথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ব্যতিক্রম বলে স্বীকৃত, সেই শহীদুল জহিরের আত্মপ্রকাশ আশির দশকে। লেখক শহীদুল হক থেকে শিল্পী শহীদুল জহিরের রূপান্তর ঘটেছে তাঁর 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসের মধ্য দিয়েই। ফলত যুগপৎভাবে সত্তর ও আশির দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের একটি স্মরণীয় বাঁকের সাথে দৃশ্যত তাঁর সম্পৃক্তি ঘটে গেছে। বস্তুত স্বাধীনতা-পরবর্তী বিবর্তমান কথাসাহিত্যিক হিসেবে সত্তার বিবর্তনসহ শহীদুল জহির ধারণ করে আছেন একটি দেশের কথাসাহিত্যের বাঁকবদলের ইতিহাস।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ধারা বহমান থাকে মূলত ষাটের কথাশিল্পীদের মাধ্যমেই। কিন্তু একটি নতুন দেশের জন্ম তাঁদের সামনে সাহিত্যের বিষয় হিসেবে নিয়ে আসে নবতর প্রসঙ্গ। এই সময়ের নতুন লেখকরাও একদিকে যেমন পূর্বতন ধারার অনুবর্তন করেন অন্যদিকে তেমনি সমকালীন প্রসঙ্গও অঙ্গীকার করে। ফলত নতুন-পুরনো সকলে মিলে রচনা করতে থাকেন নতুনভাবে প্রাপ্ত একটি দেশের জনসমাজের সাহিত্য-আঙ্গিক। শহীদুল জহির এই নতুনদের দলভুক্ত শিল্পী।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের লেখকেরা তাঁদের জীবনাভিজ্ঞতা হিসেবে যেমন পেয়েছিলেন বিভাগপূর্ব চল্লিশের দশকের বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, সে সময়ের রাজনীতি এবং তজ্জাত দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ এবং তৎপরবর্তী রাষ্ট্রিক বৈষম্য, নির্যাতন এবং মহান রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন; তেমনি

স্বাধীনতা-পরবর্তী নতুন লেখকেরা পেয়েছিলেন স্বাধীনতাপূর্ব ও পরবর্তী মানষের জীবনের বাস্তবতাসমূহ। সর্বোপরি এই সময়ের সাহিত্যিকেরা পেয়েছিলেন একটি নতুন দেশ; তার জন্মনিহিত প্রেরণাসমূহ, পেয়েছিলেন সে দেশের গড়ে ওঠার স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের দৃশ্যসমূহ। এই অভিজ্ঞতাগুলিই হয়ে উঠেছে তাঁদের মূলধন; এগুলি পুঁজি করেই তাঁদের আত্মপ্রকাশ এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে একটি পরিগঠমান জাতিসত্তার বিবর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিবৃত্তকে কেন্দ্র করে তাঁদের রচনার পরিব্যাপ্তি[১]। শহীদুল জহিরও এই প্রবৃত্তিসমূহ আত্তীকৃত করেছিলেন অকুণ্ঠিত প্রত্যয়ে।

শহীদুল জহিরের সমসাময়িক অর্থাৎ সত্তর- আশির দশকের কথাসাহিত্যিক হিসেবে যাঁদের গণ্য করা হয়, তাঁদের মধ্যে লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশকৃত লেখকের সংখ্যাই বেশি। যেমন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, মাহমুদুল হক, রশীদ করীম, রিজিয়া রহমান, হাসান আজিজুল হক, সেলিনা হোসেন প্রমুখ। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম কিন্তু শহীদুল জহিরের সমসাময়িকদের মধ্যে গল্পকার আহমেদ বশীর, নাসরীন জাহান, মঈনুল আহসান সাবের, মঞ্জু সরকার, হরিপদ দত্ত, সুশান্ত মজুমদার, মহীবুল আজিজ, পারভেজ হোসেন, ইমতিয়ার শামীম, কাজল শাহনেওয়াজ প্রমুখের গল্পকথাগুলোও অবশ্যবিবেচ্য।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের আর্থ-সামজিক বাস্তবতার নিরিখে তাঁদের কথাসাহিত্যের প্রধান বিষয় হিসেবে জায়গা করে নিয়েছিলো একটি নতুন দেশের নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন, পাশাপাশি গ্রামীণ জীবনের নানাবিধ সংকট; তৎপরবর্তীকালে আর্থ-উৎপাদনকাঠামোর পরিবর্তনসাপেক্ষে জীবনের অর্থনীতি, অর্থপীড়িত নরনারীর জীবন, নারীর উৎপাদনশীলতা, বহির্গামী জীবনের সংকটসমূহ তাঁদের কথনিকার বিষয় হিসেবে স্থান করে নিয়েছে:

> "উপকরণ নির্বাচন ও বিষয়ভাবনার দিক থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী উপন্যাসকে প্রধানত তিনটি ধারায় স্থাপন করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে: এক. গ্রামজীবনাভিজ্ঞতার রূপান্তর ও তার রূপায়ণ; দুই.মধ্যবিত্তের বহুমুখী চেতনার রূপ-রূপান্তর; এবং তিন.মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও যুদ্ধ-উৎসারিত চেতনার রূপায়ণ।"[২]

তবে এই প্রবণতার বাইরে গিয়েও অনেক কথাকার আঁকতে চেয়েছেন বাঙালির জীবনের আখ্যানরূপ। অনেকে রূপপ্রকল্প হিসেবে বেছে নিয়েছেন বাঙালির ঐতিহাসিক মহা-আখ্যানকে। কল্পনার বিস্তারের সাথে ঐতিহাসিক উপকরণ মিশিয়ে তাঁরা নির্মাণ করতে চেয়েছেন বাঙালির সাহসী অতীতের রূপকল্প। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এই প্রচেষ্টার বাস্তবায়নে ছাড়িয়ে গেছেন সমসাময়িক সকল কথাশিল্পীকে। আঠারো শতকের ঐতিহাসিক বীরগাথা (ফকির-সন্ন্যাস বিদ্রোহ) থেকে শুরু করে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থান পর্বের সবচেয়ে অভ্যুত্থানের ঘটনা পর্যন্ত (৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান) তিনি তাঁর দুটি

উপন্যাসের[চিলেকোঠার সেপাই ;১৯৮৭ ও খোয়াবনামা ;১৯৯৬] কথামালায় যুক্ত করেছেন মহিমামণ্ডিত শিল্পবোধ প্রয়োগের মাধ্যমে। এই ধারায় উল্লেখ করা যেতে পারে আবু জাফর শামসুদ্দীনের বিখ্যাত ত্রয়ী – ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান (১৯৬৩), পদ্মা মেঘনা যমুনা (১৯৭৪) ও সংকর সংকীর্তন (১৯৮০), সরদার জয়েনউদ্‌দীনের অনেক সূর্যে আশা (১৯৬৭)বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ (১৯৭৫) ইত্যাদি উপন্যাসের নাম।

একটি জাতি হিসেবে কেমন ছিলো বাংলাদেশের অতীত আর তার ধারাবাহিকতায় তার অর্জন কী আর কী পেতে পারতাম, কোথায় আমাদের ভুল আর কোথায় গৌরবের অর্জন সে-সমীকরণ-ই এইসব ইতিহাস-ঐতিহ্য অন্বেষক কথাসাহিত্যের মূল বিষয়। সেই বিষয়সমূহ আরও গভীর থেকে চিহ্নিত করার প্রয়াস দেখিয়েছেন শওকত আলী তাঁর 'প্রদোষে প্রাকৃতজন'-এ, সেলিনা হোসেন তাঁর 'নীল ময়ূরের যৌবন'-উপন্যাসে। এসময়কার ছোটগল্পে ইতিহাসের তুলনায় অঙ্কিত হয়েছে সমকালীন জীবনের ক্ষতাক্ত চিত্রসমূহ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-পরবর্তীকালীন বাংলাদেশের ছোটগল্পকারগণ স্বাধীনতা-পূর্বকালে, বিশেষত ষাটের দশকে, প্রতিষ্ঠিত করছেনবাংলার জনজীবনের অনুপুঙ্খ দিকগুলোকে। আলাউদ্দিন আল আজাদের মতো প্রতিষ্ঠিত লেখক যেমন বাংলার জীবনকে নতুনরূপে দেখেছেন এ-পর্বে, তেমনি হাসান আজিজুল হকের মতো আনকোরা লেখকও পরিণত কল্পনার বাস্তবিক বাক্যবয়নে আত্মপ্রকাশিত হয়েছেন।

'জলেশ্বরীর শিল্পী' সৈয়দ শামসুল হক শহরের মায়া ছেড়ে ধাবিত হয়েছেন জলেশ্বরী পারের জনজীবনের দিকে, শওকত আলী তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞানঅন্বেষণ করেছেন সমতলবিস্তারী গণমানুষের জীবনে, 'নাঢ়াই' উপন্যাস ও অন্যান্য গল্পসমূহে; 'পানকৌড়ির রক্তে'র গল্পকার হয়ে উঠেছেন কবি আল মাহমুদ। অর্থাৎ নগরাভ্যন্তরিক জীবনের পাশাপাশি স্বাধীনতা-প্রাপ্ত জাতীয়তাবোধ শিল্পীকে নিজের জাতিসত্তার স্বরূপ উন্মোচনে তাড়িত করছে হাজার বছরের গ্রামজীবনের দিকে। আবু ইসহাকের 'জোঁক'-পরবর্তী গল্পমালা মোড় নিয়ছে ভিন্ন দিকে। শহীদুল জহির ও তাঁর সমসাময়িক কথাকারগণ সেই ভিন্ন মোড়ের শিল্পী।

সময় যখন ভেঙে যাচ্ছে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হয়ে উঠছে জীবনের অনুভূতিসমূহ; যখন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে জনজীবনের রাজনৈতিক অভিঘাতমালা; মানুষ যখন বিশ্বাস হারাচ্ছে দেশীয় রাজনীতির ভবিষ্যতের ওপর– শহীদুল জহির সেই সময়ের ভাষাশিল্পী।

বস্তুত, মানুষের জীবনের গল্প শেষ হবার নয় কোনোদিন। গল্পকারগণ ছোটগল্পের সীমায়ত ফ্রেমে কিংবা উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাসে তার কল্পিত বিন্যাস করেন মাত্র। কল্পনার মাত্রাগাম্ভীর্য ও বয়নের সাবলীলতা প্রমাণ করে কথকের ক্ষমতা। শহীদুল জহির সেই ক্ষমতালব্ধ কথাকার যিনি সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যের চলমান ধারাটি সমৃদ্ধির সাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন সসম্মানে। নিজের প্রথম পর্যায়ের গল্পের মধ্যে তিনি বিষয় হিসেবে যে শ্রেণির মানুষের জীবনকে বেছে নিয়েছেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে তার বিস্তার ঘটেছে। ফলত ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি যাত্রা শুরু করতে পেরেছেন পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিয়েই। নগরের জীবন, পুরান ঢাকার জীবনের সাথে সাথে নতুন ঢাকার মধ্যবিত্ত জীবন, নগরে নতুন আসা উন্মুল মানুষ; গ্রামের জীবন, কৃষক আর ছদ্ম-সামন্তের দ্বান্দ্বিক জীবন, চূড়ান্ত শোষণে ভূমিতে মিলিয়ে যাওয়া জীবন; মুক্তিযুদ্ধ- মুক্তিযুদ্ধকালীন সংকটে নিয়তির রোষানলে পড়ে আটকে পড়া মানুষের জীবন, জীবনের প্রকৃত মর্ম হারিয়ে ফেলার শূন্যতাবোধাক্রান্ত জীবন, সবকিছু পেয়ে কিছুই না পাওয়ার রিক্ততাক্লান্ত জীবন তিনি গল্পে-উপন্যাসে তুলে এনেছেন।

তবে যে বিষয়টি শহীদুল জহিরকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিতকরেছে তা হচ্ছে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁর অখণ্ড মনোযোগের এক ধারাবাহিক প্রকাশ দেখা যায় তাঁর রচনাকর্মে। জহিরের উপন্যাস ও দ্বিতীয়পর্বের গল্পমালায় মুক্তিযুদ্ধ স্থান করে নিয়েছে এক অনতিক্রম্য শক্তি ও স্মৃতির মতো। যেন কোনো অবস্থাতেই তাঁর পাত্রপাত্রীর জীবন মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে পরিপূর্ণ নয়, তাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্ববহ ঘটনাটির উৎসারণ ঘটেছে যেন সেই মুক্তিযুদ্ধ থেকেই। ফলত তাঁর দ্বিতীয় পর্বের টি গল্পের মধ্যে টিতেই মুক্তিযুদ্ধের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, দেখা যায় 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' এবং 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' উপন্যাসদ্বয়ের আখ্যানে। রচনার সংখ্যা ও সেখানে মুক্তিযুদ্ধের উপস্থিতির হার বিবেচনায় শহীদুল জহির তাঁর সময়কার শ্রেষ্ঠ ও প্রধানতম আখ্যানকার।

যদিও পঁচাত্তর-পরবর্তী প্রায় দেড় দশকের সমরশাসন একটি অবরুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের গৌরববাহী জাতীয়তাবোধকে ম্লান করে দেয়ার চেষ্টায় নিরন্তর লেগে থাকা শাসকশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর এক সৃজনক্রিয়ার উদ্ভব ঘটেছিলো তৎকালীন বাংলাদেশের সাহিত্যে, তবুও শহীদুল জহির বেছে নিয়েছিলেন নিজের স্বতন্ত্রপথ। নিজের গল্পমালার অভ্যন্তর সাজিয়েছেন নিজের মতো করে, একটি গোষ্ঠীর গল্প করতে গিয়ে তাদের জীবনাভিজ্ঞতা হিসেবে বিবিধ আস্বাদে মুক্তিযুদ্ধকে আখ্যানভুক্ত করেছেন। ফলত মুক্তিযুদ্ধ, তৎপরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতিসমূহ এবং এতদ্বাস্তবতায় গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত মানুষের বিবর্তমান জীবনবাস্তবতা; স্বদেশ, স্বাধীনতা-

সার্বভৌম সংক্রান্ত তাদের ভাবনা ও বিশ্বাসের পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং সেই পরিবর্তনে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মনের তাবৎ অভিঘাত তাঁর গল্প-উপন্যাসে বারংবার প্রসঙ্গ হয়ে এসেছে।

বিষয়ের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি শহীদুল জহির সমসাময়িকদের কাছ থেকে নিজেকে পৃথক করেছেন গল্প বলার ভঙ্গির মাধ্যমে। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'পারাপার'-এ কথনভঙ্গিমায় যে শহীদুল জহিরকে পাওয়া যায় তা মূলত ওই সময়ে প্রচলিত ওয়ালীউল্লাহ্-ঘরানাভুক্ত পদ্ধতি; জীবনের উপরিতলের গল্পগুলো যেখানে মনোলোকের নিম্নতলের অভিজ্ঞতাজারিত হয়ে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'-পরবর্তী শহীদুল জহির নিজেকে নতুন করে গড়ে নিয়েছেন। উত্তরাধুনিক প্রত্যয়ে গল্পকে আরও ভেঙে টুকরো টুকরো করে অন্তহীন সীমায় বাঁধার কৌশল তখন তাঁর আয়ত্তাধীন এবং লৌকিক বর্ণনভঙ্গি তাঁর অনায়াস। এ-পর্যায়ে সৈয়দ শামসুল হক যেভাবে তাঁর 'জলেশ্বরীর গল্পগুলো'কে বর্ণনা করেছেন একটি কৌমের চিন্তনবিন্দু ও প্রেক্ষণকোণ ব্যবহার করে, যাকে সমালোচনার সরলভাষ্যে চিহ্নিত করা হয় মার্কেসীয় রীতি হিসেবে, শহীদুল তাঁর গল্পগুলো বর্ণনা করেছেন সেই ভঙ্গিমায়। তবে সমকালচর্চিত একটি জনপ্রিয় স্টাইলিস্টিক প্রবণতা থেকে নয়, যেন এই রীতিই ছিলো তাঁর আরাধ্য ভঙ্গিমা সেই বিশ্বাস থেকেই রীতিটিকে স্বীকরণ করেছিলেন তিনি এবং তা রক্ষা করে গেছেন আমৃত্যু। সামষ্টিক প্রেক্ষণবিন্দুর নানাকৌণিক প্রয়োগে তিনিএকটি গল্পের ঘটনাকে দেখাতে পেরেছেন বিভিন্ন তল থেকে, উপসংহারের খোলামুখ সৃষ্টি হয়েছে তাতে এবং একটি শেষ না-হওয়া বৃত্তে গোলক ধাঁধাঁ তৈরি করে গল্পের রসনিষ্পত্তিতে এনেছে ভিন্ন রসসম্ভাবনা।

সমকালে স্বল্পপ্রজ, কিন্তু শিল্পমানে উচ্চতর শ্রেণিভুক্ত লেখক হিসেবে স্বীকৃত শহীদুল জহির মূলত পরিবর্তমান সময়ের মর্জিটাকেই সুস্পষ্ট করতে চেয়েছেন বারংবার; কার্যত সংখ্যায় কম হলেও একটি নির্দিষ্ট দশক-বৃত্তে নিজেকে আটকে রাখেননি। সতত সৎ থেকে সময়কে নিরীক্ষা করেছেন, বয়নভঙ্গিতে নতুনত্ব আনয়নে সচেষ্ট থেকেছেন সর্বদা এবং নিজেকে করেছেন চলমান সময়ের সাথে ভবিষ্যপ্রসারী। আর যে রচনা বা শিল্পপ্রচেষ্টা নিজের কালকে ছাড়িয়ে অনাগত ভবিষ্যতের রুচিকেও প্রভাবিত করতে পারে তা-ই হয়ে ওঠে ধ্রুপদী; সে হিসেবে শহীদুল জহির তাঁর সমকালের ধ্রুপদী-নির্মাতা।

তথ্যনির্দেশ:

১. বাংলাদেশের গল্প জীবনের কথকতা, কিন্তু এ-জীবন বিভক্ত গ্রাম ও শহরের পটভূমিতে। যুদ্ধোত্তর উজ্জীবিত বাংলাদেশে সংঘচেতনা প্রবল হওয়ারই কথা এবং সংঘচেতনা প্রবল হলে আমাদেও সাহিত্য মৃত্তিকা-সম্পৃক্ত মানুষের কথা বলে। ভাষা আন্দোলনের চেতনা সমৃদ্ধ পঞ্চাশের দশক যখন উজ্জীবিত-উচ্চকিত; সামরিক শাসন-অবরুদ্ধ ষাটের দশক অন্তর্মুখী ও দ্বিধান্বিত ব্যক্তিগত জগতে। এ-উদাহরণ যুদ্ধোত্তর সত্তর ও আশির দশক সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সত্তরের দশক গ্রামজীবন ও সংঘচেতনায় উচ্চকিত কিন্তু সামরিক শাসন আক্রান্ত আশি ও অপুষ্ট নব্বই দশকের গল্প প্রধানত শহরজীবন ও ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতার আর্তচিৎকার। – সিরাজুল ইসলাম: বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের ছোটগল্প; বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য (সাঈদ-উর রহমান সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা। ২০০৩; পৃষ্ঠা – ৯২।

২. রফিকউল্লাহ্ খান: শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; ২০০০; পৃষ্ঠা – ৭৮।

তৃতীয় অধ্যায়

শহীদুল জহিরের গল্প: প্রথম পর্যায়

পারাপার[১]

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যেযে হাতে-গোনা কজন কথাসাহিত্যিকের আলোকঝলক হয়ে উঠেছে দিকনির্দেশী শহীদুল জহিরতাঁদের মধ্যে পরলোকগত অনুজানুজ। নিয়ত জনবিচ্ছিন্নতাপ্রিয় এই শিল্পী ছিলেন স্বল্পপ্রজ, কিন্তু একইসাথে ছিলেন বাংলাদেশের সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট শিল্পদৃষ্টান্তের নির্মাতা। তবে তাঁর আত্মপ্রকাশ আকস্মিক বা বিচ্ছিন্নমূল নয়, বরং তৎপূর্বে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের উৎকৃষ্টতম ধারার উত্তরাধিকার তিনি। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'পারাপারে'র প্রতিটি ভাবনার বিন্যাসে সেই উত্তরাধিকার-অভিজ্ঞান হয়ে আছে উৎকীর্ণ। যদিও স্বীকৃত স্বকীয়তাপ্রাপ্তি ও আত্মোপলব্ধির পর শহীদুল জহির সেই অভিজ্ঞানাকীর্ণ গ্রন্থকে করতে চেয়েছেন অস্বীকার, তবুও সেই গ্রন্থটি হয়ে আছে একজন শিল্পীর উদ্ভাসনের প্রামাণিক সত্যের চিহ্ন। আঁতুড়ের গন্ধমাখা কাগজের ঘরের মতো ওই গ্রন্থটিই ঘোষণা করছে কথাকার শহীদুল জহিরের হয়ে ওঠার শিল্পশৈশবীয় অভিব্যক্তি।

'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাস থেকে শুরু করে সর্বশেষ রচনায় আখ্যানবয়নের কৌশলে ও বিষয় ভাবনার অনন্যতায় যে শহীদুল জহিরকে বাংলাসাহিত্য অবলোকন করে, 'পারাপার' পর্যায়ে শহীদুল জহিরের সেই শিল্পধ্যানের কায়া অনুপস্থিত। তখন যে শিল্পী গল্পের পসরা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, তিনি চলনে-বলনে ও ভাবনায় বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের পুরুষোত্তম ব্যক্তিত্ব সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র-ই উত্তরপুরুষ। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে ওয়ালীউল্লাহ্‌ বাংলা কথাসাহিত্যে যে আন্তর্জাতিকতার ছোঁয়া দিলেন, তাঁরই সুযোগ্য উত্তরাধিকার শহীদুল জহির। জীবনের গল্প সরল ভাষায় বর্ণনার রীতিকে স্বীকৃতি দিয়েও ওয়ালীউল্লাহ্‌ বাংলাদেশের গল্পকে করে তুলেছিলেন দ্বিস্বরিক, কখনও বা বহুস্বরা। উত্তরকালীন শিল্পীরা সেই স্বরবহুলতায় যুক্ত করেছেন বহুবৈচিত্র্য, বাংলা গল্প হয়ে উঠেছে বহুকৌণিক-পাঠসম্ভব। চরিত্রের জীবনের উপরিতল, প্রতিবেশের বিভিন্নতাসৃষ্ট বিচিত্র অভিঘাত, অভিঘাতজাত মনোসংগঠন– তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অর্থ-সমাজ ও রাজনীতির বহির্বিন্যাস ও অন্তর্বিন্যাস, সর্বোপরি মানুষের বহুচূর্ণ জীবনের সমস্ত আখ্যান অন্তর্ভূত হয়েছে বাংলাদেশের গল্পের বিষয়-বলয়ে। শহীদুল জহির এই ওয়ালীউল্লাহ্‌-উত্তর বাংলাদেশের কথাশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম।

কিন্তু তাঁর প্রথমদিকের রচনায় রয়ে গেছে সেই নমস্য পূর্বসূরির শিল্পচিহ্ন, হয়তো সে-কারণেই, তিনি সেই প্রথম গল্পগ্রন্থটিকে করতে চেয়েছেন অস্বীকার[২], তবুও এটিই তাঁর আঁতুড়গন্ধী শিল্পাভিজ্ঞান।

এই আঁতুড়কালীন গল্পগ্রন্থে পরিমিত শিল্পবোধ উৎকীর্ণ করে শহীদুল জহির মাত্র পাঁচটি গল্প প্রকাশ করেছেন। প্রতিটি গল্পের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে সেইসব মানুষের জীবনকে ঘিরে, সমাজের প্রান্ত-পর্যায়ে যাদের বসবাস।

ভালোবাসা

রচনার কাল বিচারে 'ভালোবাসা' শহীদুল জহিরের প্রথম গল্প। তিনি তখন লিখতেন শহীদুল হক নামে, পারাপার গল্পগ্রন্থটি প্রকাশের সময় গল্পকারের নাম শহীদুল হক-ই ছিলো। রচনার বিষয়-বিবেচনায় তিনি বেছে নিয়েছিলেন নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন, তাদের বেঁচে থাকা, সেই বেঁচে থাকার অবিমিশ্র রূপ– তাদের হাসি-কান্না, প্রাপ্তির আনন্দ, না পাওয়ার বেদনা, জিঘাংসা, লোভ প্রভৃতি। এক্ষেত্রে স্বাধীনতা-উত্তর সমাজ কাঠামোর নিম্নতলে বসবাসরত মানুষের দিকে পূর্বসূরী আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতোই চরম-নির্মোহতার সঙ্গেই দৃষ্টিক্ষেপণ করছিলেন তিনি; আর তুলে এনেছিলেন হৃদ-ঝলকানো বাস্তবতা। সে দিক দিয়ে 'পারাপার' গ্রন্থের সবগুলো গল্পই নিম্নবর্গের বস্তুনিষ্ঠ আখ্যান। 'ভালোবাসা' এই গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প।

গল্পটি আবর্তিত হয়েছে আবেদা আর হাফিজদ্দির দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসার জীবনের একদিনের ঘনীভূত ভালোবাসার প্রকাশকে ঘিরে। শহীদ দিবসের জন্য সবাইকে ফুল ছিঁড়তে দেখে নিজেও একটি ফুল ছিঁড়ে এনে হাফিজদ্দি ঘরে রেখে দিতে চায় পানিতে ভিজিয়ে, দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখতে চায় এর সৌন্দর্য।কিন্তু সৌন্দর্য-চর্চায় অনভ্যস্ত সংসারে ফুল বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র মামুলি উপকরণ খালি বোতল। বোতলে ভিজিয়ে রেখে অগত্যা আবেদার জিম্মায় রেখে হাফিজদ্দি চলে যায় বাইরে। তার যাওয়া ও ফিরে আসার অন্তর্বর্তী সময়টুকুতে আবেদার মনে জেগে ওঠে নারী-মনের স্বাভাবিক সাজ-সজ্জার আকাঙ্ক্ষা। ফুলটি সে চুলে গুঁজে নিজের লাবণ্য বাড়িয়ে নিতে চায়, কিন্তু স্বামীর ভয়ে সে কিছুই করতে পারে না, চুল থেকে খুলে ফুলটিকে রেখে দেয় যথাস্থানে। হাফিজদ্দি ফিরেএসে ফুলের ধ্বস্তরূপ দেখে সন্দেহ করে, এবং ফুলের মধ্যে দেখতে পায় চুল। খাবার সময় জিজ্ঞাসা করে আবেদাকে। সে অস্বীকার করে ভয়ে। কিন্তু হাফিজদ্দি চুলের প্রমাণ দেয় অকাট্যভাবে। ভয় হয়

আবেদার। তবে হাফিজদ্দি ভয় দেখানোর কোনো উদ্যোগ নেয় না, অভাবিতপূর্ব বাক্য বলে সে, "ফুলটা তরে দিয়া দিলাম যা।"[৩]

শ্রেণিচৈতন্য শহীদুল জহিরের ছিলো সুতীব্র, এবং সেই জীবনকে দেখার সহজাত ক্ষমতা ছিলো তাঁর মধ্যে। তিনি আবেদা-হাফিজদ্দির জীবনকে স্বল্পতম দূরত্ব থেকে অবলোকন করেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের জীবনের রঙ। তাই গল্পের মধ্যে রাঙাতে সক্ষম হয়েছেন সেই জীবন। একেবারেই উন্মুল, শাহরিক সংকীর্ণ বস্তিজীবনের দুই বাসিন্দা আবেদা ও হাফিজদ্দি। তাদের জীবনে ভালোবাসার প্রাচুর্যের চেয়ে ক্ষুধার দাপট বেশি। তাই ভালোবাসার প্রকাশ তাদের মার্জিত নয়, পরিপার্শ্ব থেকে দেখে যে শাহরিক ভালোবাসার পদ্ধতি তারা রপ্ত করতে চায় তার প্রকাশ তারা কল্পনা মোতাবেক প্রকাশ করতে পারে না। সে জন্য প্রয়োজনীয় রূপ আর পোশাক তাদের নেই, নেই ভাষা, স্বপ্ন তৈরি করলেও সে স্বপ্ন মিলে যায় সিনেমার দৃশ্যেরসঙ্গে। কল্পবাস্তব সিনেমার মতোই তারা ভালোবাসার প্রকাশ করতে চায় কিন্তু নিজেদের অক্ষমতা তাকে শেষ পর্যন্ত কর্কশ ও রূঢ়-ই করে রাখে। শহীদুল জহিরের শিল্পীমনে এই ঔচিত্যবোধ ছিলো প্রবল, ফলে তিনি নির্মোহ ভঙ্গিমার সঙ্গেই 'ভালোবাসা' গল্পের ভালোবাসা বর্ণনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক যুক্তি লেখকের মনে প্রবল ছিলো বলেই তিনি ফুল ছিঁড়তে গেলে হাফিজদ্দির মনে অন্যান্যদের মতো শহীদ দিবসের আবেগ জাগাতে পারেননি, কেননা শহীদ দিবসের উদযাপন প্রধানত মার্জিত রুচির অভিপ্রায়জাত। ফলে হাফিজদ্দির মনে ওই সময়ে ফুলের প্রতি ভিন্ন ধরনের আবেগ জাগ্রত হয়েছে, সেটি হয়তো স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তার কাছে। কিন্তু ফুল দিয়ে স্ত্রীকে ভালোবাসাটা হয়তো তার কাছে ঈষৎ লজ্জার ব্যাপার, অথবা স্বামী(প্রভু) হিসেবে স্ত্রীর কাছে নত হওয়ার ব্যাপার কিংবা সে ফুলটি তৎক্ষণাৎ দিতে চায় নি আবেদাকে, অপেক্ষা করছিলো একটি মুহূর্তের, যখন বুকের ভেতর জ্বালা উঠবে স্ত্রীকে কাছে পাবার। কাজেই ভবিষ্যতের ভালোবাসার নিদর্শনকে বাঁচিয়ে রাখতে বোতলে ভিজিয়ে রাখতে চায় সে।

অন্যদিকে আবেদার মানসগড়ন শহীদুল জহির এঁকেছেন ভিন্ন উপকরণে, এদেশীয় নারীর প্রত্নচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য মতোই সে পতিভক্ত। তবু পরের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করা আবেদার মন খানিকটা শাহরিক অন্দরমহলের বাসনামোড়া। তাই সে স্বামীকে ভয় যেমন পায় তেমনি আকাঙ্ক্ষা করে তার রোমান্টিক স্পর্শের, সিনেমার নায়িকাদের মতো নায়কের আকস্মিক সুখস্পর্শের চিন্তা তার মনে জেগে ওঠে স্বাভাবিকভাবেই। তাই তাকে ডাকার পর হাফিজদ্দিকে যখন সে ফুল হাতে ঝুপড়িতে ঢুকতে দেখে তখনই তার মনে হয় "খেপলো নাকি লোকটা। নইলে দিনদুপুরে ফুল হাতে করে বাড়ি

ফিরল যে মরদ! আর ওকেইবা ডাকল কেন? ঘরে ঢুকতেই সিনেমার নায়কদের মতো খোপায় পরিয়ে দেবে না তো আবার?"[৩] এই ভাবনায়, শহুরে রুচির সঙ্গে তার আকাঙ্ক্ষা যে বেখাপ্পা সেটিও মনে আসে তার। ডাক শুনে তাই পানি ঢালা ভেজা চুলগুলো সে খোঁপায় গুছিয়ে ফেলল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভাবল "আঁশের মতো পাতলা আর তেলহীন রুক্ষ চুলগুলোর কথা ভেবে ওর মন খারাপ হয়। যে ছিরি চুলের, এই চুলে কি ফুল মানায়?"[৪]

কিন্তু আবেদার এই কিঞ্চিৎ শহুরে ভাবনার সঙ্গে হাফিজদ্দির অমার্জিত ভাবনার সংশ্লেষ সংঘাতপূর্ণ, ফলে আবেদার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়, হাফিজদ্দি কোনোভাবেই সিনেমার নায়কের মতো আচরণ করে না। বরং তার মন বিক্ষিপ্ত হয় আবেদার চুল ঝাড়া পানিতে। সে চলে গেলেও আবেদার মনে উদ্ভূত প্রেমবাসনা জেগে থাকে, ফুলকে ঘিরে তা হয়ে ওঠে ঘনায়ত। তাই "হাফিজদ্দি চলে গেলে বোতল থেকে ও ফুলটা উঠিয়ে নেয়। আঙুল বুলায় অনেকক্ষণ। চুল খোঁপা করে তাতে গুঁজতে চেষ্টা করে। ভারি ফুল বারে বারে খসে পড়ে। শেষে হাত দিয়ে খোপার পাশে চেপে ধরে ও ছোট আয়নায় নিজেকে দেখে। ঘরের অন্ধকারে দেখে ওর তৃপ্তি মেটে না। বাইরেআলোয় যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাইরে যাওয়া যাবে না, চারিদিকে লোক, জানে ও।"[৫] আবেদা সংবরণ করে নিজেকে।

কিন্তু মনের মধ্যে যে কেয়ার কাঁটা বিঁধে আছে তার প্রচ্ছন্ন বেদনাতিক্ত সুখ থেকে যায় মনের গহীনে, আসন্ন সন্ধ্যায় হাফিজদ্দিকে ঘিরে আবার জেগে ওঠে তা। ভিজিয়ে রাখা ফুলে তার জড়িয়ে যাওয়া চুল হাফিজদ্দির কাছে প্রমাণ করে ফুলের প্রতি তার জমে থাকা অনুরাগ। সেই অনুরাগেই হয়তো সুপ্ত প্রীতিবাসনা উদ্দীপিত হয় হাফিজদ্দির মনে। কোমলতাহীনঅমার্জিত কণ্ঠে তাই সে আবেদাকে আচানক বলে "ফুলটা তার দিয়া দিলাম যা।" হাফিজদ্দির গলায় কোনো কোমলতার কাঁপন নেই তবু এই বাক্য শুনে কি এক সুখে আবেদার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। এ যেন সিনেমার নায়কের মতোই এক আকস্মিক আচরণ, যার মোহময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে হয়ে আবেদা; পরম সুখে চুমু খায় সন্তানের কপালে।

অভিন্ন জীবনের যাপনপদ্ধতি, একই সমান্তরাল রেখায় অবস্থান দুজনের, তবুও স্বপ্নের লালন ও পূরণের প্রকল্পনায় পৃথক দুজন। খানিক নগরজীবনের অভ্যন্তরের অভিজ্ঞতা আবেদাকে ঈষৎ-মার্জিত সিনেমাটিক স্বপ্নে প্রলুব্ধ করে, কিন্তু কিঞ্চিৎ দূরত্বের ব্যবধান হাফিজদ্দিকে ওই আচরণে ইতস্তত করে তোলে। তবুও ভালোবাসার জাগরণে দুজন এক অপরের আকাঙ্ক্ষী, তবুও যে কোনো রূপে ভালোবাসার প্রকাশে দুজনে সমান আগ্রহী।

শুধু স্বপ্নের বিভোরতা ও প্রকাশের বৈচিত্র্য নয় শহীদুল জহির আবেদা- হাফিজদ্দির সমাজের উৎপাদন কাঠামোগত অবস্থানও নির্দেশ করেছেন তাদের পেশা, বাসস্থানের মান ও রুচির প্রকাশপদ্ধতির মাধ্যমে। তাদের ভাষা ও শব্দের ব্যবহার তাদের করে তুলেছে প্রাণবন্ত। এক বস্তির বাসিন্দা হওয়ায়[৬] গল্পের চরিত্রগুলো নিজেদের ভব্যতার স্তর নিয়ে ভাবেনি, ভাবেননি লেখক নিজেও; চরিত্রগুলো সবাক হয়ে উঠেছে নিজেদের বাগভঙ্গিতেই। শহীদুল জহির সেই বাগভঙ্গিমা অসংস্কৃতরূপেই গল্পে ব্যবহার করেছেন:

> হাফিজদ্দি মুখ তুলে মেয়ের (তহুরা) খাওয়া দেখে। (আবেদাকে) বলে, তুই ফুলে হাত দিছিলি কিয়ের লাইগা?
>
> আবেদা বুঝতে পারে না কাকে বলছে হাফিজদ্দি। বলে, ক্যাডা, আমি?
>
> হ। তয় আর ক্যাডা?
>
> আমি ফুলে হাত দিমু কিয়ের লাইগা? উষ্ণ হয়ে ওঠে আবেদা, যে আমার ঘোড়ার আন্ডার ফুল![৭]

তোরাব সেখ

শহীদুল জহিরের অস্তিত্বকামী ব্যক্তিত্ববোধজাগর চরিত্র নিয়ে লেখা অসাধারণ গল্প 'তোরাব সেখ'। অনেকটা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পের চারিত্র্য এ-গল্পে পরিস্ফুট এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রের অন্তর্বিন্যাসেও লক্ষ করা যায় সৈয়দীয় ঢঙ। বয়োবৃদ্ধ বেকার দিনমজুর তোরাব সেখের একদিকে পরনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা, আত্মনির্ভরশীল হবার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে সন্তান-সন্ততিদের কাছে পিতৃ-অস্তিত্ব দাবি করেহৃতসর্বস্ব হওয়ার কষ্ট গল্পটিকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। তীব্রভাবে অস্তিত্বসচেতন তোরাব সেখ ক্রমবিলীয়মান অস্তিত্বের সংকট উপলব্ধি করেই ঘনায়মান অন্ধকারে মিলিয়ে যায় শেষপর্যন্ত।

এক বিরুদ্ধ প্রতিবেশের বর্ণনায় গল্পের শুরু করেছেন গল্পকার, যা জীবনের প্রতি বিরূপ, বিরূপ সমাজও। উচ্চ স্তরের মানুষের গাড়ির ধোঁয়া আর ধুলা তীব্র লাঞ্ছনাবোধ জাগ্রত করে তোরাবের মনে। কিন্তু সঙ্গী পায়না সেটি জিইয়ে তোলার। কারণ কর্মব্যস্ত জীবনের টানে বস্তির সব বাসিন্দাই চলে গেছে কাজে, ফলে সে দেখতে পায় "একটা লোকও নেই সারা বস্তিতে, যে এই চরম লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে ওর সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে পারে। জোয়ান মেয়ে মরদ সব বাইরে। কিশোর কিশোরী এমনকি তোরাবের ত্রিশ বছরের প্রায় অথর্ব সঙ্গিনীটি পর্যন্ত।"[৮]

এমতাবস্থায় সংকট ঘনীভূত হয় তোরাবের, নিজেকে বাতিল মনে হয়, "তোরাবের খারাপ লাগে রোগ কাতর বুড়ো হওয়ার জন্য।"[৯] বয়সের আয়নায় দেখা নিজের রিক্তরূপ তাকে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, তাই সে "শিরা ফুলে ওঠা গিঁটলো আঙুলগুলো ফোটায় টিপে টিপে। বাহুর ঝুলে পড়া শিথিল পেশিগুলো ফুলাতে চেষ্টা করে। ফুলিয়ে শক্ত গুলটি বানাতে চেষ্টা করে। কিন্তু জীর্ণ পেশি কাঠিন্য অর্জনে ব্যর্থ হয়।"[১০] তবে তাতে আশাহত হয় না তোরাব, কারণ পাণের স্পন্দন ছুঁয়ে যায় তাকে, এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে, ফলে সে "প্রফুল্ল বোধ করতে চেষ্টা করে।"[১১] এই প্রফুল্লতার চেষ্টা তার মধ্যে প্রেরণাবোধ সঞ্চারিত করে, সে নিজেকে অবহেলিত বা পতিত ভাবতে নারাজ, তাই তো প্রতিবেশী নিজামের সঙ্গে ঠেলা বওয়ার সুযোগ চায়, মনে সাধ– পড়ে থাকবে না সে অন্যের গলগ্রহ হয়ে। তাই নিজাম যখন তোরাবকে পরের দিনে কাজে আমন্ত্রণ জানায় এবং সংশয় প্রকাশ করে বলে যে, "অনেক দূরের খ্যাপ কইলাম। এই দূরের মইদ্দে কুলাইবার পারবা তো।"[১২] তখন সেই সন্দেহ তোরাবের অহমে আঘাত করে, উঁচু স্বরে সে জানায় আপত্তি, "পারুম না কি অইছে! ওর বার্ধক্যের প্রতি নিজামের ইঙ্গিতে ওর ক্রুদ্ধ গলার শিরা কাঁপতে থাকে উত্তেজনায়।"[১৩]

এই ব্যক্তিত্ববোধে ভাস্বর তোরাব গল্পের শেষাবধি নিজের উপর থাকে বিশ্বস্ত। সেই বিশ্বাস থেকেই সে নিজের পিতৃত্ব-চেতনায় মুখর হয়, কন্যার মঙ্গলচিন্তায় প্রকাশ করে নিজের মতামত। কন্যা লালবানুর সজ্জায় তাই দৃষ্টি দেয় তোরাব সেখ। লালবানু যখন খুলে রাখে কানের দুল তখন সে তার কারণ জিজ্ঞাসা করে, মনে মনে সন্দেহ করে পিতার মতোই, সন্তান বুঝি কোনো অবৈধ পন্থায় অর্জন করেছে কানের দুল, সন্দেহ থেকেই জিজ্ঞাসা করে "চুরি করস নাই তো?"[১৪] এ যেন সন্তান বেপথু হয়ে যাবার সংশয় ঝরে পড়ে তার মুখ থেকে। কিন্তু সংসারের অন্য সদস্যদের কাছে জমা থাকে তার জন্য বিরক্তিবোধ, ভালো হয়তো তারা সকলেই বাসে তাকে, কিন্তু অশিক্ষিত-অমার্জিত শ্রেণির মুখে গোছানো ভালোবাসার বাক্য ঝরে না কোনো দিন। তারা হয়তো এই বয়সের তোরাব সেখ কে সাংসারিক ঝামেলায় জড়াতে চায় না আর। তাই তার সন্দেহের বিপরীতে তার স্ত্রী রহিমা ক্ষেপে উঠে বলে, "এমুন কতা হুনায়ো না তুমি, চুরি করে না কোন সাবে?"[১৫]

কিন্তুসাহেবদের সাথে পাল্লা দিতে চায় না তোরাব, সে চায় সন্তান তার সৎ থাক, সুন্দর থাক, সেই চেতনা থেকেই বলে, "সাবগো কতা আমারে শুনাইছ না তুই।"[১৬] একপ্রকার ব্যক্তিত্বভাস্বর দায়িত্ববোধের তাড়নাতেই তোরাব সেখ চালিত হয়, তাই প্রচণ্ড খাটুনি হলেও "এই দুর্দিনে সংসারে কয়েকটা টাকা যোগ করতে পারায় ওর মনে তৃপ্তির একটা ফুল্ল ধারা বয়ে যায়। ক্ষণকালের জন্য গ্লানি বিস্মৃত হয়।"[১৭] সমকালের অর্থনীতিতে উৎপাদক হিসেবে বাজারে যে তার মূল্য কম সে ভাবনাও তার

চিন্তাসূত্রে গ্রথিত, কর্মক্ষম পুরুষের বিপরীতে নিজের অবস্থানও তার জানা আছে "কিন্তু ও পুরুষ নয়, বুড়ো। পুরুষ মানুষেরই প্রত্যেকদিন কাজ জোটে না, বুড়োদের জুটবে কোত্থেকে!" আবার "প্রত্যেকদিন ভারি মালের খ্যাপ থাকে না। তাই বাড়তি সাহায্যকারীর দরকার হয় না নিজামদের।" তাই "তোরাবের মনে কর্মহীন আগামীকাল গ্লানিকর ঠেকে।"[১৮] এই কর্মজাগর কর্মী, আত্মজাগর পিতা তোরাব পরিবারে নিজের অবস্থানগত অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চায় প্রচণ্ডভাবে।

সরাসরি দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তোরাব যখন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলে তার মতামতের বিরুদ্ধে লালবানুকে বিয়ে দিতে চায় মজিদ মিয়ার সাথে। এখানেই প্রকট অস্তিহীনতার মধ্যে পতিত হয় তোরাব, সবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন স্নেহশীল দায়িত্ববান পিতার কণ্ঠ জেগে ওঠে তার মধ্যে, তার দৃষ্টিতে দোজবরে শয়তানতুল্য মজিদ কোনোভাবেই লালবানুর যোগ্য নয়, তাই সে যখন জানতে পারে যে, শুধু পুত্র নয়, স্বয়ং কন্যাও সে বিয়েতে রাজি তখন অভিজ্ঞতার প্রাবল্যে কিংবা জনকের অহমপ্রাচুর্যে উচ্চ হয় তার কণ্ঠ "লালু রাজি হওনেও কুনো কাম অইব না। ... আমি বাইচ্চা থাকতে খালি পয়সার লালচে ওই কুত্তার ঘরে লালুরে পাঠামু না।"[১৯]

কিন্তু বাইরের কাজ সেরে কন্যা লালবানু যখন ঘরে ফেরে তখন কন্যাকে দেখে তোরাবের মনে বাস্তবতা অদ্ভুত কেলায় মেতে ওঠে, নিজের পারিবারিক অবস্থান স্পষ্ট হয় তখন, "তোরাব মেয়েকে দেখে। ওর ও কেমন যেন ভয় লাগতে থাকে লালবানুকে। তোরাব অনুভব করে লালবানু বড় হয়ে গেছে। কিশোরী থেকে দ্রুত যুবতী হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারে, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেয়ার মাতো শক্তিও লালবানু অর্জন করে ফেলেছে। সে কোনোভাবেই তোরাবের হাতের মুঠোয় নেই। সে তো তোরাবের পোষ্য নয়। বরং তোরাবই ওদের পোষ্য। তোরাবের কেমন দুর্বল লাগে।"[২০]তবুও পিতা কন্যাকে বোঝায়, দেখায় ভয়। কিন্তু "লালবানু তোরাবের নির্দেশ মেনে নেয় না। তিন দিন পরেই ও পালায়।"[২১] পরিবারের অন্য সবার যোগসাজশ থাকলেও তোরাব জানতে পারে না কিছুই, পরিবার তাকে করে রাখে বিচ্ছিন্ন। তারপর ঘটনার দিন যখন লালবানু সময় মতো ঘরে ফেরে না, পিতার চিত্ত কেঁপে ওঠে শঙ্কায়। তদুপরি পুত্র জমির যখন জানায় "লালু আর আইব না।" তখন "তোরাবের মাথায় রক্ত চড়ে যায়। ঝিমঝিম করে কপালের স্ফীত শিরাগুলো। ওর ইচ্ছে হয় জমিরের গলার গিঁটটা কামড় দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে। ঘরদোরে আগুন ধরিয়ে দিতে।"[২২]

ঠিক তখনই এই পরিবারে তার অস্তিত্বশূন্য অবস্থান পরিষ্কার হয়ে যায় তারদৃষ্টির সম্মুখে। সবাইকে বের করে দিতে চায় ঘর থেকে। কিন্তু চাইলেই তো আর পারা যায় না। তার মতো আয়শূন্য মানুষের পক্ষে সে চাওয়া অনেকটা ধৃষ্টতা। জমির সেই বাস্তবতা আরও স্পষ্ট করে দিয়ে বলে "এই ঝুপড়ি

তোমার নামে এলুট, আর ভাড়া দেয় এই জমির‍্যা। তুমার খারাপ লাগলে তুমি যাও গা।"[২৩]বহুদিনলালিত স্বপ্নবাগানতুল্য সংসার থেকে এভাবে বিতাড়ন হয়তো সহজে মানতে পারে না তোরাব, পুত্রের শেষ সিদ্ধান্ত জানার জন্য চিৎকার করে ডাকে পুত্রকে "আমার কতা হুইনা যা জমির, আমার কতা হুইনা যা।"[২৪] কিন্তু পুত্র চলে যায়, ক্রমভঙ্গুর পিতার দিকে ফিরেও তাকায় না। তাই "সারাটা মন ওর বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। বলে, তগো মুখ আমি দেকবার চাই না।"[২৫] তারপর "তোরাব অন্ধকারে হারিয়ে যায়।"[২৬]

ক্রমেই ভেঙে পড়া অহমের পরাক্রমী বিচ্ছিন্নতাবোধ তোরাবকে আড়াল করে দেয় পরিচিত বলয় থেকে। প্রতিদিনকার সাধারণ মান-অভিমানের মানদণ্ডে বিচার করে পরিবারের সদস্যরা অপেক্ষায় থাকে তার প্রত্যাবর্তনের, দিন যায়, সবাই উৎকণ্ঠিত হয়। একদিন জমিরও কেঁপে ওঠে বুকের ভেতরকার বেদনায়, "জমিরের বুকের ভেতর একটা কষ্ট হয়, বুড়োটার জেদের কাছে পরাজয়ের কষ্ট। সে আশা করে তোরাব এসে পড়বে, এসে দাঁড়াবে, আর সে বলবে, আহন লাগল তো, কেমুন!"[২৭] কিন্তু স্বপ্ন তার স্বপ্নই থেকে যায়। "দিনের প্রান্তে রাত এসে দাঁড়ায়। রাতের শেষে দিন ঘুরে আসে। কিন্তু তোরাব আসে না। রহিমা চেপে কাঁদে। জমির কষ্ট আর বুকে আশা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তোরাব আসবে। শালার বুইড়া আগে ফিরা আহো একবার– তোরাব আসে না।"[২৮]

এই চিরন্তন অপেক্ষার চিত্রাঙ্কনে গল্পের শেষ টেনেছেন গল্পকার শহীদুল জহির। পরিবারের সদস্যরা যেন হেলায় হারিয়েছে 'পরশ পাথর', যেন তারা 'গডোর প্রতীক্ষায়' তাকিয়ে আছে ভবিষ্যতের দিকে। তবে এই অপেক্ষা প্রদর্শন শহীদুল জহিরের একক লক্ষ্য নয়, তোরাবের ব্যক্তিত্বের বিপরীতে বিরুদ্ধ বাস্তবতা এবং অহমসম্পন্ন ব্যক্তির নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার বর্ণনাসূত্রে এক অস্তিত্ববাদী গল্পের ছক অঙ্কনও তার ঈপ্সা। উন্মুল-ভাসমান জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবনের মর্মমূলের বাস্তবতা দেখিয়ে সেখানে তিনি তোরাবের মতো চরিত্র কল্পনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন কীভাবে বিরুদ্ধ প্রতিবেশ তাকে বাধ্য করে অস্থিশূন্যতায় বিলীন হয়ে যেতে। 'তোরাব সেখ' সেই শূন্য অস্তিত্বের গল্প।

বাস্তববাদী শিল্পীর মতোই শহীদুল জহিরের লক্ষ্য বস্তুনিষ্ঠতার দিকে। বাক্যবয়নে লেখক তাঁর 'পারাপার' পর্বে ওয়ালীউল্লাহ্ ও ইলিয়াসের ধারাকে প্রবর্ধন করলেও পরবর্তীকালে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন স্বকীয় ভঙ্গি। প্রথম পর্যায়ে জহির নিষ্ঠার ছাপ রেখেছেন চরিত্রের ভাষা বয়নে, চরিত্রের মুখে দিয়েছেন শ্রেণিলালিত ভাষারূপ। মাটিলগ্ন, শ্রমসম্পৃক্ত চরিত্রগুলো কথা বলে উঠেছে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত শব্দবয়নে। কখনও নিজের আঞ্চলিকতায়, কখনও শহরের ক্লিশে উচ্চারণে আবার কখনও চর্চিত

বাংলায়। বস্তুত লেখক সততসচেতনতায় চরিত্রগুলোর বাগভঙ্গি নির্মাণ করেছেন প্রতিবেশলগ্ন যৌক্তিকতায়।

পারাপার

চৈতন্যপ্রবাহরীতির মুগ্ধকর ব্যবহার সহজেই 'পারাপার' গল্পের লেখককে ওয়ালীউল্লাহ্-ইলিয়াসের উত্তরসূরি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। 'পারাপার' গ্রন্থের নামগল্পটি মার্কসীয় শ্রেণিদ্বন্দ্বের সার্থকতম উদাহরণ[২৯]। তিনটি শ্রেণির প্রতিনিধি এ গল্পের কেন্দ্রকে উজ্জীবিত রেখেছে। সমাজকাঠামোর চূড়ান্তরের সঙ্গে নিম্নস্তরের যে সংঘাত এ গল্পের শেষাংশে দেখা যায়, গল্পের শুরু থেকে তাতে সংযোগের কাজ করে মধ্যস্তরের এক প্রতিনিধি। স্তরায়িত সমাজকাঠামোর মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে আগত চরিত্রটির চৈতন্যের দ্বান্দ্বিকতা এ গল্পের মূল উপজীব্য। ওলি নামের চাকরিপ্রত্যাশী এই চরিত্রটির একটি দিনের জীবনাভিজ্ঞতা নিয়েই আবর্তিত হয়েছে গল্পটির কাহিনি।

শিক্ষিত বেকার যুবক ওলির চিটাগং থেকে চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে ফেরার পথে 'পারাপার' গল্পের শুরু। সিরাজগঞ্জ জেলার কোনো মফস্বল বা গ্রামের এই যুবক রোমান্টিক স্বপ্নচারী, মধ্যবিত্তীয় রুচির সঙ্গে অভ্যস্ত। বেকার অবস্থার এক নেতিবোধ তার মনে মাঝে মাঝে ক্রিয়াশীল, একই সঙ্গে তার নিজের শ্রেণি থেকে উত্তরণ প্রয়াসী কিন্তু একটু নিম্নশ্রেণির প্রতি মমত্ববোধও তার মনে স্বতঃস্ফূর্ত। এই ধরনের রূপান্তরকামী মনস্তত্ত্বের দ্বিধাগ্রস্ত আচরণ এই গল্পের মূল অনুঘটক। ওলি হয়তো মাটিলগ্ন উৎপাদনসম্পৃক্ত সমাজের উত্তরাধিকার, তার চেতনায় বহমান মাটির গন্ধ কিন্তু শিক্ষার আলো তাকে শ্রেণি পরিবর্তনের যোগ্যতা দান করেছে, মার্জিত বোধ তাকে দিয়েছে রোমান্টিক কল্পক্ষমতা। এ দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে থেকে শিশুশ্রমিক আবুল ও বশিরের পক্ষ নিয়ে শেষপর্যন্ত সে নিজের উৎসমূলের কাছেই ফিরে যায়। বুর্জোয়া-প্রতিনিধির শোষণের প্রতিবাদে ফেটে পড়ায় তার শ্রেণিগত অবস্থান নির্ণিত হয়, দ্রোহের শক্তি তাকে বিদ্রোহীতে পরিণত করে।

চিটাগাং থেকে চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে ট্রেনে ফেরার সময় ওলিকে যমুনার জল পাড়ি দিতে হয় জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে এসে। এই ঘাটেই 'পারাপার' গল্পের শুরু করেছেন লেখক। নিজের জিনিসপত্র তেমন নেই ওলির যা কুলি দিয়ে পার করাতে হয় কিন্তু 'সাহেব সাহেব ধরনের বয়স্ক চেহারার' এক লোক যখন তার দুটো বেডিং রেখে যায় ওলির তত্ত্বাবধানে তখন সে আপাতত মালিক বনে যায়। তার কাছে এগিয়ে আসে দুটি শিশু কুলি। তারা অর্থ আয় করতে চায় মোট বহন করে। ওলি তাদের কাছে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। কিন্তু শিশুর বায়না থামে না। অগত্যা আরও একটা দায়িত্ব নিয়ে নেয়

সে। বেডিঙের মালিককে সে রাজি করাবে যেন তাদের দিয়েই মাল বহন করায় সে। পারিশ্রমিক ঠিক হয় তিন টাকা। তারপর জমে ওঠে আলাপ। তাদের মানবেতর জীবন-কাহিনি ও ঘাটের নিয়মিত কুলিদের অত্যাচারক্লিষ্ট বর্তমান বাস্তবতা আহত করে ওলিকে, সে চায় এমন কিছু করতে যা তাদেরকে দিবে আপাত নিশ্চিত জীবনের অধিকার। তাই ভবিতব্যের কল্পনা খেলে যায় ওলির কল্পপটে– "ওলি ওর চাকরিটির কথা ভাবল। রেলের চাকরি টিকিট চেকারের। চাকরিটা হবে কি? যদি হয়, আর যদি ওকে ঘাটেই নিয়োগ করা হয় তাহলে ও ছেলে দুটোর জন্য কিছু একটা করবে।"[৩০] এই কল্পনা ও ইতিবোধ ওলিকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে আবুল ও বশির নামক কুলিশিশু দুটির। উঠতি মধ্যবিত্তের এ যেন সহজাত বৈশিষ্ট্য, অপেক্ষাকৃত নিম্নের প্রতি অনুরাগ, তার পক্ষাবলম্বন এবং উচ্চবিত্তের দার্ঢ্যের প্রতি বিরাগ।

বিরাগ এতো তাড়াতাড়ি প্রকাশ পায় না এ গল্পে, শোষণের মাত্রা যখন ছাড়িয়ে যায় সহ্যের সীমা, দরিদ্রের সৌন্দর্য তখন বিদ্রোহে প্রকাশ পায়। ওলিও এ গল্পে ফেটে পড়ে শেষের দৃশ্যে, তার আগে জমতে থাকে ক্ষোভ। সাহেব লোকটি, যে কি না উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা (চরম বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি), সে এসে যখন সহজে গ্রহণ করতে চায় না ওলির প্রস্তাব, মেনে নেওয়ার আগে দরদাম করে শিশু দুটির সঙ্গে এবং মমতাবিবর্জিতভাবে মজুরিতে ঠকানোর চেষ্টা করে, ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে তখনই। ওলির মনে হতে থাকে "ও কি অসহায়। কী বীভৎস রকমের ফাঁপা।"[৩১]এছাড়া লোকটির আচরণে যখন তার প্রতি এক রকম ঘৃণাভাব ফুটে ওঠে, যেমন ফুটে ওঠে মানুষের দালালদের প্রতি, সেটি লক্ষ করে 'ওলি বুকের ভেতর একটা বিশ্রী যন্ত্রণা অনুভব' করে। 'এক দুর্বোধ্য অপমানের ক্ষত' চাটতে থাকে সে। এরপর যখন আবুল লোকটার একটি বেডিং ফেলো দেয় নদীতে অপারঙ্গমতাবশত এবং লোকাট পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আবুলকে বেঁধে ফেলে তখন সে আবুলের পক্ষে এগিয়ে কথা বলতে এলে নিজেই তীব্রভাবে হয় অপমানের শিকার। লোকটি তাকে স্পষ্টভাবে দালাল বলে অভিহিত করে, 'ওর হৃৎপিণ্ডটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে' যায়। নিজের অস্তিত্ববোধ চলে যায় শূন্যের সীমায়, ধূমায়িত হতে থাকে ক্ষোভ।

পরে ঘটনার জের ধরে লোকটি যখন নিজের ক্ষমতা প্রদর্শনের পাশাপাশি ওলিকে ধরাশায়ী করে'স্কাউন্ড্রেল' বলে ওলির গালে কষে চড় দেয়, তখন চোখের জল নেমে আসে ওলির, ফানুসের মতো মার্জিতভাবের মধ্যবিত্তীয় কেতাবি খোলস ভেঙে যায় তার, অস্তিত্বের চরমসংকটে ফেটে পড়ে ক্ষোভে। ক্ষোভের অনল উত্তপ্ত করে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে, সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে দেহের সর্বত্র, চকিতে ধরাশায়ী করে ফেলে আগ্রাসী শোষককে। লেখক এই অংশের বর্ণনা করেছেন অনন্য

অনুপুঙ্খতার সঙ্গে: "ওলি ঠোঁটে নোনা পানির স্বাদ পেল। চকিতে বোধ আর বোধহীনতাকে তুচ্ছ করে, একটি অনুজ্ঞা রক্তের ভেতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহের মতো দ্রুত শরীরের সর্বত্র, আঙুলের ডগায়, চোখের তারায়, হাতের পেশিতে সঞ্চারিত হয়ে গেল। আঙুলের ডগা গুটিয়ে মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে গেল, চোখের তারায় দুপুরের রোদ খেলে গেল, হাতের পেশি চিতার মতো তৈরি হয়ে গেল। ওলির ডান হাতের মুঠটা লোকটার চোয়াল স্পর্শ করল। ছিটকে পড়ে গেল লোকটা।"[৩২] তার এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধে মুক্তির স্বাদ পায় আবুল, ওলি হয়ে যায় শোষিত-শ্রমজীবীর মুক্তির দূত, কেননা, লোকটি ছিটকে পড়ার সাথে সাথে "নিজেকে ছাড়িয়ে মুক্ত করে নিল আবুল, দৌড় দিল ফ্লাট পার হয়ে স্টিমারের পেছন দিকে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যমুনার কালো ঘোলা পানিতে।"[৩৩]

চরিত্রের স্বপ্ন, অভিরুচি, ক্রিয়াকলাপ সবকিছুতেই শহীদুল জহির শ্রেণিচেতনার সাক্ষ্য রেখেছেন গল্পটিতে। মার্কসীয় বিবেচনায় সমাজের যে তিনটি স্তর দেখা যায় তার প্রত্যেকটি স্তরের প্রতিনিধি এই গল্পে উপস্থিত। নিম্নস্তরে রয়েছে উৎপাদন ও মজুরির সঙ্গে সম্পৃক্ত সর্বহারা আবুল ও বশির, মধ্যস্তরে ওলি এবং উচ্চস্তরে সরকারি কর্মকর্তা সেই লোকটি, যে শাসনের সঙ্গে যুক্ত, ভোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং শোষণ যার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার। চরিত্রের শ্রেণিগত বিন্যাসের সাথে সাথে শহীদুল জহির অন্তন্যাস করেছেন তাদের চারিত্রিক মৌলপ্রবণতাসমূহ। দেখিয়েছেন প্রতিটি স্তরের চরিত্রের পরিবর্তমান আকাঙ্ক্ষার প্রন্যাস।

মার্কসীয় সূত্রমতেই প্রতিটি স্তরের চরিত্র স্তর-উত্তরণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তৎপর। ছিন্নমূল, মৃত্তিকালগ্ন কুলিশিশু আবুল ও বশির তাদের দুর্দিন ঘুচিয়ে পেতে চায় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, তাই তারা স্বপ্ন বাঁধে ওলিকে কেন্দ্র করে, তার কাছেই আবদার মেটাতেচায়। তারা ওলির মাধ্যমে নিজেদের সুদিন আনতে পারবে এমন বিশ্বাসে আস্থা রাখে ওলির ওপর; মনে-প্রাণে প্রার্থনা করে যাতে ওলির চাকরিটা হয়। কেননা ওলি তাদের সুন্দর দিনের নিশ্চয়তা দিতে চায়। অন্যদিকে রূপান্তরকামী ওলিও হয়ে উঠতে চায় নিপীড়িতের নেতা। সদ্য বিবর্ধমান মধ্যবিত্তের খোলসে আবদ্ধ ওলি মাঝে মধ্যে মধ্যবিত্তের পলায়নপরতায়ও আক্রান্ত হয়, কখনও কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেকে বাঁচিয়ে পালানোর চেষ্টাও দেখা যায় তার মধ্যে।

আবার শিক্ষিত যুবকের আত্মপ্রদর্শনের অহমও পরিচালিত করে তাকে। তাই সরকারি লোকটি যখন ওলির কাছে বেডিং রেখে ফিরে আসার সময় দুজন অল্পবয়স্কা মেয়ে নিয়ে আসে, তাদের সামনে সে নিজের রুচিশীল মার্জিতভাব তুলে ধরার চেষ্টা করে- "ওলি দেখল মেয়ে দুটোকে নিয়ে লোকটা ফিরে আসছে। ও হঠাৎ ভীষণ উত্তেজনা অনুভব করল। উঠে দাঁড়িয়ে একটু হেঁটে গিয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে

ফেলে দিল। গভীর করে দম নিল। আঙুল ফোটাল।"[৩৪] আবার আবুলকে ধরে ফেলার পর সে যখন তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যায় তখন সরকারি লোকটি তাকে সম্বোধন করে 'আপনি সেই দালালটা না?' এই কথা শুনে বা চ্যালেঞ্জ শুনে সে হকচকিয়ে যায়, বিভ্রান্ত হয়। এই বিভ্রান্তি মধ্যবিত্তের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিপ্লবের মধ্যেও কার্যকর থেকে তা কখনও কখনও করে দিতে পার নস্যাৎ। তাই এই বিভ্রান্তির মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুতের মতো খেলে যায় পিছিয়ে যাওয়ার চিন্তা – "ওলির হৃৎপিণ্ড চাবুক খেয়ে এক মুহূর্ত যেন থেমে থাকল। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। ও সরে পড়তে চাইল। ওর মনের ভেতর থেকে কেউ, বোধ হয় যুক্তি, বুদ্ধি, ওকে জানাল সরে পড়াই ভালো।"[৩৫] এবংবিধ বৈশিষ্ট্যসমেত ক্যানভাসেই শহীদুল জহির স্তরায়িত সমাজের প্রতিনিধিদের চরিত্রচিত্রণ করেছেন এবং এক স্তর থেকে অস্তিত্বের প্রয়োজনে আরেক স্তরে উত্তরণ দেখিয়ে স্তর থেকে স্তরে পারাপারের গল্প ফেঁদেছেন। তাঁর এই গল্পবীতংসের নাম 'পারাপার'।

তিনটি শ্রেণির প্রতিনিধিদের মুখের ভাষা প্রদানেও লেখক রেখেছেন মনোযোগের স্বাক্ষর। নিম্নশ্রেণির আবুল ও বশির এখানে একেবারেই মৃত্তিকাগন্ধী শব্দ ব্যবহারে প্রোজ্জ্বল। শোষকের ভাষা মার্জিত বুর্জোয়া ছাঁচের তৈরি। কিন্তু ওলির শব্দ ব্যবহারে রয়ে গেছে দ্বিধাসিক্ত দ্বিচারিতা। সে আবুল-বশিরের শব্দে প্রাণোচ্ছল এবং সরকারি লোকটার ভাষাকাঠামোর প্রতি সচেষ্ট আগ্রহী। ভাষার এই দ্বিমুখিতা এই প্রকারের সুবিধাবাদী চরিত্রের বিপজ্জনক আচরণ-নির্দেশী। কিন্তু ওলি এখানে স্বয়ং অত্যাচরিত বলেই শেষপর্যন্ত আবুল-বশিরের শ্রেণির সঙ্গে আত্মনিয়োগ করে নিজের অবস্থান তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছে।

মাটি এবং মানুষের রং

কবেকার কোন আর্যজাতি আদি ভারতের কালোরঙে মিশিয়েছিলো সাদা রঙের প্রলেপ, তারপর সেই সাদা রঙের প্রতি দুর্বল করে ফেলেছিলো সমগ্র ভারতকে। প্রাচীন ভারতের শ্যাম রঙের সৌন্দর্য রূপান্তরিত হয়েছিলো গৌরাঙ্গে। তারপর থেকে সাদা মানে সুন্দর, কালো মানে বিশ্রী। মাঝখানে পারস্য-উত্তরাধিকারদের গৌর রঙের শাসন এবং গোরা ইয়োরোপীয়দের শোষণ এই ভারতীয়দের মজ্জাগত করে দিয়েছিলো যে, ধবল মানেই বিজয়ী আর কৃষ্ণ মানেই বিজিত। সেই থেকে ভারতীয়দের মনের কোণে 'ব্ল্যাক স্কিন হোয়াইট মাস্ক'[৩৬] - এর বর্ণপ্রধান খেলা চরম উত্তেজনায় নিজের অস্তিত্ব নিয়ে নেয়। ভারতীয় বাঙালিদের মধ্যে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতেই বর্ণবাদী বিশ্বাস স্থায়ী আসন পেয়ে যায়। 'মাটি এবং মানুষের রং' গল্পটিতে শহীদুল জহির এদেশীয় মানুষের সেই সৌন্দর্যবোধকে

প্রধান করে উত্তর-উপনিবেশী চিন্তাধারাদেখাতে চেয়েছেন। বর্ণবাদী চিন্তা এ গল্পটির অন্তঃকোষে প্রসৃত থাকলেও লেখক মাটিলগ্ন মানুষের জীবন বাস্তবতা, তাদের শ্রেণিচৈতন্যকেও অপ্রধান বিবেচনা করনেনি। এ দুয়ের সন্নিবেশনে তাঁর গল্পটি হয়ে উঠেছে দ্বি-স্তরিক পাঠসম্ভব গল্প[৩৭]।

গল্পটি তৈরি করতে গিয়ে শহীদুল জহির উপরিতলে একটি নিতান্ত সাধারণ আখ্যান প্রযুক্ত করেছেন, তার প্রধান চরিত্র আসিয়া বেগম এবং আম্বিয়া খাতুন। দূরাত্মীয় পড়শিকন্যা আম্বিয়া, একসময় তার চাপা সৌন্দর্য-গুণে মুগ্ধ হয়ে পুত্রবধূ করতে চাইলেও এই গরিবদুহিতা আম্বিয়ার গায়ের রঙের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে আসিয়া বেগম পুত্রবধূ করেআনে সাদা-ফর্সা রঙের মেয়ে ময়নাকে; মনের আকাঙ্ক্ষা এবার ভবিষ্যৎ বংশধর কালো রঙ না হয়ে হবে ময়নার মতো সুন্দর গায়ের রঙের। কিন্তু আশা ভঙ্গ হয় আসিয়া বেগমের, পৌত্র ফয়জুদ্দি ওরফে ফজু পায় পিতা-পিতামহের গায়ের রঙ। অন্যদিকে দূর গাঁয়ের কৃষক জোবেদের সাথে বিয়ে হয় আম্বিয়ার, ঘরে খাবারের কমতি থাকলেও তার কোল জুড়ে আসে রাজপুত্রসদৃশ পুত্র লাল। একদিন বাপের বাড়ি বেড়াতে এসে চাচি আসিয়ার বাড়িতে ঘুরতে আসলে তাদের দুজনের কথোপকথন হয়, সেখানেই এক পর্যায়ে আসিয়া বেগমের কথার সূত্রে হারুর মা যখন আম্বির ছেলের সৌন্দর্য নিয়ে মন্তব্য করে আসিয়া বেগমের সামনে বলে "আমাগো আম্বির কিন্তু পোলা হইছে একখান। বাপে কালা, মায় কালা, পোলাখান অইছে কি সোন্দর! রাজার পোলার লান।"[৩৮] তখন আসিয়া বেগমের অন্তস্তলে নিজের জাত্যাভিমান (শ্রেণি বিবেচনায়) জেগে ওঠে এবং পৌত্র ফজুর তুলনায় আম্বির সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে কষ্ট হয়।

লেখক বিষয়টি বর্ণনা করেছেন বিশ্লেষণসহযোগে: হারুর মায়ের "কথায় হয়তো বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না বোঝানোর মতো, তাহলেও ওই সময়টা উপযুক্ত ছিল না প্রশস্তির জন্য। আসিয়া খাতুনের মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একটু আগে তিনি নিজের নাতির নিন্দা করেছেন। ফলে হারুর মার কথাটা তাঁর মনের তল পর্যন্ত চলে গেল। সেখানে একটা ক্ষোভের পাত্র ছিল। হারুর মার কথায় সেটা হঠাৎই ভেঙে পড়ল। আর তখন সেখানে সঞ্চিত ক্ষোভ রাসায়নিক কোনো এক বিষক্রিয়ায় বিষে পরিণত হয়ে নিক্ষিপ্ত হলো আম্বির ওপর।"[৩৯] ফলে স্বীয় অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতেই আসিয়া খাতুনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে এই জহরনিক্ষেপ: "ছিনালগো পোলা সুন্দরই অয়।"[৪০] এই অযাচিত মন্তব্য এক অগ্নিসম্ভব পরিস্থিতির সৃষ্টি করে গল্পটির এ পর্যায়ে। এবং শহীদুল জহির এভাবেই গল্পের বাঁক সৃষ্টি করেন।

চূড়ান্ত দ্বান্দ্বিকতার উন্মেষ ঘটিয়ে তিনি শোষক ও শোষিতের মনোবাস্তবতা তুলে ধরেন এবং এ পর্যায়ে পরিদৃষ্ট হয় কীভাবে ফুঁসে উঠতে তৎপর হয় কৃষকবধূ আম্বি। আঘাত ততক্ষণ পর্যন্ত সয়ে যায় মানুষ

যতক্ষণ পর্যন্ত টিকে থাকে তার সসম্মান অস্তিত্ব। এই মন্তব্যে প্রথমে বিমূঢ় হয়ে যায় আম্বি, লেখকের বর্ণনায় " আম্বি চমকে গেল প্রথমে। তারপর সে গুটিয়ে যেতে চাইল। ওর দেহ মনের ওপর সকালের কুয়াশার মতো অনুত্তেজনার নিশ্চিত আবরণটি নেমে আসতে চাইল।"[৪১] কিন্তু সম্ভাব্য বিপন্নতার সামনে রুখে দাঁড়ায় মানুষ, নিজের টিকে থাকাটাকে জানান দেয় সাবলীলভাবে, "তাই আম্বি হেঁচকা টানে সেই আবরণটিকে ছিঁড়ে ফেলল।" তার "বুকের ভেতরটা চকিত ঘূর্ণির তাণ্ডবে সচকিত।"[৪২] সে বলে যেতে চায় কীভাবে মাঠের মাটি আর সূর্যের রোদ মাটিলগ্ন মানুষের চামড়ার রং বদল করে দেয়, জন্মলব্ধ ত্বক রূপান্তরিত হয়ে যায় ফসলের জন্ম দিতে গিয়ে।

তার বক্তব্য যেন কোনো দ্রোহের ভাবনায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠতে সাহসী, তাই সে স্বভাববিরুদ্ধ হলেও বলে যেতে থাকে সেই প্রতিবাদের ভাষা, তার "মগজের ভেতর থেকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের জিহ্বা বেরিয়ে আসে।" বলে, "আমার সোয়ামির কুমোরের লুঙ্গি খুইল্লা দিলে বুজার পারবেন আমনেরও এইরম পোলা অইতো পারে। আমার ছিনাল হওন লাগে নাই সুন্দর পোলার লাইগ্গা।"[৪৩] আম্বির এই লেলিহান উচ্চারণ আগুন ধরিয়ে দেয় আসিয়া খাতুনের উচ্চাসীন অবস্থানে। শোষিত শ্রেণির দৃপ্ত প্রতিবাদে যেন কেঁপে ওঠে শোষকের অন্তরাত্মা ।

একেবারেই সাধারণ দ্বন্দ্বের রূপরেখায় গল্পটি তুলে ধরলেও শহীদুল জহির সেই দ্বন্দ্বের মূল প্রোথিত করেছেন এমন দুটি বিষয়ে, যার ওপরে দণ্ডায়মান মানবেতিহাসের ক্রমপ্রসৃতির সূত্র। সেটি হচ্ছে বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতা। আপাতদৃষ্টে এই গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র একই সূত্র থেকে উত্থিত এবং এদের যাপিত জীবনের প্রেক্ষাপটও অভিন্ন। কিন্তু সম্পদের খানিক সমৃদ্ধি তাদের দুজনের মধ্যে একটি স্তরগত ব্যবধান তৈরি করে দিয়েছে আর সেই ব্যবধান রূপ নিয়েছে অদৃশ্য দেয়ালে, যা তারা দুজনেই বিশ্বাস করে এবং মেনে চলে। আর মেনে চলে বলেই একে অপরের ওপর চড়াও হতে দ্বিধাবোধ করে না এবং অপরের সেই চড়াও হওয়াকে ওই ব্যক্তির স্বভাবিক অধিকার বলে মেনে নেয়।

কিন্তু সকল স্বভাবিকতাই অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে তখন যখন তা অপরের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এ গল্পে আসিয়া খাতুন যখন আম্বিয়াকে তার স্বামীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিয়ে বা অন্যান্য করুণ বিষয় নিয়ে কথা বলে তখন তা আম্বিয়া মেনে নেয় আসিয়ার স্বাভাবিক অধিকারবল হিসেবে। কিন্তু ছেলের গোরা রঙের উৎস নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে আম্বিয়ার চরিত্র নিয়ে কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত করে তখন তা ছাড়িয়ে যায় সহ্যের সীমা, রুখে দাঁড়ায় আম্বিয়া, যেমন একদিন রুখে দাঁড়ায় প্রলেতারিয়েত শ্রেণি। শহীদুল জহির সন্দেহাতীতভাবে আম্বিয়ার জাগরণের মধ্যে প্রলেতারিয়েতের দ্রোহকেই অঙ্কন করেছেন কিন্তু যে দ্বন্দ্বসূত্র ধরে এ-দুয়ের আগুনরঙা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার

নাড়িমূল চিহ্নিত করতে গেলে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ছেড়ে চলে আসতে হবে উত্তরউপনিবেশের দুয়ারে। যেখানে তিনি দেখাতে চেয়েছেন শোষক চলে গেলেও হাজার বছরের শোষণের প্রক্রিয়া আমাদের জাতিগত চৈতন্যে রেখে গেছে কিছু স্থায়ী ছাপ, বিচ্ছিন্ন কিছু বিশ্বাস-ভাবনা অক্ষয়-ছাঁচ তৈরি করে রেখে গেছে আমাদের সামূহিক নির্জ্ঞানের স্তরে স্তরে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো সৌন্দর্যবোধ; যেখানে স্থায়ীভাবে আমাদের মন সুন্দর বলতেই বোঝে ফর্সা ও সাদাকে।

এই সাদা রঙের মোহ ছিলো বলেই আম্বিয়াকে পছন্দ করা সত্ত্বেও পুত্রবধূ করে ঘরে তোলেননি আসিয়া খাতুন, চেয়েছেন ফর্সা উত্তরাধিকার, এনেছেন ময়নার মতো গোরাসুন্দরীকে ঘরের বউ করে। ফলে সেখানেই স্বীয় স্বপ্নের পরিপূরণের স্বপ্ন দেখে নিম্নস্তরের আম্বিয়াকে বঞ্চিত করেছেন তিনি এবং এভাবেই রোপিত হয়েছে গল্পের ভবিতব্যের দ্বন্দ্বের বীজ। অতঃপর স্বপ্নের অচরিতার্থতা গল্পের শীর্ষবিন্দুতে আগ্রাসী করে তুলেছে আসিয়া খাতুনকে। আর সেই আগ্রাসনের বিপরীতে রুখে দাঁড়িয়েই নিজের স্বকীয় অস্তিত্বের ঘোষণা দিয়েছে আম্বিয়া। অর্থাৎ গুরুত্ববিচারে মহৎ লেখকদের মতোই ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দ্বন্দ্ব ও বর্ণান্ধ ঔপনিবেশিক সৌন্দর্যবোধ– এই দুটি সূত্রকে মূলীভূত করেই শহীদুল জহির মাটি ও মানুষের রঙের আশ্চর্য আখ্যান তৈরি করেছেন এই গল্পে।

ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে

শিল্পভঙ্গি বিবেচনায় বলা যেতে পারে ‘ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে’ গল্পটি শহীদুল জহিরের বাঁকবদলের গল্প। উন্মুল মানুষের আখ্যান লিখলেও শহীদুল জহির এই গল্পের প্রতিবেশ রচনা করেছেন পুরান ঢাকার একটি মহল্লাকে কেন্দ্র করে। আনন্দ পাল লেনের সামষ্টিক জীবনে উটকো ঝামেলার মতো উড়ে এসে জুড়ে বসে সকলের মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে বসা আলফাজুদ্দিন আহম্মদ ওরফে নবাব এই গল্পের মূল চরিত্র। এই চরিত্রের শক্ত কোনো উৎস নেই, এক নড়বড়ে উৎস থেকে উঠে আসা চরিত্রটি পূর্বপুরুষের তুলনায় উত্তরপুরুষকে করে তুলতে চায় সমাজের কাছে যোগ্যতম করে। তাই সে একমাত্র উত্তরাধিকার, পুত্র রফিককে নিয়ে ছন্নছাড়া জীবন যাপন করে, নিজের তুলনায় আরও সামাজিক যোগ্যতায় বলিষ্ঠ করে তোলার স্বপ্নে সে ছেলেকে নিয়ে পালানোর মতো করে ছুটে বেড়ায় এখান থেকে সেখানে। এই বিরামহীন ছুটে চলা জীবনের একসময় সে উপস্থিত হয় আনন্দ পাল লেনে, সেখানকার জীবনে ঘটে যাওয়া আখ্যান নিয়েই গল্পকার লিখেছেন ‘ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে’ গল্পটি।

সংঘবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত পাড়া বা মহল্লার মানুষের সামষ্টিক মানস নিয়ে উত্তরকালে শহীদুল জহির যে কথাসাহিত্যের চর্চা করেছেন, এই গল্পটি যেন সেই শিল্পকৌশলের প্রস্তুতি। সঙ্গনিবিড় শহুরে মহল্লার মানুষ তাদের পরিচিত জীবনে হঠাৎ করে কেউ এসে যদি বুক চিতিয়ে, তাদের পরোয়া না করে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে চলে, তাহলে তার প্রতি সেই মহল্লার স্থায়ী বা দীর্ঘদিনের পাড়াবাসীর যে সংক্ষুব্ধ ভাবের সৃষ্টি হয়, এবং সেই সংক্ষোভ যে কোনো এক সময় তীব্রতরভাবে প্রকাশ পেয়ে ওই আগন্তুকের জীবনকে ব্যাহত করে সেই সামষ্টিক বাস্তবতার চিত্র শহীদুল জহির এই গল্পে তুলে এনেছেন।

শত বাধা সত্ত্বেও স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় অযোগ্য মানুষ নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য, স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য ধৈর্য ধরে থাকে অপেক্ষা করে পরবর্তী নতুন সকালের, স্বাপ্নিক হয়ে ওঠে আবার ঘুরে দাঁড়াবার – 'ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে' গল্পটি সেই স্বপ্নদর্শী মানুষের আখ্যান।

আনন্দ পাল লেনের মানুষের জীবনে হঠাৎ নিরানন্দ উপদ্রব হয়ে আবির্ভূত হয় নবাব। যখন এ মহল্লায় বাড়তে থাকে জনবসতি তখন ক্রমবর্ধমান বাস্তুসংকট বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য অনেকেই নিজের জমিতে নতুন ঘর তুলতে থকে, সেই ধারাবাহিকতায় পুরনো মন্দিরের গা ঘেঁষে নেপাল ঠাকুর গড়ে তোলে একটি খুপরি, নবাব সেই খুপরির ভাড়াটিয়া হিসেবে জায়গা করে নেয়, তারপর নিজেই নিজের অদ্ভুত জীবনযাপন দিয়ে কেড়ে নেয় সকলের দৃষ্টি, সকলের ভাবনাজগতে একটা নেতিবাচক মূর্তি নিয়েই সে দণ্ডায়মান হয়। সমাজের বা মহল্লার মানুষের সেই ভাবনার সংবাদ দিয়ে লেখক গল্পটি শুরু করেছেন–"লোকটা দিনকে দিন যেন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"[৪৪]

ব্যস্ত নাগরিক জীবনের কিম্ভূতভাবনার খোরাক হয়ে ওঠে সে, নতুন চিন্তার ঢেউ নিয়ে আসে মহল্লার মানুষের সামষ্টিক মানসলোকে – লেখকের বর্ণনায় "আনন্দ পাল লেনের অধিবাসীদের জীবন নিস্তরঙ্গ নয়। তবুও পাড়াটার বহিরঙ্গে একটা সুনসান ভাব ছিল। মনের ভেতর যা-ই থাক, বাইরে সকলেই এতটা একাত্ম ছিল অথবা এতটা বিচ্ছিন্ন ছিল পরস্পরের যে অন্যকে নিয়ে আলাপ করার মতো কিছু যেন তাদের ছিল না।... আনন্দ পাল লেনের এই মানস চেহারটা পাল্টে দেয়ার জন্যই যেন লোকটা এসে গেড়ে বসল পাড়ায়।"[৪৫] যূথবদ্ধ জীবনের সুপরিচিত ধারায় উড়ে এসে যদি কেউ নিজের অভিনবত্ব নিয়ে জায়াগা করে নিতে চায়, এবং তার পদ্ধতি যদি পরিপার্শ্বের মানুষের কাছে ঠেকে সংশয়জাগানিয়া, তবে ভেতরে ভেতরে তার ওপর ক্ষেপে উঠবে সবাই–এটাই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এবং সেই প্রতিক্রিয়ামিশ্রিত দৃষ্টিকোণ থেকেই নবাব সর্বত্র বিবেচিত হয়েছে প্রতিনায়কের মতো। নেপাল ঠাকুরের কাছ থেকে মন্দিরের রোয়াকে গড়ে ওঠা ঘরটি ভাড়া নিয়ে পাড়ায় স্থিত হয়েই সে

সবার মানোযোগের কেন্দ্রে আসীন হয়ে যায়, প্রথমে যদিও সবাই তার অবস্থান বিষয়ে না-ওয়াকিফ থাকে, তারপরও সে-ই যেন "আনন্দ পাল লেনের জীবনধারায় আস্তে আস্তে পাক দিতে শুরু করল নিজে মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে।"[৪৬]

প্রথমদিকে নবাবের অজ্ঞাত পেশা এবং রহস্যময় জীবনযাপন সবার মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। একটা ছোট্ট কুঠুরিতে সন্তান নিয়ে মানবেতর বসবাস, দোকানে দোকানে চেয়ে চেয়ে বাকি খাওয়া এবং এক পর্যায়ে ভাড়া না দিতে দিতে ওই ঘরের দখলদার বনে যাওয়ায় জনমনে একটা বিক্ষিপ্ত মনোভাব তৈরি করে নবাব। তার শুদ্ধ চর্চিত বাংলা উচ্চারণ অন্যদিক থেকে তাকে আলাদা করে রাখে মহল্লার মানুষ থেকে। কেমন যেন নির্বোধ ও গা-ছাড়া ধরনের জীবন যাপন দিয়ে নিজেকে সে একটা স্বতন্ত্র ভাবানার বৃত্তে আবদ্ধ করে রাখে, কিন্তু মহল্লার "লোকে অবশ্য তাকে নির্বোধ ভাবতে রাজি না। ভাবে, শালা ঘুঘু।"[৪৭]

সকল লোকের মাঝে বসে কেবল নিজের মুদ্রাদোষে নিজেকে আলাদা করে রাখলেও নানাবিধ প্রয়োজন মেটাতে তাকে বিভিন্ন জনের শরণাপন্ন হতে হয়, কিন্তু লোকে তো তাকে আড়ালে আড়ালে 'ঘুঘু' বলে চিহ্নিত করে রেখেছে। ফলে নবাবের সঙ্গে তাদের আচরণ প্রত্যাশানুযায়ী হয়, দ্বন্দ্ব জমে ওঠে দুই পক্ষেরই, অবৈধ উপায়ে নবাবকে মেটাতে হয় নিজের প্রয়োজন। এটি এমন একটি পরিস্থিতি যে, সবাইকে মেনে নিজের প্রয়োজন মেটাতে গেলে সে বাধার সম্মুখীন হয়, আবার নিজের মতো করে মেটালেও অন্যের সন্দেহ বা রোষদৃষ্টির শিকার হয়ে পড়ে। এই অবস্থাতেও নবাব বেঁচে থাকতে চায়, সন্তান রফিককে বাঁচিয়ে রাখার স্বপ্ন দেখে ।

বেঁচে থাকার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ভবঘুরে পিতার সার্থক উত্তরাধিকার হয়ে একদা ঘর ছেড়ে আসা নবাব যুগপৎ দুটো সমস্যার মুখোমুখি হয়, একটি সমস্যা তাকে থিতু হতে দেয় না, আরেকটি ঘরেবেঁধে রাখে আদ্যন্ত। শেষোক্ত সমস্যাটি সে অর্জন করেছে জরিনার ভালোবাসা থেকে। কিছু না থাকা সত্ত্বেও যে তাকে সব কিছুর স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তারপর বন্ধন ছিঁড়ে পাড়ি জমিয়েছিল পরলোকে, তারই রেখে যাওয়া বুকের মানিক রফিক, নবাব তাই রফিককে সুন্দর ভবিষ্যৎ দিয়ে যেতে চায়, রাখতে চায় জরিনার ভালোবাসার মান। এর জন্য প্রথমে প্রয়োজন থিতু হয়ে বসবাস। কিন্তু থিতু হবার জন্য যেসকল যোগ্যতা আবশ্যক, সেই মানের মন ও অর্থসামর্থ্য নেই নবাবের। তাই তাকে অস্থির-স্থিরতায় চলতে হয় যাযাবরের মতো। কোনো জায়গায় যতদিন মাটি কামড়ে টিকিয়ে রাখা যায় নিজেদের, সেখানে সেই কয়দিন-ই।

কিন্তু আনন্দ পাল লেনে সে সম্মুখীন হয় নানা বাধার। মহল্লার লোক এক সময় তাকে নিজেদের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে। "অনেকটা হালকা দাদের সমস্যার মতো। বিরক্তিকর, কখনো কখনো উত্তেজক।"[৪৮] কার্যত এই চুলকানি সমস্যা নিয়ে সাধারণ লোক চুলকাতে মজা পায় এবং একসময় দেখা যায় "আনন্দ পাল লেনের ঠাকুর বাড়ির আশেপাশের অধিবাসীদের এখন দিন কাটে নবাব প্রসঙ্গ নিয়ে।"[৪৯] তাদের সাদা-কালো ভাবনার কচলানি ধীরে ধীরে তৈরি করে ময়লা আর সেই ময়লার মতো ভাবনা তাদের মনে বর্জ্যের মতো জমা হয়, তাদের ভাবনার "ক্রমাগত আবর্তনে ভেসে ওঠে ননি। কালো ননি।"[৫০] এবং তারা এ পর্যায়ে স্থিরসিদ্ধান্ত নেয় যে "লোকটা ঘুঘুই।" এই সিদ্ধান্ত থেকেই তাদের মধ্যে নবাবকে নিয়ে আলোচনা চলে, তাদের "আলোচনার চক্র ঘুরতে থাকে আর কালো থেকে কালো হয়ে জমতে থাকে সর।"[৫১]

আনন্দ পাল লেনের মানুষ উৎসাহী হয়ে ওঠে তার সম্পর্কে জানতে, তাদের ধোঁয়াশা কাটে যখন তারা জানতে পারে যে, নবাব একটি ব্যাংকে সুইপার (মেথর) হিসেবে কাজ করে। কার্যত নবাব তার অবস্থান হারায় এবং সামাজিক দৃষ্টির বিবেচনা-রেখা তার বেলায় আরও নিম্নতর হয়। কিন্তু শহীদুল জহির ব্যক্তির জীবনকে আরও দীর্ঘ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেখাতে সচেষ্ট, ফলে নবাবের "মলিন পোশাক, চেহারা আর বিনয়ী হাসির জেদ ঠিকই রয়ে গেল। নেপাল ঠাকুরের বুকের ওপর ভারি পাথরের মতো চেপে বসে নবাব দিন মাস কাটিয়ে দিতে লাগল। সূর্য অস্ত আর উদয়ের বিন্দুতে চক্কর খেল আনন্দ পাল লেনের রাস্তার উপর একঘেয়ে হলুদ আলো ফেলে ফেলে। নবাবকে নিয়ে আলোচনাও একঘেয়ে হয়ে গেল।"[৫২]

এমতাবস্থায় গল্পকার গল্পে প্রাণ ফিরিয়েছেন পৌরসভার নির্বাচন নিয়ে এসে। সৈয়দ হোসেন ও এরশাদ মিয়ার নির্বচিনী লড়াইয়ে বেফাঁস মন্তব্য করে আবারও আলোচনায় আসে নবাব। এরশাদ মিয়াকে নিজের আচরণ দিয়ে কাবু করে বটে কিন্তু তার এই সাফল্য সকলের মনে আবারও অস্বস্তি জাগিয়ে তোলে, "নবাবকে নিয়ে সকলের অস্বস্তি ভেতর পিঁপড়ের মতো সুড়সুড় করে হাঁটে।"[৫৩] তাই মহল্লা মানুষ নিজেদের হিংসাপরায়ণতার সঙ্গে ভাবতে থাকে –"লোকটাকে একদিন ধরা দরকার। ফকিরের বাচ্চা একটা, মানসম্মান কিছু নেই। বাকি খেয়ে, চালিয়াতি করে জীবন কাটাচ্ছে। তার ডাঁট কি! কিসের ডাঁট, কোথায় ডাঁট কেউ জানে না, তবুও মনে হয় ডাঁট আছে।"[৫৪] কণ্টকপ্রতিম ভাবে বলেই নবাবের অজ্ঞাতে তার পরিণতি তৈরি করতে থাকে সমাজের মানুষ। থাকে তারা সুযোগের অপেক্ষায়, সুযোগ আসে এক পর্যায়ে চূড়ান্তরূপে।

কোনো এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় যখন সবাই নিজেদের ঘরে আড়ষ্ট, যখন বাইরের পৃথিবীর মানুষ নিয়ে কেউ ভাবছে না, এমন কি দোকানদার ফজলু বের হতে পারছে না দোকানের ভেতর থেকে, তখন কোনো এক ভিখারি রমণী সন্তানকোলে আশ্রয় নেয় মন্দিরের বারান্দায়, পরম মমতার বশে নবাব বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্য নিজের ঘরে জায়গা দেয়, দোকানের ভেতর থেকে দেখে ফজলু, এ দৃশ্য দেখে "ফজলুর মাথার মধ্যে দিয়ে একটা পোকা হেঁটে যায়।"[৫৫] দলবল নিয়ে ডেকে আনে এরশাদ মিয়াকে। সবাই তাকে সাব্যস্ত করে দোষী হিসেবে। মেয়েটিকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে বিবাহ দিতে চায় নবাবের সঙ্গে। যেন ফাঁদে ফেলে দিয়েছে কাঙ্ক্ষিত ঘুঘুকে, এমনই উল্লাস জেগে ওঠে মহল্লার ঈর্ষাকাতর লোকগুলোর মধ্যে। পাপের প্রমাণ হিসেবে তারা যেন নবাবের গলায় ঝুলিয়ে দিতে চায় অপমানের মালা। যেন এই কোনোমতে পেট চালানো লোকটির কাঁধে আরও দুটি পেট চালানোর বোঝা চাপিয়ে বদলা নিতে চায় অনির্দেশ্য অপমানের, তারা তাই মেয়েটির ধর্ম-নাম কিছুই জানতে চায় না, আর যখন জানতে চায় তখন কোনো সুযোগ-ই থাকে না বলার। এমন পরিস্থিতিতে গলা উঁচানোর সুযোগ থাকে না, সময় থাকে না নিজের কিছু বুঝিয়ে বলার, প্রতিবেশের সবাই যখন প্রতিকূল তখন সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না কোনো, সম্মিলিত গোষ্ঠীর সামনে তাই আপাত পরাজয় মেনে নেয় নবাব– "নবাব খুব হালকা করে ঘাড় নাড়ে। অস্ফুট স্বরে যেন বলে, না। ভয় করে, গলা বুজে আসে।"[৫৬] শহীদুল জহির চরিত্রের মৌলপ্রবণতা ধওে রাখেন এই পরিস্থিতিতেও, তাই বর্ণনা করেন–"তবু উঠে দাঁড়ায় ও, আবার বলে, না।" মন থেকে মরে যাবার পাত্র নবাব নয়, তাই "আধো-ভৌতিক অন্ধকারে ঢোক গিলে গিলে গলা ভেজাতে ভেজাতে সে অপেক্ষা করে, তারপরের।"[৫৭]

নবাব চরিত্রটির অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে শহীদুল জহির যৌক্তিক করে তুলতে সেগুলোর সূত্রনির্দেশ করেছেন অসামান্য দক্ষতায়। নবাবের চরিত্র-প্রকৃতির স্বরূপ নির্মাণে তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে প্রযুক্ত করেছেন দুটি চরিত্রকে, যাদের একজন হচ্ছে নবাবের পিতা আনছারউদ্দিন, অন্যজন তার স্ত্রী জরিনা। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে আনছারউদ্দিন চলে এসেছিল কুষ্টিয়ায়, বেছে নিয়েছিল সহজতর জীবিকা-অর্জনের বৃত্তি 'চাটুকারিতা', যে কারণে সে পরিচিতি পেয়েছিল 'লেঙ্গুর' নামে। পিতার সেই করুণ অবস্থা ভাবলে আজও নবাবের "কানের গোড়া লাল হয়ে যায়"[৫৮]। তবুও পিতার সেই আশ্চর্য টিকে থাকার কৌশল তাকে অভিভূত করে প্রায়শ। পিতার "জমি-জিরেত ছিল না বললেই চলে, ছিল মুর্শিদাবাদ সূত্রীয় একটা অকিপ্রাকৃতিক অলৌকিক গর্ববোধ, ধূর্ত চাহুনি আর রেশমের মতো মোলায়েম একটা স্বভাব।"[৫৯] পিতার স্বভাবগত উত্তরাধিকার পুরোপুরিই পেয়েছিল নবাব। তাই সে হতে পারেনি কোনো কাজেই 'তুখোড়'। "গরিবের রাগ থাকতি নেই"– পিতার এই উপদেশ যেন

বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল তার। সামাজিক অযোগ্যতা তার স্বভাবে তাই এনে দিয়েছিল বৈরাগ্য, পালিয়ে বেড়াবার প্রবল আগ্রহ। তাই সে থিতু হতে পারেনি কোথাও। কিন্তু হৃদয় তার বশ মেনেছিল জরিনার কাছে। তাই "বন্ধনহীনতার চাইতে জরিনার বন্ধন অনুপম মনে হয়েছিল।"[৬০] খানিকটা স্বপ্নের বীজ রোপণ করে দিয়েছিল তার মনে সেই পরলোকগতা জরিনা। ফলে স্বাপ্নিকতার সঙ্গে স্বাভাবিক ঔদাসীন্য যুগপৎ সঙ্গী হয়েছিল তার। তাই সকলের অবহেলা গায়ে সয়ে গেছে তার। সন্তানকে ধীরে ধীরে যোগ্য মানুষ করে তুলবে এই স্বপ্নের বাস্তবায়নকল্পে সয়ে গেছে সকল অপমান, অবহেলা। একটা সুপ্ত আশাবাদের তাড়নায় শেকড় ছড়াতে চেয়েছে আনন্দ পাল লেনের জীবনে। কোনো মতো টিকে থাকার জন্য জুটিয়ে নিয়েছে আশ্রয়, স্বভাববিরুদ্ধ পেশা। অজস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও জীবনকে জীবনের গতিতেই চলতে দেয়– "পঞ্জিকার পাতায় ঋতু গড়ায়। পঞ্জিকার ঋতু বদল জীবনে উঠে আসবে– এই আশা নিয়ে নবাব ক্ষতের মুখের মাছি তাড়ায়। ক্ষত গলে, পঁচে। নবাব মাছি তাড়ায় চুপচাপ আশা নিয়ে। রফিক স্কুলে যায়। নবাব ব্যাঙ্কের টয়লেট ধোয়। টিকে থাকে। টিকে থাকলে জীবনে ঋতু-বদল ঘটবে হয়তো, নবাব ভাবে, বন্ধ্যা জীবন ঋতুমতী হবে, জমি আর নারীর মতো জীবনের ভাঁড়ারে সোনার ফসল হবে।"[৬১] এই স্বপ্ন দেখতে তাকে যে জরিনাই শিখিয়েছিল তা নিঃসন্দেহ। তাই সে স্বপ্ন বাঁচাতে চায়, রফিককে ভাবে জরিনার স্বপ্নের আধার। তাই পুত্রমাত্র পুঁজি নিয়ে টিকে থাকতে চায় সে মাটি কামড়ে।

কিন্তু তার মনের কোথাও হয়তো সংশয়-রেখা ক্রিয়মান ছিল, তাই একবারে শেষ মুহূর্তে নিজের পরিস্থিতি অবলোকন করে নবাবের মনে হয়– "এভাবে হয় না। মনের কোথাও যেন জানা ছিল, হবে না। অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিশ্বাস স্থাপন করে বসেছিল সে, যদি হয়ে যায়, নৌকো যদি পার হয়ে যায় কোনো রকমে সমাজ-সংসারের খরস্রোতে ডুবিডুবি করেও।"[৬২] গল্পের পরিণতিতে লেখক দেখিয়ে দেন যে, "তা হয় না, নৌকো ডুবেই যায়।" এমতাবস্থায় যার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে এই ভাসমান জীবনে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে সেই "জরিনাকে মনে পড়ে নবাবের।" এবং নিজের ভাবনার বাইরের, কল্পনার অতীত কোনো ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করে, "অপেক্ষা করে, তারপরের।" ভবিতব্য হোক তার আরও ক্ষতযুক্ত, মাছি সে না হয় তাড়াবে না, তবুও এই অন্ধকার কেটে আসুক আলো, আসুক রোদ, জীবনের আর্দ্রতা কেটে শুষ্কতা আসুক। সে রোদে ক্ষত বা ঘা থাকুক, রোদটা হোক ঘেয়ো, তবুও তো আসুক। এই ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে বেঁচে থাকে নবাবেরা। শহীদুল জহির সমাজের এই উন্মুল-নিম্নরেখ মানুষগুলোর জীবনের নানাবিধ প্রার্থনা নিয়ে সাজান আখ্যানের পসরা, সর্বোপরি জীবন টিকিয়ে রাখার প্রত্যাশা নিয়ে লিখেন তাঁর জীবন ও মাটিগন্ধী গল্পগুলো।।

তথ্যনির্দেশ:

১. পারাপার: মুক্তধারা, ঢাকা; ১৯৮৫।

২. একজন শিল্পী যখন পেয়ে যান তাঁর ঈপ্সিত পরিপূর্ণতা, যখন নিজের কণ্ঠকে হাজারো কণ্ঠের মধ্যে চিনতে পারেন আলাদা করে, তখন-ই তিনি নিজের নিজস্বতা চিহ্নিত করতে তৎপর হয়ে ওঠেন; তখন আরও নির্দিষ্ট করার প্রয়োজনে নিজের কোনো সৃষ্টিকেও তিনি অস্বীকার করেন। কেননা তা তাঁর অধুনালব্ধ স্বকীয়তাকে ক্ষুণ্ন করে। হয়তো এই ভাবনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'মানসী'-পূর্ব রচনাগুলোকে করেছিলেন 'অচলিত সংগ্রহ'ভুক্ত, জীবনানন্দ দাশ 'ঝরা পালক' কাব্যগ্রন্থটিকে করতে চেয়েছেন অস্বীকার। শহীদুল জহির হয়তো তেমন ভাবনা থেকেই 'পারাপার' গ্রন্থটিকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। এই ঘটনার স্বাক্ষী লেখক আহমাদ মাযহার, তিনি জানিয়েছেন: "আমাকে সেদিন তিনি *পারাপার* বইটিকে তাঁর সৃষ্টিকর্ম হিসেবে গণ্য না করতে অনুরোধ করেছিলেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন যে, ওতে লেখকের স্বাতন্ত্র্য তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ করা যাবে না।" সূত্র: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (সম্পাদিত) শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ; পাঠক সমাবেশ, ঢাকা; ২০১০। পৃষ্ঠা – ৪২২ ।

৩. ভালবাসা : পারাপার; প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত

৬. 'ভালোবাসা' গল্পটা বাবুপুরা বস্তি এলাকার গল্প।– শহীদুল জহির: সূত্র – মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (সম্পাদিত) শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ; পাঠক সমাবেশ, ঢাকা; ২০১০। পৃষ্ঠা – ৫৬৭ ।

৭. ভালবাসা: পারাপার; প্রাগুক্ত

৮. তোরাব সেখ : পারাপার; প্রাগুক্ত

৯. প্রাগুক্ত

১০. প্রাগুক্ত

১১. প্রাগুক্ত

১২. প্রাগুক্ত

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. প্রাগুক্ত

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. প্রাগুক্ত

২০. প্রাগুক্ত

২১. প্রাগুক্ত

২২. প্রাগুক্ত

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. প্রাগুক্ত

২৫. প্রাগুক্ত

২৬. প্রাগুক্ত

২৭. প্রাগুক্ত

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. এই গল্পগ্রন্থের গল্পসমূহ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে লেখক জানিয়েছেন: "পারাপারের গল্পগুলো মুক্তধারা থেকে '৮৫ সালে বের হলো। ...এই গল্পগুলো মার্কসীয় দর্শনের সরাসরি প্রভাবের আওতায় লেখা।" কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরকে দেয়া সাক্ষাৎকার; সূত্র: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (সম্পাদিত) শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫৬৭

৩০. পারাপার : পারাপার; প্রাগুক্ত

৩১. প্রাগুক্ত

৩২. প্রাগুক্ত

৩৩. প্রাগুক্ত

৩৪. প্রাগুক্ত

৩৫. প্রাগুক্ত

৩৬. আফ্রো-আমেরিকান বংশোদ্ভূত বিখ্যাত ফরাসি বিপ্লবী ও দার্শনিক, উত্তর-উপনিবেশতাত্ত্বিক ফ্রানৎস্ ফানোঁ (১৯২৫- ১৯৬১) তাঁরযে গ্রন্থে প্রথম ঐতিহাসিক বিবর্তন নির্দেশ করে উত্তর উপনিবেশ সম্পর্কে প্রামাণ্য আলোচনা করেছেন, সেই বইয়ের নাম – 'ব্লাক স্কিন হোয়াইট মাস্ক' (১৯৫২)।

৩৭. এই গল্প প্রসঙ্গে শহীদুল জহির নিজেই উল্লেখ করেছেন: "আমার কাছে মনে হয়েছে এটা বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির নিবিড় পাঠ থেকে ভাবনাসমূহ উঠে এসেছে।" – কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরকে দেয়া সাক্ষাৎকার; সূত্র: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (সম্পাদিত) শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫৬৭

৩৮. মাটি এবং মানুষের রং : পারাপার; মুক্তধারা, ঢাকা; ১৯৮৫

৩৯. প্রাগুক্ত

৪০. প্রাগুক্ত

৪১. প্রাগুক্ত

৪২. প্রাগুক্ত

৪৩. প্রাগুক্ত

৪৪. ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে : পারাপার: মুক্তধারা, ঢাকা; ১৯৮৫

৪৫. প্রাগুক্ত

৪৬. প্রাগুক্ত

৪৭. প্রাগুক্ত

৪৮. প্রাগুক্ত

৪৯. প্রাগুক্ত

৫০. প্রাগুক্ত

৫১. প্রাগুক্ত

৫২. প্রাগুক্ত

৫৩. প্রাগুক্ত

৫৪. প্রাগুক্ত

৫৫. প্রাগুক্ত

৫৬. প্রাগুক্ত

৫৭. প্রাগুক্ত

৫৮. প্রাগুক্ত

৫৯. প্রাগুক্ত

৬০. প্রাগুক্ত

৬১. প্রাগুক্ত

৬২. প্রাগুক্ত

৬৩. প্রাগুক্ত

চতুর্থ অধ্যায়

শহীদুল জহিরের গল্প: দ্বিতীয় পর্যায়

ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প

'ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প'গল্পগ্রন্থেযেন নতুন এক শহীদুল জহিরের আগমন ঘটেছে। 'পারাপার' গ্রন্থের লেখক একেবারেই পাল্টে গেছেন বিষয়বিন্যাসের কুশলতায় এবং বয়নের ভাষাভঙ্গিতে[১]। হঠাৎ করে মনে হতে পারে উল্লম্ফন, কিন্তু শহীদুল জহির বিশ্বাসী নন এমনতর অলীকত্বে, পরিবর্তন না বলে লেখকের ভাষার বিবর্ধন বলা যেতে পারে। জহির নিজেই জানিয়েছেন যে, পারাপার গ্রন্থের পর যে ভাষাভিত্তিক পরিবর্তন আসে তাঁর মধ্যে 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসটি সে দুয়ের যোগসূত্র[২]। এই উপন্যাসের ভাষিক ও বয়নগত শৈলিতে শহীদুল জহির নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেন। নিজের নামের শেষাংশ পরিবর্তন করে 'হক' থেকে হয়ে যান 'জহির'। শুধু নামে নয় শিল্পভাবনায়ও জহিরের ঘটে নান্দনিক পরিবর্ধন। গল্পবয়নের বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয় জাদুবাস্তবতার উপাদান[৩]; এবং বাক্যের গঠন হয়ে যায় সন্দেহবাচক সম্ভাবনায় ভরপুর; ব্যবহৃত হয় পাঠকের ভাবনাবৃত্তকে বহুভঙ্গিম করে তোলার এক বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গি। এই অনপনেয় বিশিষ্টতা আরও পক্ক হয়ে ওঠে তাঁর 'ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প' নামক গ্রন্থের আখ্যানগুলো রচনাকালে। ফলত এক শিল্পীর মৌলিকত্বদর্শী গ্রন্থের উদাহরণ হয়ে উঠেছে বর্তমান গ্রন্থটি।

শহীদুল জহির যে-সকল গল্পের বয়ন করেছেন জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'র পূর্বে, সেগুলোতে স্পষ্ট ভাবেই প্রভাব ছিলো তাঁর পূর্ববর্তী লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র, অনেক ক্ষেত্রে সৈয়দ শামসুল হকের[৪]।এমনকি 'পারাপার' গ্রন্থের কয়েকটি গল্পের লেখকের নাম উহ্য রাখলে পাঠকের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গে পার্থক্য নিরূপণ। যদিও জীবনবীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গিগত ব্যবধান দুজনের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলেছে।

প্রথম পর্বে শিল্পদৃষ্টিতে মার্কসবাদে বিশ্বাসী শহীদুল জহির 'পারাপার'-এর সর্বত্রই ভূমিজ-শ্রমলগ্ন মানুষের বিবিধ প্রতিবাদের চেতনাকে ব্যক্তিক বা সামষ্টিক পর্যায় থেকে তুলে ধরেছেন, অধুনা শিল্পভাষে যাকে হয়তো ব্যাখ্যা করা যায় নিম্নবর্গের চেতনা দ্বারা, কিন্তু 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' ও তৎপরবর্তী পর্বে তিনি সেই বিশ্বাস থেকে সরে এসেছেন[৫]এবং নিছক গল্প বলার আনন্দেই মানুষের জীবনকে রূপদান করেছেন গল্পে ও উপন্যাসে।মানুষের সে জীবন কখনও একান্ত ব্যক্তিগত, কখনও রাজনীতির ডামাঢোলে বিপর্যস্ত, কখনও সামষ্টিক জীবনসংলগ্ন।

‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’ উপন্যাস ও তৎপরবর্তীকালের কথাকার শহীদুল জহির একবারেই ভিন্ন শিল্পকৌশলের অনুসারী। তিনি ততদিনে শিখে ফেলেছেন গল্পবলার নতুন ধরণ। মার্কেসের প্রভাব ও প্ররোচনায় চিনে নিতে সক্ষম হয়েছেন আধুনিক সাহিত্যের উত্তরাধুনিক মর্জিগুলোকে। তিনি এখন লোক-আখ্যানের কথ্যভঙ্গি নিজের গল্পবর্ণনায় ব্যববহারে সচেষ্ট। প্রচলিত শিল্পরীতির পরিবর্তে বিচূর্ণিত আখ্যানরীতি গড়ে তুলতে তিনি সততপ্রচেষ্টামুখর। বয়নভাষায় বিশুদ্ধ আচারনিষ্ঠতা পরিত্যাগ করে প্রায়শ কথ্যভঙ্গির শব্দ বানানে ও উচ্চারণে অবলীলায় ব্যবহার করেছেন তিনি। প্রাকৃত ভাষাভঙ্গিকে শিল্পের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠা করার যে উত্তরাধুনিককালের প্রবণতা, তা শহীদুল জহিরের এই পর্বে সুস্পষ্ট। পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা বিশ্বের মঙ্গলকামী দর্শনে যে অনাস্থা তৈরি করেছিলো, তা-ই প্রকাশ পাচ্ছিলো তৎপরবর্তী বিশ্বশিল্পের বহুবঙ্কিম ভঙ্গিমায়। প্রচলিত রীতি-আঙ্গিক ভেঙে নতুন আঙ্গিকের ঘটছিলো আত্মপ্রকাশ। এক বিমিশ্র, কিন্তু নিজ দেশীয় ঐতিহ্যের অনুগামী সহচর, শিল্পভঙ্গি পাচ্ছিলো প্রতিষ্ঠা।

ভাষার পাশাপাশি, এই পর্বে শহীদুল জহিরের ‘প্রেক্ষণবিন্দু’র ধারণা বদলে গিয়েছিলো অনেকটা, গল্পে ও উপন্যাসে যা ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয়, প্রান্তিক বা সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের পদ্ধতি বদলে গিয়ে হয়ে উঠেছিলো সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ-পদ্ধতি; গল্পের কথক হয়ে উঠেছিলো আমি’ ‘সে’ ইত্যাদি-স্থলে ‘আমরা’, ‘তারা’ ‘মহল্লা’ বা ‘এলাকাবাসী’[৬]। বর্ণনাকারীর বিচিত্র উপস্থিতি ভাষার বৈচিত্র্য বাড়িয়ে তোলায় আঞ্চলিক-উপভাষার উপস্থিতি বাড়ছিলো। লেখক হয়ে উঠছিলেন উপস্থাপক মাত্র। আখ্যানে কোনো পরিণতি প্রদর্শনের চেয়ে একধরনের মুক্ত পরিণতি আনয়নের ঝোঁক পাচ্ছিলো প্রতিষ্ঠা। তবে এই পরিত্যাগ কোনো নির্দিষ্ট ছকে পুনরায় নিজেকে আবদ্ধ করার প্রত্যয় থেকে ঘটেনি, ছক থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই যেন এর অন্তরে সর্বদা কার্যকর ছিলো। শহীদুল জহির এই কাঙ্ক্ষায় যে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ, তা তাঁর এই পর্বের আখ্যান বর্ণনার প্রতিটি স্তরে প্রকাশিত এবং প্রমাণিত। সেই প্রমাণ তিনি রেখেছেন গল্পের বয়নকৌশলে; বয়নের ভাষাগঠনে; ভাষার প্রত্যেকটি বাক্যের নিহিত সৌন্দর্য ও শিল্পতাৎপর্যে।

একজন কথকের প্রচলিত বর্ণনভঙ্গি থেকে সরে গিয়ে লেখক এ-পর্বে (দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনাসমূহে) বহুস্বরের ব্যবহারে একপ্রকার বহুসম্ভাবনাময় মুক্তগল্প বর্ণনা করেছেন। কার্যত, বাক্যগুলি সরল থাকেনি আর, বহুজনের অংশগ্রহণে বহুসম্ভাবনা দেখাতে গিয়ে হয়ে পড়েছে জটিল। খণ্ড বাক্য জোড়া দিয়ে দিয়ে তিনি বাক্যের শরীর নির্মাণ করেছেন এবং সেই জোড়া লাগানোর কাজে ব্যবহার করেছেন এমন কিছু সংযোজক-বিয়োজকমূলক অব্যয় পদ, যারা বাক্যের একটি নির্দিষ্ট অর্থের সম্ভাবনাকে

ব্যাহত করেছে প্রায়শ; উপরন্তু বাক্যের বহুবিধ অর্থতাৎপর্য গড়ে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ একটি বাক্যের গঠন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:

> "সাতকানিয়ার লোকেরা, যারা বাজারে যায় অথবা বাজার থেকে বোয়ালিয়া পাড়া কিংবা সতী পাড়ার দিকে ফেরে, তারা মসজিদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখে যে, তৈমুর আলি লুঙ্গি ফাঁক করে রেখে ইজি চেয়ারে বসে ঘুমায়"[৭]।

উল্লিখিত বাক্যের গঠনে দুটি বিয়োজক অব্যয় পদের ব্যবহার করে বর্ণিতব্য বিষয়ের কর্তা ও কর্মের সম্পাদিত ক্রিয়ায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। বাক্যটির শুরুতে পাঠক যখন সাতকানিয়ার লোকদের কথা ভাবতে শুরু করে যে তারা বাজারে যাচ্ছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লেখক বলছেন যে, না তারা বাজার থেকে ফিরছে– এমনটাও হতে পারে। অতঃপর তারা ফিরছে মসজিদের সামনে দিয়ে বোয়ালিয়া পাড়ার দিকে, কিন্তু লেখক 'কিংবা' ব্যবহার করে জানিয়ে দেন যে – না, তারা সতী পাড়ার দিকেও ফিরতে পারে। এমতবর্ণনায় পাঠকের মনে একপ্রকার খেলা তৈরি হয়; একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে না গিয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে পরিভ্রমণের আনন্দ লাভ করে। বাক্যের অর্থ নির্মাণের এই প্রচেষ্টায় শহীদুল জহির পাঠককে সম্পৃক্ত করেন; তাতে এই দ্বিতীয় পর্বের শহীদুল জহির অভিনবত্ব অর্জন করেন। গল্পের পরিণতি কল্পনায় পাঠকের অংশগ্রহণ গল্পটিকে এককভাবে একজনের সৃষ্টিকর্মে আবদ্ধ রাখে না। পাঠকদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েই একপ্রকার খোলামুখের গল্প তৈরি করেন; সে গল্পের নির্ধারিত পরিণতি হয়তো একটি, কিন্তু সেই পরিণতিতে পৌঁছানোর আগপর্যন্ত পাঠককে তিনি নিজেদের কল্পিত পথ-নির্মাণের সুযোগ দান করেন। বিশ্বসাহিত্যে প্রচল থাকলেও বাংলা গল্পে এই রীতি নতুন। এই অভিনবত্বের ঋণ স্বীকারে শহীদুল জহির বারংবার স্মরণীয়।

আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল কেন নেই

'ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প'- গ্রন্থটি যে গল্পসপ্তকে হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ, 'আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল কেন নেই' শীর্ষক গল্পটি সেগুলোর মধ্যে প্রথম। নগরপ্রেক্ষাপটে সীমিত পরিসরে মানবজীবনের ব্যক্তিক ও সামষ্টিকবলয়ের চমকপ্রদ আখ্যান 'আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল কেন নেই'। ব্যস্ত নগরজীবনের স্বস্তি অন্বেষণের অসাধারণ এই গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন মানবমনস্তত্ত্বের চিরকালীন প্রবণতাসমূহ; কিন্তু তথ্যযোগে সমসাময়িক ইতিহাসের মিশ্রণমাধ্যমে তিনি গল্পটির মধ্যে এনেছেন অধুনাকালের সর। সরের আবরণ সরিয়ে দিলে গল্পের যে কাঠামো এখানে পাওয়া যায় তা একান্তই নিজস্বতাকামী-নিভৃতচারী এক চাকুরিজীবীর মৃত্যুর কাহিনি এবং সে কারণে আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল ফোটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিবরণ। আপাতদৃষ্টে কার্যকারণসূত্র ব্যাহত হলেও মানবিকচিত্তের ভালোবাসার কোমলতা প্রকৃতির প্রাণে ছড়িয়ে যাওয়ার কাহিনি আয়োজন তিনি করেছেন চমৎকার বর্ণনায়। একদিকে মানবে-প্রকৃতিতে মিলনের সঙ্গে সর্বপ্রাণতার প্রসঙ্গটি যেমন এগল্পে তাত্ত্বিকভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত এক ব্যক্তির চরম নিঃসঙ্গতায় প্রকৃতিতে আশ্রয় নেবার অস্বাভাবিক প্রচেষ্টাও ফুটে উঠেছে। তবে এ-পর্বে গল্পের বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কথক হিসেবে শহীদুল জহিরের নবতর ভঙ্গির স্বকীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বেশি।

সকল লোকের মাঝে বসে কেবল নিজের মুদ্রাদোষে একা হয়ে যাওয়া চাকুরে আবদুস সাত্তারের অভূতপূর্ব মৃত্যুকাহিনির আখ্যান বর্ণনা লেখক শুরু করেছেন বর্ষার মৌসুমে কোনো একদিন তার অফিস থেকে বাসায় ফেরার বর্ণনার মাধ্যমে। এখানেই বাসার সামনে এসে আবদুস সাত্তারের পদস্খলন ঘটে এবং গল্পের শুরু হয়। এই আবদুস সাত্তারের একাকী জীবনের গল্প লেখক বলে চলেন অতঃপর। সংসারে থেকেও আবদুস সাত্তার সংসারবিরাগী। পরিবারের কোলাহল থেকে সরিয়ে সে নিজেকে আটকে রাখে নিজের ভুবনে। আর সেই ভুবন তার সরকারি বাসার বারান্দা। ছোট্ট একটি সীমায় নিজের ভুবন রচনার যে প্রবৃত্তি, শহীদুল জহিরের লক্ষ্য সেদিকেই। তিনি নগরজীবনের এই আবদুস সাত্তার বা সাত্তারের মতো মানুষের একাকিত্বের আখ্যান বয়ন করেন। সেই আখ্যানে তাই তিনি আবদুস সাত্তারকে ব্যালকোনির নিভৃতলোকে নিজের পৃথিবী নির্মাণের অবকাশ দেন এবং বর্ণনা করেন:

> ব্যালকোনির বেতের চেয়ারে শরীর ডুবিয়ে সে রাত পর্যন্ত বসে থাকে, বাসার ভেতর তার দু পুত্র ও এক কন্যা এবং স্ত্রী লেখাপড়া করে, কলরব করে, পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে টেলিভিশন দেখে, আর সে

> তখন বারান্দায় অন্ধকারের সঙ্গে মিশে থাকে। সে দেখে দিনের আলো মুছে যাওয়ার পর অন্ধকার কেমন গভীর আর স্পর্শযোগ্য হয়ে ওঠে; সে তাকিয়ে থাকে শুধু, এত তার কোনো আনন্দ অথবা ক্লান্তি হয় না, যেমন কেরানির সরকারি চাকরিতে সে ক্লান্তির বোধহীনভাবে লেগে থাকে।[৮]

এই অভ্যস্তজীবনের আখ্যান খানিকটা বৈচিত্র্য লাভ করে যখন আবদুস সাত্তারের স্ত্রী শিরীন তার বাগানবিলাসিতা প্রকাশ করে, তাতে আবদুস সাত্তারের নিরাভরণ ব্যালকোনি সজ্জিত হয় এবং সেই সজ্জা কলোনির অন্যান্য বাগানপ্রিয় রমণীদের আকর্ষণ করে। ফলে কলোনির সমস্ত ব্যালকোনি ধীরে ধীরে নয়নতারা ফুলে ছেয়ে যায়, কলোনির নান্দনিকতা বাড়ে এবং আবদুস সাত্তারের জীবনযাত্রার স্বাভাবিকতা ব্যাহত হয়।"কেবল আবদুস সাত্তার এই বৃত্তের বাইরে থেকে যায়।"[৯]

এ পর্যায়ে আবদুস সাত্তারের মানসগঠনের প্রকৃতিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার বিবেচনাদৃষ্টির প্রকাশমাধ্যমে। সে তাকিয়ে ঘরের ভেতর লাগানো নধর ক্যাকটাস দেখে এবং ভাবে:

> এই গাছটি মানুষের জীবনের মতো– শ্রীছাঁদ, মাপজোখহীন এবং সর্বাঙ্গ কণ্টকাকীর্ণ।[১০]

অথচ এই বৃক্ষ, এই বাগানের রঙ "বাহ্যত প্রকৃতির সঙ্গে আধুনিক মানুষের সম্পর্কের যে ভারসাম্য ছিন্ন হয়েছে বলে জ্ঞানীজনেরা মনে করেন তা এই...কতিপয় গুল্মজাতীয় গাছের সবুজ পত্র-পল্লবকে ঘিরে মেরামত হয়ে ওঠে।"[১১]

স্বীয় অনুধাবন ও বিশ্লেষণের ভিন্নতায় আবদুস সাত্তার যদিও পৃথক হয়ে থাকে সকল আয়োজন থেকে তবুও সে পৃথক থাকতে পারে না। বছরখানেকের মধ্যেই প্রকৃতির এই জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে সে। নয়নতারা ফুলের এই কলোনি-বিস্তৃত বাগানে পাশের পুরনো বিমান বন্দরের ঝোপঝাড় থেকে প্রজাপতিরা আসে, প্রজাপতি দেখতে আসে শহরের নানা কোণের অধিবাসী। লেখক এখানে নগরজীবনের বিনোদনের দীনাবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেন। সমকাল তাতে সংস্থিতি লাভ করে গল্পে। যদিও এইসব লোকারণ্যভাব আবদুস সাত্তারের নিরালা জীবনে বিঘ্ন ঘটায়, তবুও এক বছরের মধ্যে সে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এই প্রকৃতির আয়োজনের সঙ্গে; উপরন্তু প্রকৃতির সাথে, বিশেষত প্রজাপতি ও নয়নতারা ফুলের সাথে তার আত্মিক যোগ ঘটে যায়- "সে তাকিয়ে দেখে, হাত দিয়ে কানের গহ্বর থেকে প্রজাপতির পাখার রেণু সাফ করে, জামার ভেতর প্রজাপতি ঢুকে গেলে ছাড়িয়ে দেয়, মনে হয় যেন এইসব পতঙ্গের অধিকারের ভেতর বসবাসে সে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে"[১২]।

আবদুস সাত্তারের এই অভ্যস্ততাই বলা যেতে পারে গল্পটির মূল বিন্দু। কেননা, শহীদুল জহির এই গল্পের শিরোনামে আখ্যানের যে উদ্দেশমুখ নির্দেশ করেছেন তা হলো – আগারগাঁও কলোনি

থেকেপ্রকৃতিজাত ফুলের প্রাণের যোগ-বিচ্ছেদ। এবং সেখানে নয়নতারা ফুল ও কলোনির মানুষের সাথে মিলনের সূত্র হিসেবে কাজ করে প্রজাপতি আর প্রজাপতির অবস্থিতি অন্যান্য কলোনিবাসীর কাছে মনে ভিন্নবৎ-"প্রথম যেদিন প্রজাপতিরা উঠে আসে, সেদিন কলোনির লোকেরা ভয় পেয়ে যায় এই ভেবে যে, প্রজাপতিরা তাদের গৃহেই হয়তো থেকে যাবে, এবং ডিম পেড়ে তাদের সবুজ স্বপ্নের ভেতর সোনালি শুঁয়োপোকার রাজত্ব গড়ে তুলবে।"[১৩] ফলে আবদুস সাত্তারের সঙ্গে প্রজাপতির মাধ্যমে নয়নতারা ফুলের প্রাণের যোগ ঘটে এবং ভূমিকম্পের ফলে আবদুস সাত্তারের মৃত্যু হলে আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল ফুটে ওঠবার আগ্রহ হারায় যা গবেষকের নিজস্ব ব্যাখ্যায় জানা যায়।

শহীদুল জহির মূলত এ গল্পে নির্জনতাপ্রিয় আবদুস সাত্তারের সঙ্গে ফুলের প্রাণসংযোগ দেখিয়ে প্রকৃতি-মানুষের সম্পর্কের নতুন সংজ্ঞায়নে প্রয়াসী হয়ে উঠেছেন। ফলে আবদুস সাত্তারের পারিবারিক জীবনের চেয়ে মনোজীবন এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। তার সেই একাকী জীবনের নিবিড় চিন্তন কেমন করে যেন এক ধরনের সম্পর্ক গড়ে তোলে ফুলেদের সাথে এবং ভূমিকম্প চলাকালে সেই সম্পর্কের টান থেকেই যেন সে নয়নতারা ফুলের দুটি টব বাঁচানোর চেষ্টা করে এবং নিজে নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। ফুল ও আবদুস সাত্তারের এই পারস্পরিক সম্পর্ক যতোটা মানবীয়, তার চেয়ে বেশি প্রাকৃতিক। প্রকৃতির ভিন্ন দু প্রকার সৃজন বলেই তাদের সম্পর্ক উৎপত্তিগত দিক থেকে হয়ে ওঠে আত্মিক। আর সেই আত্মিকতার প্রবন্ধন জাগ্রত হয় বলেই জীবনের অন্তিম মুহূর্তে আবদুস সাত্তার নিজের চেয়ে দুটি ফুলের টবের গুরুত্ব দেয় বেশি এবং নিজের প্রাণ হারায়। গবেষকের ভাবনায় সেই বক্তব্যই প্রকাশ পায়; তিনি ফুলের মধ্যে সেই আত্মীয়তাবোধ ক্রিয়াশীল হতে দেখেন এবং আবদুস সাত্তারের মৃত্যুর পর এক ধরনের আত্মহত্যাপ্রবণ মানসিকতা লক্ষ করেন ফুলেদের মধ্যে। ফলত আগারগাঁও কলোনির ফুলগুলো দল বেঁধে মরে যেতে থাকে। তিনি তার ভাবনা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে লেখেন:

> "আমি তো জানি গাছেরা কেমন সংবেদনশীল প্রাণী।"[১৪]

কাঠুরে ও দাঁড়কাক

‘কাঠুরে ও দাঁড়কাক’ গল্পটির নামকরণের মধ্যেই একটি রূপকথা বা উপকথা বলার অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন শিশুতোষ বা শিক্ষামূলক উপকথার আবেশ সৃষ্টি করে শহীদুল জহির নিজের একটি মনোভঙ্গি বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন এ-গ্রন্থে।তিনি যেন বলতে চাইছেন -আমি এমন একটি গল্পের অবতারণা করছি, যে গল্পটি প্রচলভঙ্গির গল্পগুলো খেকে পৃথক হবে, মনে পড়ে যাবে বাল্যবেলায় পড়া বা শোনা কোনো গল্পের নাম। কিন্তু গল্পের ভিতরে থাকবে আমার নিজস্ব গল্পের আয়োজন। অর্থাৎ গল্পের মোড়ক হবে অতি চেনা কোনো রঙের কিন্তু তার বয়ান হবে অচেনা-অদেখা কোনো দৃশ্যের। বস্তুত শহীদুল জহিরের গল্প বলার এই অভিনব ভঙ্গির শুরু এই ‘কাঠুরে ও দাঁড়কাক’ গল্পের মাধ্যমেই।[১৫]

সভ্য সাজসজ্জাহীন প্রাকৃত দুই নরনারীর গল্প ‘কাঠুরে ও দাঁড়কাক’। আকালু ও টেপি- এ দুয়ের সরল জীবনে সমাজ-অর্থনীতির লালসাজাত গরল কীভাবে নিয়তির মতো নেমে আসে, অতঃপর নিয়তির কাকের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে আকালু ও টেপি যে অতিলৌকিক পরিণতি লাভ করে, শহীদুল জহির সেই আখ্যান-ই বয়ন করেছেন ‘কাঠুরে ও দাঁড়কাক’ গল্পে। বস্তুত শহীদুল জহির দুধরনের পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করে ‘মাটির সারল্য-ভরা’ মানুষের পরিণতি দেখাতে চেয়েছেন; এর একদিকে যেমন অসংস্কৃত মানুষের জীবনে নিয়তির ক্রিয়াশীলতা বর্তমান রয়েছে অন্যদিকে তেমনি তাদের তুলনায় ঈষৎ অথবা ব্যাপকভাবে সংস্কৃত মানুষের লালসার শিকার হয়ে তাদের বিলীন হয়ে যাওয়ার চিত্র অঙ্কন করেছেন। কার্যত গল্পে দেখা যায় প্রকৃতির সারল্যভরা মানব-মানবী আকালু আর টেপির ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার দৃশ্য। এই দৃশ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে শহীদুল জহির যেন বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় প্রাকৃত-সন্তানের বারংবার পরাজয়ের বৃত্ত আঁকতে চেয়ে এক ধরনের অতিপ্রাকৃতের আশ্রয়ে সমতাবিধান করেছেন। ফলত, প্রকৃতিসংস্থানের (Ecology System) এক গুরুত্বপূর্ণ প্রাণি হিসেবে একটি শহরে কাক-এর বিলীন হয়ে যাওয়ার গল্প বলেছেন ‘কাঠুরে ও দাঁড়কাক’ নামক আখ্যানে।

মানুষের বানানো সমাজব্যবস্থায় ক্ষমতাকাঠামো বিচারে তুলনামূলকভাবে ক্ষমতাহীন মানুষের সমাজ থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়ার চিরকালীন গল্পও বলা যায় এই ‘কাঠুরে ও দাঁড়কাক’কে। গল্পের এই বিষয় বিন্যাসে সহজেই একটি প্রতীকী বক্তব্যের সংকেত খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, যা উত্তর ঔপনিবেশিককালে ক্ষমতার জোরে বিভিন্ন দেশে ঘটে যাওয়া দখল ও উৎখাতের চিত্র মনে করিয়ে দিতে সক্ষম।[১৬]

এইসব অন্তস্তরিক অর্থ ব্যতিরেকেও ‘কাঠুরে ও দাঁড়কাক’ গল্পটির আস্বাদগুণ শহীদুল জহিরের অন্যান্য গল্পের মতোই অনন্য। অনেকটা রূপকথা বলার ঢঙেই তিনি গল্পের কাঠামো কল্পনা করেছেন এবং সেই সকল অনুষঙ্গ নিয়ে এসে গল্পের অঙ্গ করেছেন বিভূষিত। যেন কাঠুরের সরল জীবনের নানাবিধ সততার পরীক্ষা ও পুরস্কার নিয়ে প্রচলিত লোককাহিনি বলার জন্যই গল্প শুরু করেছেন তিনি। একেবারে লোকালয়ের বাইরে বসবাস করা এক দম্পতি, যাদের কোনো ভালো নাম নেই, ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত করার মতো কোনো আর্থ-সামাজিক পরিচিতি নেই; আছে শুধু নিজের শরীরসম্পত্তি এবং একজনের জন্য আরেকজন। প্রতিপত্তিপ্রধান সমাজে অপরের প্রয়োজনের নিরিখে নির্ধারিত হয় তাদের জীবিকাসূত্র। যাদের সম্বল অন্তহীন সারল্য ও পরস্পরের প্রতি গভীরতর ভালোবাসা। সেই দম্পতির জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিড়ম্বনার সঙ্গে লেখক ঢাকা শহরের কাকশূন্য হয়ে যাবার কাহিনি একত্র করে একটি মেলবন্ধন তৈরি করেছেন এবং প্রকৃতিনিষ্ঠ সরল প্রাণিসমূহের এই কুটিল জিঘাংসাপরায়ণ নগর থেকে উধাও হবার একটি কারণ অনুসন্ধান করেছেন। নগরের প্রাণ যখন হয়ে যায় একবারেই মমতাশূন্য, সেখানে মানবিকতা বা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকে না আর থাকেনা বলেই একে হয়ে ওঠে অপরের শত্রু; একপক্ষের ছোট্ট সাফল্যেও অপরপক্ষের মনে হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে, ফলত অপরের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় সে। বিপন্ন করে তুলতে শতভাগ সচেষ্ট হয় তার জীবন। এমতাবস্থায় কিঞ্চিত মানবিকতাবোধ বেঁচে থাকে যাদের অন্তরে, তারা এই যুদ্ধ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়। এই গল্পে লেখক শহুরে সভ্যতার সেই কুটিল বাতাবরণের অগ্নিকুণ্ড থেকে কাক ও কাঠুরেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে যেন একপ্রকার সমালোচনাচিত্র এঁকেছেন; রূপকথার ছলে আঁকতে চেয়েছেন নাগরিক ভব্যতার প্রাণহীন কাদাকার।

‘বহুদিন পূর্বে’ ঢাকা শহরের কাকশূন্য হয়ে যাবার মূল কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে শহীদুল জহির ‘কাঠুরে ও দাঁড়কাক’ গল্পের কাহিনিসূত্র বর্ণনা করেছেন এবং শুরু করেছেন মূল গল্প বলা। প্রায় পাঁচ বছর ধরে চলা এই কাক শূন্য হবার প্রক্রিয়াটি শুরু হয় ‘যমুনা নদীর পশ্চিম পারে সিরাজগঞ্জ শহর এবং সিরাজগঞ্জ শহরের ছ মাইল পশ্চিমে একটি ছোট্ট গ্রাম, সেই গ্রামের নাম বৈকুণ্ঠপুর’-এ। সেই গ্রামের পাশের খালে ধারে একটি ছোট ঝুপড়ির মধ্যে বসবাসরত নিঃসন্তান দম্পতি আকালু এবং টেপি এই গল্পের মূল চরিত্র। লেখক এই প্রান্তবর্তী কাঠুরে পেশায় নিয়োজিত পরিবারের দুজন সদস্যের নামকরণে বেছে নিয়েছেন এমন দুটি নাম যা একেবারেই লোকসমাজচর্চিত এবং প্রতিপত্তিসম্পন্ন-সমাজবর্জিত আস্বাদসম্পন্ন। শহীদুল জহির অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তাদের পরিচয় দান করেছেন এবং একটি বিষয় বিবেচনায় রেখেছেন যে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের সাধারণত একটি সামাজিক-পারিবারিক ডাকনাম এবং একটি সনদীয় নাম থাকার বহুল প্রচলিত রীতি

রয়েছে; সেক্ষেত্রে তারা যে সমাজের সাথে সম্পৃক্ত এবং স্বতন্ত্র পরিচয়কামী এই দ্বিবিধ সত্তায় প্রকাশ করে নিজেদের সে বিষয়টিও তিনি গুরুত্বসহ গল্পে তুলে এনেছেন। সেই সামাজিক দ্বৈধতা থেকে একেবারে পৃথক করার লক্ষ্যেই তিনি তাদের পরিচয় দেবার সময় উল্লেখ করেছেন: "তার নাম আকালু, তার একটিই নাম এবং তার সঙ্গে থাকে তার স্ত্রী টেপি, টেপিরও নাম একটিই।"[১৭] লেখক যেন এখানেই জানাতে প্রয়াস করেছেন যে, নামের যেমন তাদের দ্বিতীয় পিঠ নেই তেমনি চরিত্রেরও নেই অন্য কোনো পিঠ। একেবারেই একতল বিশিষ্ট চরিত্রের অধিকারী এই দম্পতিকে নিয়ে তিনি গল্পের মূল বয়ানে প্রবেশ করেন। জীবন যাত্রায় একেবারেই আদিম ঘরানার অভ্যস্ততায় নিষ্ঠ এই দম্পতি; ফলে সভ্যতার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক মানুষের মনোলোকে চেপে বসা কুটকৌশল এখনো রপ্ত করেনি তারা, থেকে গেছে প্রকৃতি-ঘেঁষা। এই প্রকৃতি-সন্নিহিত সন্তানদের যেন ক্রমশ জটিল জীবনের মানচিত্রে এনে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন এই নাগরিক সামাজিকতার স্বার্থজালে বেঁচে থাকাটা তাদের জন্য কতোটা কঠিন এবং অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গেলে কতো অনাচারের মুখোমুখি হতে হয়, যেখানে প্রকৃতির কোনো অংশই বাঁচতে পারে না শেষপর্যন্ত।

এই গল্পে আকালু ও টেপি এমন এক ভৌগোলিক সীমানায় বসবাস করে যাদের দেখে মনে পড়ে যাবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাইনির কথা, কারণ ভিন্ন হতে পারে, তবে সমাজের মূলবিন্দু থেকে দুটি গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রই দূরবর্তী অবস্থানে অবস্থিত। এই আকালু ও টেপির গল্পে শহীদুল জহির লোককথার আখ্যান-বৃত্তি ব্যবহার করেছেন; সামগ্রিক বিচারে সামাজিক মানুষের সকল বৈশিষ্ট্যের বাইরে গিয়ে তিনি কল্পনা করেছেন এই চরিত্র দুটিকে। যারা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতায়, মমতায় আর নির্ভরশীল ভালোবাসায় সম্পর্কিত। প্রকৃতির সরল বিবর্ধমানতার সঙ্গে বসবাস তাদের, প্রকৃতির প্রতিটি প্রকাশ তাদের আত্মীয়ের মতোন। ফলত দেখা যায় টেপি, আকালুর দৃষ্টিতে যার মাথায় 'ছিট' আছে কিন্তু সংসার করতে আপত্তি নেই যার সাথে, সেই নিঃসন্তান টেপি নিজের লাগানো সবজির লতাকে সন্তানস্নেহ দেখায়, তার বাৎসল্যের ঔদার্য থেকে বাদ যায় না কোনো প্রাণীও। তেমনি বাৎসল্যের সূত্র ধরে তাদের জীবনে কাক প্রবেশ করে। লেখক এক লোক-আখ্যানের সূত্র ব্যবহার করে, সে সূত্র তিনি মানুষ ও বানরের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে ব্যবহার করেছেন অন্যান্য গল্প-উপন্যাসে, সেই সূত্রে কাকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন এই দম্পতির। কার্যত এই গল্পে আকালু ও টেপির কথামালায় যুক্ত হয়ে যায় কাক।

বাঙালির লোকমানসে 'কাক' অমঙ্গলের প্রতীক হলেও এ-গল্পে সর্বদাই ভূমিহীন-গ্রামত্যক্ত আকালু-টেপির কাছে তা মঙ্গলবার্তা নিয়ে আসে। কিন্তু সেই মঙ্গল তাদের জীবনে স্থান করে নিতে পারে না

নিজেদের অর্থনৈতিক কুটকৌশল না জানার কারণে। ফলত যা আপাত মঙ্গল, তা পরিণামে অমঙ্গল নিয়ে আসে এই দম্পতির জীবনে; এবং আকালু কাককে অমঙ্গলের সূচক হিসেবেই দেখতে থাকে নিজের সংস্কার বিশ্বাসের কারণে। কিন্তু গল্পের আগাগোড়া কাকের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হতে থাকে বারংবার। এবং শেষে সেই কাকের দলের আশ্রয়েই তারা রক্ষা পায় নগরের ক্রমবিষাক্ত হয়ে ওঠা প্রতিবেশ থেকে। এই সম্পর্কেও গল্প বলতে গিয়েই লেখক আখ্যানের শুরুতে টেপি ও আকালুর নির্ঝঞ্ঝাট সংসারজীবনে সন্তানের মতো মমতা দিয়ে কাকের উপস্থিতি নিয়ে এসেছেন। বাৎসল্যের দুর্বলতায় উড়ে আসা এক কাককে পরম মমতায় টেপি ক্ষুধার্ত বলে সনাক্ত করে পানি খেতে দেয়। কাক পানি খায় না। একটু পর পাঙ্গাসিহাটের জব্বার আলির সাথে বাকচাতুর্যে না পেরে অতি সস্তা মজুরিতে পাঙ্গাসি হাইস্কুলের পাশের পুরনো বটগাছটির মূল উঠানোর কাজে নিযুক্ত হয়। এই কাজে আকালুর আগ্রহের তুলনায় টেপির আগ্রহ থাকে বেশি কেননা সে শুনতে পায় যে কাক কা-কা করতে করতে বলছে কাটুক গা কাটুক গা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের টিকটিকি গল্পের ঠিক ঠিক ধ্বনি অনুরণনের সাথে গল্পকারের ব্যবহৃত কৌশল এখানে প্রায় মিলে যায়। ফলে আকালু কাজে নেমে যায় এবং সেই গাছের মূল উঠিয়ে ফেললে সেখানের 'খোড়লের' ভেতরে পেয়ে যায় কয়েক বান্ডিল টাকা।

এই টাকা আকালু চাইলে রেখে দিতে পারতো নিজের কাছে কিন্তু লেখকের চিন্তা অন্যদিকে। তিনি প্রকৃতির সারল্য দিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছেন এই চরিত্র দুটোকে। তাই কোনোভাবেই হঠাৎ করে পাওয়া কোনো গচ্ছিত ধনের ওপর তারা নিজেদের মালিকানা দাবি করতে পারে না; তবে টেপি যখন কাক-ডাকার ফল হিসেবে এগুলোকে চিহ্নিত করে তখন এগুলো নিজের পাওনা বলেই মনে হয় তাদের কাছে। এখানে ভাগ্য বদলানোর যে অতিলৌকিক বিশ্বাস মানুষের মনে কাজ করে লেখক সেই যুক্তিই কাজে লাগিয়েছেন গল্পের অগ্রায়ণে। কিন্তু তারা যখন ব্যর্থ হয় টাকার হিসেব মেলাতে, এক লক্ষ টাকার হিসেবে গণ্ডগোল হয় এবং এই সূত্রে টাকার মালিকানার বিষয়টি তাদের চিন্তায় আসে এবং তারা অনুমানে সমর্থ হয় যে এগুলো কোনো ডাকাতের গচ্ছিত টাকা তখন নিজের ভাগ্য ফেরানোর প্রাপ্তি বলে মনে করে। "টেপি বলে, এই ভিট্যাখান কিনা ফালাও।" কিন্তু "আকালু বলে যে, এই টাকা বাইর করলে বিপদ আছে।" "তখন তাদের দুশ্চিন্তা হয় এবং আকালু টেপির শরীর জড়িয়ে ধরে বলে, কাইলই সিরাজগঞ্জ যায়া উহিলের নগে কথা কয়া আসমুনি।"[১৮]

সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই বিষয়টি নিয়ে উকিলের সাথে পরামর্শ করার কিছু নেই। কিন্তু সরল নীতিবোধ-তাড়িত এই চরিত্রগুলোর কাছে তা গুরুত্ববহ। সমাজের বাইরে থাকলেও তাদের

সমাজের প্রতি আনুগত্য আছে; প্রতিষ্ঠিত সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি আছে অগাধ নির্ভরতা ও বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বলেই সে, আকালু, যখন পরদিন চলে যায় শহরে এবং উকিল পর্যন্ত পৌঁছানোর আগে নিজের গোপন অভিসন্ধি ক্রমশ প্রকাশ করে দেয় বিভিন্নজনের কাছে এবং পরিণামে নিজের প্রাপ্ত সম্পত্তিতে তাদেরকে ভাগিদার করে নেয় তখন লেখক পরিষ্কার একটি বিভেদ রেখা তৈরি করতে সক্ষম হন পাঠকের সামনে। পাঠকের মনে ক্ষোভ ও দয়ার সঞ্চার হয় এবং গল্পের সঙ্গে এগিয়ে চলে পাঠকের মনের গতি। সিগারেট বিক্রেতার সঙ্গে উকিলের কাছে পৌঁছলে সব শুনে "উকিল বলে, আগে টাকা দেও পরে বুদ্ধি দিমু। তারা তিনজন দুপুরের সময় বৈকুণ্ঠপুরে আকালুর ভিটেয় এসে ওঠে। টেপি বাড়ি ছিল না, আকালু টাকা বের করার পর উকিল সাহেব বান্ডিল গুণে দাঁত বের করে হাসে, তারপর পাঁচটা বান্ডিল নিজে রেখে অন্য পাঁচটা বান্ডিল আকালুকে ফিরিয়ে দেয়। সিগারেট বিক্রেতা লোকটা আকালুর হাত থেকে তিনটি বান্ডিল নিয়ে নেয়, তখন আকালুর হাতের অবশিষ্ট দুটো বান্ডিলের দিকে তাকিয়ে উকিল সাহেব বলে, এই টাকা এক বছরের আগে বাইর কইরো না, তোমাক এই বুদ্দি দিলাম; এক বছর পর অল্প অল্প কইরা বাইর কইরা খরচ কইরো, বেশি টাকা তোমার হাতে দেইখলেই মাইনষের সন্দেহ হইব আর তোমাক ধইরা জেলে ঢুকাইব।"[১৯]

অনেক খরচে এই ভয়মিশ্রিত 'পচা বুদ্দি' নেয়ায় টেপির অভিমান হয় স্বামীর প্রতি কিন্তু আকালু যখন বুঝায় এই দুই বান্ডিলেও রয়েছে অনেক টাকা তখন তার মান দূর হয়, "কালো মুখে হাসি ফুটে ওঠে"[২০]। তবে সেই হাসি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। লেখক বোঝাতে চান কোনো সামাজিক পরিচয় ছাড়া কোনো প্রকারেই কোনো সম্পত্তি নিজের অধিকারে রাখা যায় না। সম্পত্তিহীন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যেমন গরীব বলে কম মজুরিতে অন্যের মুনাফা জোগায় তেমনি সম্পত্তির মালিক বনে গেলে হঠাৎ সেই সম্পত্তি ধরে রাখতে পারে না নিজের অযোগ্যতার কারণেই। শক্তিমানের শোষণ তাকে বা তাদেরকে নিয়তির মতোই সর্বদা গ্রাস করে। শহীদুল জহির এই মোটিফটাকেই এ-গল্পের মূল প্রাণশক্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

ফলত, সেই রাতে ডাকাতির শিকার হয় আকালু-টেপি দম্পতি। অতঃপর বৈকুণ্ঠপুর ছেড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না তাদের সামনে। নিজেদের হঠাৎ করে পাওয়া সম্পত্তিই যে সকল বিপদের কারণ সেটা আকালু বুঝতে পারে পরিষ্কার এবং গ্রাম ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে সপরিবারে ঢাকায় পাড়ি জমায়। আকালু-টেপি দম্পতির ঢাকায় আসার এই পশ্চাৎকাহিনির মাধ্যমে লেখক যেন সেইসব অনুদ্ঘাটিত গল্পের ইশারা দিতে চাইলেন যার মাধ্যমে ক্রমশ জনবহুল হয়ে ওঠা এই ঢাকা নগরীর গ্রাম থেকে আসা জনতার শহরে আসার কারণ।

তবে গল্পের মোটিফ লেখক শহরেও অভিন্ন রেখেছেন। ফলে শহরে এসে বস্তিতে জায়গা নেয়া আকালু যখন রিকশা চালানোতে যুক্ত হয় তখন তাদের দিন কেটে যেতে থাকে নির্ভেজাল। কিন্তু একদিন সেই বস্তিতে যখন সেই কাকের আবির্ভাব ঘটে এবং টেপি তাকে চিনতে পারে আগের কাক হিসেবে; তখন আবার দুর্ভোগ নেমে আসতে থাকে তাদের জীবনে। কাক দেখার দিন রিকশায় মোটা আয় হয় আকালুর; কিন্তু একটি মানিব্যাগ পেয়ে যথাযথ বিবেচনায় পুলিশের কাছে জমা দিতে গিয়েই বাধে বিপত্তি। পুলিশ তাকেই হয়রানি করতে আরম্ভ করে। তখন মারের ভয়ে এবং জেলের ভয়ে সে নিজের অর্জিত সকল টাকা সেদিন পুলিশকে দিয়ে এলে তার মনে হয় সেই কাক-ই সকল অমঙ্গলের প্রতীক। নিজের গ্রামের বেদনাময় অভিজ্ঞতা তাকে এই বিশ্বাসে দৃঢ় করে তোলে, সে ভয় পায়। এমতাবস্থায় তার শহুরে বন্ধু চান্দু অভয় দিলেও সে বলে- "দাঁড় কাউয়া আমার পিছে নাইগছে, আর বাঁচপ না।"[২১] অতঃপর পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে তাকে জ্যোতিষ বাবার কাছ থেকে 'নীলা পাথর' নিতে হয়।

যেহেতু আকালু এই পাথরটি আংটিতে ভরে পরার সামর্থ্য রাখেনা সেই যৌক্তিকতায় পাথরটি কাপড়ে বেঁধে বাহুতে পরে এবং এই নীলা পাথরের গুণে তার জীবনে স্থিতি আসে কিছুদিনের জন্য। আয় ভালো হতে থাকে, সুস্থিরভাবে দিন কাটতে থাকে, গল্পে একটি স্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কিন্তু লেখক তাঁর মোটিফ ব্যবহারে বিস্মৃত হন না এবং জ্যোতিষের বাক্স থেকে রত্ন হারিয়ে যাবার অভিযোগে বস্তি থেকে সে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়। এবারে আকালু নিজের নিয়তিকে মেনে নেয় এবং অনতিক্রম্য বাধাকে স্বীকৃতি দিয়েই পুলিশের কাছে নিজে বিবৃতি দেয় যে,"চান্দুর সঙ্গে সেও চুরি করে এবং তাদেরকে এই চুরির বুদ্ধি দেয় তার স্ত্রী, টেপি।"[২২] এহেন স্বীকারোক্তির মাধ্যমে সে টেপিকে নিজের কাছাকাছি রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করে। যেভাবেই হোক স্বামী-স্ত্রীর সর্বদা একসাথে থাকার যে প্রাচীন ভারতীয় বিশ্বাস, সর্বত্র সহগামী হবার যে প্রত্যয় বিবাহের সময় উচ্চারণ করা হয় এটি সেই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন। কোর্ট তাদের দেড় বছরের সাজা দিলে তারা সাজা ভোগ করতে থাকে এবং চৌদ্দ মাস পর তাদের সেই বন্দী জীবনে আবার কাকের উপস্থিতি ঘটে। এবারে আকালু ভয় পেয়ে যায় এবং সহবন্দী ও জেলারকে সেই কাকের গল্প বললে কেউ বিশ্বাস করে না। ঘটনাক্রমে সেই কাকের মাধ্যমে জেলখানার ভেতরেও হিরের আংটি প্রবেশ করে। এবং লোভে পড়ে আবুল সেই কাকচক্রে পড়ে ধরা পড়লে আকালুর ভীতির সত্যিকার কার্যকারিতা চোখে পড়ে জেলারের। অতঃপর সাজা শেষে এই ভাগ্যপীড়িত মানব-মানবীকে জেলার নিজের জায়গা দেখভালের কাজে নিযুক্ত করে। এখানেই গল্পটি শেষ করতে পারেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ভিন্ন বিন্দুতে। মোটিফের কার্যকারিতা তিনি রেখে দেন গল্পের শেষাবধি। কার্যত সেই নতুন জীবনেও কাক তাদের পিছু নেয় এবং এবারে কাক-

কাণ্ড সর্বোচ্চ ক্রিয়াশীলতা দেখায়। নয়াটোলার এই জেলারের নিজস্ব ঘের-দেয়া জমিটিতে কাকেরা নিজেদের সংসার পেতে বসে। নিজেদের ঘর বানাবার জন্য যেসকল দ্রব্য তারা সংগ্রহ করে সেগুলোর সাথে জড়ো হতে থাকে দামি সব জিনিসপত্র। নিজেদের প্রয়োজনে লাগে না বা অনুভব করে না বলেই টেপি সেগুলো অন্য লোকেদের দিয়ে দেয় এবং এভাবেই সংবাদ পৌঁছে যায় দ্বারে দ্বারে। এলাকার প্রত্যেকেই সেইসব দামি দ্রব্যের ওপর নিজের অধিকার দাবি করে। এবং না দিতে পারলে নিজেকে আকালু-টেপির শত্রু বলে জাহির করে। অনেকে আবার এই 'লক্ষ্মী' কাককে নিজের করে নেবার জন্য ফন্দি-ফিকিরও করে। এতে আকালু-টেপির জীবনে জঞ্জাল উপস্থিত হয়, টিকে থাকা হয়ে ওঠে কষ্টকর। কার্যত একান্ত কাম্য হয়ে ওঠে মুক্তি। আর সেই মুক্তির পথে একদিন হঠাৎ সরল দম্পতি উধাও হয়ে যায় মহল্লা থেকে; তাদের সঙ্গে নগর-ছাড়া হয় কাকের দলও।

সমাজের দৃষ্টিতে সম্পত্তির মালিক যদি হয়ে যায় সামাজিক মানদণ্ডে 'অযোগ্য' ব্যক্তি, তবে তা হাতবদলের চেষ্টা করাটা চিরকালীন মনুষ্যপ্রবৃত্তি। শহীদুল জহির সেই প্রবৃত্তির বিপরীতেই স্থাপন করেছিলেন আকালু ও টেপিকে। তারা টিকতে পারেনি। তাদের মতোই সাংসারিক ভেদ-বুদ্ধিহীন জন্তু সাধারণ কাকও সেজন্য এই প্রতিবেশে টিকতে অক্ষম। তাই একদিন কাকের দল উড়ে চলে যায় গ্রামের দিকে, সঙ্গে নিয়ে যায় তাদের মতো একই পরিবেশে জন্ম নেয়া আকালু ও টেপিকে। হঠাৎ সকল কাকের চলে যাওয়া শহরকে করে তোলে কাকশূন্য। শহীদুল জহির সেই কাকশূন্য নগরের অধিবাসী হয়েই গল্পটি লিখেছেন। গল্পের শেষাংশে তাই তিনি উল্লেখ করেছেন এইভাবে:"এই ঘটনার পর ঢাকা কাকশূন্য হয়ে পড়ে"[২৩]।

কিন্তু তারপর তিনি যে বাক্যমালা গল্পের উপসংহার হিসেবে ব্যবহার করেছেন তাতে সহজেই প্রতিভাত হয় যে, প্রাণিকুলের বাস্তু-সংস্থানের ব্যাপারে তিনি সচেতন ছিলেন যথেষ্ট। মানুষের গল্পের সাথে সাথে তিনি এই প্রাণিকুলের জীবনবৃত্তকেও রূপদানের চেষ্টা করেছেন। কাকের দলের মধ্যে যেন সেইসব মুখ ফুটে ওঠে যারা কোনো না কোনোভাবে আকালু-টেপির মতো অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ঝাঁকে ঝাঁকে এসে যোগ দিয়েছে তাদের সাথে, যারা সর্বক্ষণে সর্বাবস্থায় তাদের মতো ভাগ্যপীড়িত। সমাজের কুটিলতা তাদের থাকতে দেয়নি যেমন বৈকুণ্ঠপুরে, তেমনি বন ধ্বংসের মাধ্যমে পাখিদেরও বিতাড়িত করা হয়েছে নিরন্তর। গল্পে লেখক এই দুই শ্রেণির স্ব-সংস্থান থেকে উন্মূল হয়ে ভাসমান হয়ে শহরে চলে আসার পেছনের কাহিনি বলেছেন, একইসাথে এ দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখিয়ে এক অপরের উপকারে আসার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেছেন; ফলে কাক সবসময়ই আকালু-টেপির উপকার করে কোনো না কোনোভাবে, কিন্তু আকালু-টেপির পরিপার্শ্বের

লোভ-রিরংসা সেটিকে দুর্ভাগ্যে পরিণত করে। শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত মুহূর্তে এই কাকেদের দল তাদেরকে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায় শহরের পাপলিপ্ত সীমানা থেকে। বস্তুত পরিপার্শ্বের জঘন্য মন-মানসিকতা ও লোভসিক্ত কদচার বের করে নেবার আর কোনো রাস্তা থাকেনা লেখকের কাছে, যুক্তির বন্ধনে আকালু-টেপিকে সেই অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত আবাস থেকে বাঁচানোর কোনো পথ থাকেনা; হয়তো তাদের মৃত্যুই নিশ্চিত হয়ে যায় কিন্তু লেখক কাকের ঝাঁকের সাথে তাদের উধাও করে দেন। এখানে যুক্তির বন্ধন ভেঙে যায়, বাস্তবতা যাদুর সাহায্য গ্রহণ করে, তৈরি হয় যাদুবাস্তব পরিণতি।

লেখক তাঁর উপসংহারে এই কাক ও কাঠুরের গল্প আপাতত শেষ করেন এই বাক্যে: "এই ঘটনার পর ঢাকা কাকশূন্য হয়ে পড়ে এবং ঢাকার প্রবীণ লোকেরা এখন মনে করতে পারে যে, সেইসব দিনে কলতলা থেকে সাবান হারানোর ঘটনা একেবারে বন্ধ হয়ে আসে; কিন্তু একই সঙ্গে রাস্তায় অপরিষ্কৃত আবর্জনার স্তূপ জমে যেতে থাকে এবং শহরের আকাশ একঘেয়ে পাখিহীন হয়ে ওঠে।"[২৪] শহরের ইকোলোজি সিস্টেমের মধ্যে পাখির অনুপস্থিতি যে একটি ভারসাম্যহীন পরিস্থিতি তৈরি করে লেখক যেন সেটিই বুঝাতে চান। 'একঘেয়ে' শব্দটি বস্তুত শহরের প্রাণ-বৈচিত্রহীন পরিবেশকেই প্রতীকায়িত করে। অর্থাৎ, শহরের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থেই প্রয়োজন কাকের মতো পাখির উপস্থিতি। পাশাপাশি নগরের বাইরের গ্রামের মানুষের মধ্যে স্বার্থচিন্তার রেশ কখনোই কাটবে না এবং এই প্রক্রিয়া বজায় থাকবে চিরকাল– এই সত্যের ভিত্তিতে নিরন্তর কাঠুরে আকালুর মতো মানুষ সর্বদা বাস্তুচ্যুত হতে থাকবে এটিও সত্য। ফলে গ্রাম থেকে শহরে আসা এবং শহরে টিকতে না পেরে একেবারে উন্মুল-উধাও হয়ে যাবার পন্থাটাও বজায় থাকবে। এভাবেই যাওয়া আসায় ভারসাম্য রক্ষিত হবে নগরের পরিবেশের– এই গাঢ়তম অনুভূতি শহীদুল জহিরের মনে কার্যকর ছিলো বলে গল্পের শেষটা তিনি বয়ন করেছেন এইভাবে:

> এভাবে বহুদিন কেটে যায়, তারপর আশেপাশের মফস্বল থেকে কিছু কাক আসে এই শহরে এবং মফস্বলের এই কাকের নতুন প্রজন্মের কাকের জন্ম দিয়ে শহরে আকাশ পুনরায় ভরে তোলে।[২৫]

ডুমুরখেকো মানুষ

'ডুমুরখেকো মানুষ' শহীদুল জহিরের সেই অনবদ্য গল্পের নাম, যেখানে মানবসভ্যতার চিরকালীন ভোগলিপ্সা ও চূড়ান্ত কামনার অপ্রাপ্তিজনিত বেদনার সুর একইসাথে গল্পের শরীর গড়ে তুলেছে। মোহাব্বত আলী জাদুগিরের জাদুর ডুমুর ফলের অলৌকিক শক্তি এবং সেই ফলের প্রতি সাধারণ ভোক্তার ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এই অসাধারণ গল্পের আখ্যান। গল্পকার যেন আদিকাল থেকে মানুষের মনে চিরকাল বেঁচে থাকার দৃঢ়মূল বিশ্বাসকে মূল মোটিফ করেই গল্পের ফাঁদ পেতেছেন। যাকে পুঁজি করেই বর্তমান বিশ্বে গড়ে উঠেছে বাজার অর্থনীতির রমরমা দশা। বিশ শতকের শুরু থেকে রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের নিরন্তর পতন এবং অর্থনৈতিক শোষণভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদের নবতর উন্মেষ মানুষের মনুষ্যত্বকে অপ্রধান করে তার উপযোগ-ক্ষমতাকে যেভাবে প্রধান করে তুলেছে তার ধারাবাহিকতায় মানুষ হয়ে উঠেছে অতিমাত্রায় ভোগপ্রবণ। এই ভোগের রকমফের থাকলেও সেগুলোর মধ্যে প্রধানতম ভোগের উদ্দেশ্য ব্যক্তির দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার পথ অনুসন্ধান। ব্যক্তি নিজেই যেখানে পণ্যের মতো উপযোগময়, সেখানে নিজের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত প্রয়োজন এমন কোনো আবিষ্কার বা উপাদান, যা মানুষের উপযোগ-ক্ষমতাকে করে তুলবে দীর্ঘস্থায়ী এবং সম্পদের উপার্জন ও ভোগে দেবে বেশি স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। ব্যবসায়ী জাদুকর মোহাব্বত আলী কৌশলে বেছে নেয় সেই ভোক্তাগণকে যারা তার অতি দুর্লভ ডুমুর ফলে আসক্ত হয়ে যায়। প্রথমে কম দামে দিলেও চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে মোহাব্বত আলী ডুমুরের দামও বাড়িয়ে দেয় এবং একসময় চাহিদা অপূর্ণ রেখেই উধাও হয়ে যায়। এদিকে যাদের আসক্তি চরম স্তরে পৌঁছে যায় তারা সন্ধান করে মোহাব্বত আরী যোগানদারের। সহজলভ্য না হওয়ায় সেই ভোক্তাগণ পৌঁছে যায় মোহাব্বত আলীর প্রহেলিকাময় প্রাসাদে, সেখানে বহুদরের বিনিময়েও যখন তারা মোহাব্বত আলীর কাছ থেকে যোগান পেতে ব্যর্থ হয় তখন এক প্রকার জিঘাংসা জেগে ওঠে তাদের মনে,ঘোরের মধ্যে খুন করে ফেলে একমাত্র যোগানদারকে। চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে চাহিদাপূরণের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠা এইসব পণ্যবাজারের অন্ধ ভোক্তা হারিয়ে ফেলে মনুষ্যত্বের শেষ সীমারেখা। পাপে নিমজ্জিত হয় তারা সহজস্বভাবে। পাপের জগতে লিপ্ত হয়ে নিজেদের সামাজিক অস্তিত্ব হারায়। বাণিজ্যবাজারের এই ক্রমশ অমানুষ হয়ে ওঠার বা মনুষ্যপদবাচ্য হয়ে থাকার বিশেষ যোগ্যতা হারানোর আখ্যান-ই শহীদুল জহির বর্ণনা করতে চেয়েছেন 'ডুমুরখেকো মানুষ' শিরোনামের এই গল্পে।

রাস্তার পাশে জাদু প্রদর্শনরত অবস্থায় 'জাদুগির' মোহাব্বত আলীর অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে শহীদুল জহির 'ডুমুরখেকো মানুষ' গল্পের পট উন্মোচন করেছেন। এই উন্মোচন-প্রচেষ্টায় চিত্রকরের উপস্থিতি

লক্ষণীয়: "তার মুখে একটি রহস্যময় হাসি ঝুলে ছিল। তার পাতলুনের ডান পায়ের প্রান্তটি সাইকেল ক্লিপ দিয়ে আঁটা, পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের জুতো, সাদা ফুল হাতা শার্টের প্রান্ত ধূসর রঙের প্যান্টের ভেতর গুঁজে দেয়া, মাথায় একটি জীর্ণ এবং তোবড়ানো কাপড়ের হ্যাট; সে যখন একটু নাটুকে পোজ নিয়ে মাথা উঁচু করে, দেহটা পিছন দিকে সামান্য বাঁকা করে দাঁড়ায়, তখন তার মুখে সেই অস্পষ্ট হাসিটি দেখা যায়।"[২৬] এই অঙ্গ সজ্জার বর্ণনার পাশাপাশি লেখক তার অঙ্গভঙ্গিও বিস্তারিত দৃষ্টিযোগে তুলে ধরেন। জাদুকরের আচরণে তার চারপাশে দাঁড়ানো কৌতূহলী দর্শকের বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্যময় ব্যাখ্যাদানেও সচেষ্ট থাকেন লেখক সবসময়: "এইটা কি? সে জিজ্ঞেস করে... তার মুখের হালকা হাসি এবং চোখের গভীর আলোর দিকে তাকিয়ে উপস্থিত লোকেরা চুপ করে থাকে, তাদের ওষ্ঠে একই রকমের একটু হালকা হাসি স্ফুরিত হয়, তাদের সম্ভবত এরকম মনে হয় যে, এই প্রশ্নটির পিছনে হয়তো গভীর কোনো একটি প্রশ্ন আছে, যার উত্তর তারা জানে না, অথবা এই প্রশ্নটা হচ্ছে একটা ফাঁকি এবং এই ফাঁকিতে তারা এক বয়স্ক লোক হয়ে ধরা দিতে পারে না; তারা বুঝতে পারে যে, একটি জলজ্যান্ত হাড় দিনের স্পষ্ট আলোয় তুলে ধরে এটা কি বললে ব্যাপারটা রহস্যময় হয়ে যায়।"[২৭]

এই রহস্যময়তা রেখেই গল্পকার মোহাব্বত আলীর জাদুক্ষমতা দেখান, একটি হাড়কে সে পুনর্জন্ম দেয় নারীর রূপ দিয়ে এবং তাকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দেয়। এই অদ্ভুত ক্ষমতা উপস্থিত জনতার মনে কৌতূহল তৈরি করে, অতঃপর মোহাব্বত আলী তার বিক্রিযোগ্য পণ্য দুর্লভ 'জগডুমুর' সম্পর্কে বিজ্ঞাপনসূচক বক্তব্য দেয়, বিজ্ঞাপনে সে এটাও উল্লেখ করে যে, শুধু জীবনধারণের জন্য চাল-ডাল কেনার লক্ষ্যেই সে এই নিজের বাগানে চাষ করা দুর্লভ জগডুমুর বিক্রি করছে, সাথে সাথে প্রথমবার সে পঁচিশজনকে বিনামূল্যে খাওয়ানোর ঘোষণা দেয়, তন্মধ্যে অনেকেই অন্যান্য ফল খেতে চাইলে সে জানায় সে তাদের চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম। কারণ সে শুধু তার বাগানের ডুমুর ফলই যোগাতে পারে; ফলে একজন খায় তার জগডুমুর। সেই একজনকে সে খাইয়ে তার স্বাদ সম্পর্কে প্রমাণ গ্রহণ করে এবং সে ব্যক্তি আরও খেতে চাইলে তার কাছে ছয়টি ডুমুর দুই টাকায় বিক্রি করে। লোকটি ডুমুর কেনার পর তা কার্যকরভাবে উপস্থিত জনতার মধ্যে আরও এগারো জনকে আকর্ষণ করে। পুরনো ঢাকার ও শহরের বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলের এই এগারো জন লোকই হয় তার প্রথম ক্রেতা। পরবর্তীকালে আরও দু-একদিন এই জায়গায় বা তার পার্শ্ববর্তী কোনো জায়গায় জাদু দেখানোর সময় এই ক্রেতাগণ পুনরায় তার কাছ থেকে ডুমুর ক্রয় করে এবং তাদের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে ডুমুরের দামও বৃদ্ধি পায়। একপর্যায়ে ছয়টি ডুমুরের দাম বেড়ে যখন চৌষট্টি টাকায় ওঠে তখন সেই

ক্রেতাদের অনেকের সাধ্যের সীমা অতিক্রম করে; কিন্তু তাদের ভোগবৃত্তিতে ডুমুরের চাহিদা রয়ে যায়। কার্যত, ভোক্তামহলে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়।

গল্পের এপর্যন্ত বয়নে শহীদুল জহির যে স্পষ্টতই অর্থনীতির সাধারণ কৌশল ব্যবহার করেছেন তা সহজে পরিরদৃষ্ট। বিশ্বায়নের যুগে যেখানে ব্যবসায়িক বিনিয়োগ, ভোগের নবতর আবিষ্কার-সন্ধানে সর্বদা তৎপর এবং মানুষের ভোগৃত্তিকে নানাভাবে জাগিয়ে তুলে সেই ভোগেই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, সেখানে মোহাব্বত আলীর এমতো জীবনীসুধা সহজেই যে অর্থনৈতিকভাবে সাচ্ছল-অসাচ্ছল সকল শ্রেণিকে আকর্ষণ করবে তা সহজ অনুমেয়।[২৮]তৎসঙ্গে এচিত্রও প্রাসঙ্গিক যে, চাহিদার বিপরীতে যোগানের অপ্রতুলতা একপ্রকার অসন্তোষ তৈরি করবে ক্রেতা-ভোক্তামহলে। কিন্তু যেসকল ক্রেতা চড়ামূল্যের বিনিময়ে দ্রব্য পেতে চেয়েও পান না তারা যে কোনো উপায়ে তা হাসিল করতে চান। প্রয়োজন ভেদ করে সেই দ্রব্যের প্রতি তাদের মোহ তৈরি হয়। মোহগ্রস্ত হয়েই, প্রয়োজনে নিজের নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে হলেও তারা তা অর্জনের চেষ্টা করে সর্বোচ্চভাবে। শহীদুল জহির শেষপর্যন্ত এই গল্পে সেই মোহান্ধদের কথা ও পরিণতি দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন।

সেই সূত্রে এই গল্পে দেখা যায়, ওইসব ক্রেতাদের মধ্যে পাঁচজন লোক তাদের সাধ্য থাকায় পুনরায় ডুমুর কিনতে চায় এবং মোহাব্বত আলী নাকচ করলে তারা একটি আস্ত ডুমুর গাছ কেনার প্রস্তাব করে, তৎপ্রয়োজনে তারা হাজার টাকা ব্যয় করতেও রাজি বলে জানায়। কিন্তু মোহাব্বত আলী তাদের আবেদন খারিজ করে দেয়। ফলত তারা ক্রুদ্ধ হয় এবং প্রয়োজনে মোহাব্বত আলীর বাসায় গিয়ে ডুমুর গাছ নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারপর "এক শনিবার সকালে তারা শ্যামবাজার পার হয়ে দক্ষিণ দিকে তাকাতেই এক সুউচ্চ প্রাসাদ দেখতে পায়; তারা দেখে যে, একেবারে নদীর ধারে, মনে হয় যেন নদীর উপরেই, সোনালি রঙের গম্বুজওয়ালা এক অতিকায় অট্টালিকা আকাশের ভেতর উঠে গেছে।"[২৯] বস্তুত মোহগ্রস্ত হয়েই তারা মোহাব্বত আলীর প্রাসাদে প্রবেশ করে এবং মোহাব্বত আলী তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করলেও তারা তা মানে না; ফলে শক্তি প্রয়োগ করেই তারা সেখানে ডুমুরগাছ অনুসন্ধান করে। তারা এই সত্যও আবিষ্কার করে যে, বৃহৎ প্রাসাদে জাদুকর মোহাব্বত আলীর সহযোগী হিসেবে নিতান্তই তার স্ত্রী থাকার কথা থাকলেও সবই জাদুর খেলা মাত্র; দুটি হাড় এবং মোহাব্বত আলী সেই প্রাসাদের একামাত্র বাসিন্দা। এমতাবস্থায় মোহাব্বত আলী তাদের অনুসন্ধানে বাধা দিলে তারা তার ওপর চড়াও হয় এবং "তখন সেই ঘরের ভেতরের আধো-অন্ধকার রহস্যময় পরিবেশে পাঁচজন অপরিণামদর্শী ডুমুরখেকোর চেতনায় ওলট-পালট ঘটে যায়...

তারা লোহার ডান্ডার নির্মম আঘাতে জাদুকরের মস্তক করোটি চূর্ণ করে কাটারি এবং বর্শার ঘায়ে দেহ থেকে তা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।"[৩০]

পুরো গল্পের মতো এই অংশেও লক্ষ্যণীয় জহিরের ইঙ্গিতবাহী শব্দের ব্যবহার। পারিপার্শ্বিকতার 'রহস্যময়তা'র সঙ্গে চরিত্রসমূহের 'চেতনা'র 'ওলট-পালট' একটি যৌক্তিক সন্নিবেশন ঘটিয়েছে যা গল্পের পরিণতিকে বিভ্রমসম্ভব করে তুলেছে। দিশেহারা এইসব মোহান্ধ ভোক্তা নিজেদের চাহিদাপূরণের লক্ষ্যে আপনাপন মনুষ্যচেতনকে অবনমিত করেছে এমন একটি স্তরে, যেখানে নামার পর আর মনুষ্যপদবাচ্যে চিহ্নিত হওয়ার অধিকার কারো থাকেনা। ফলে গল্পের শেষে লেখক এইসকল 'পাপী'র আর অস্তিত্ব খুঁজে পান না। ফলে ওই ঘটনার পর যখন "তারা সম্বিৎ ফিরে পায় ... তখন তারা পিছনে ফিরে কোনো সোনালি গম্বুজওয়ালা অট্টালিকার চিহ্ন দেখতে পায় না কোনো মাঠ কিংবা সিংদরজাও দেখে না, তারা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে পানির কিনারায় এক কাঠ চেরাইয়ের কারখানার পাশে নিজেদের আবিষ্কার করে; তারা প্রথমে ভাবে যে, এতক্ষণ যা কিছু ঘটেছে তা স্বপ্ন ছিল, কিন্তু তখন তারা নিজেদের হাতে লোহার রড ও খঞ্জর এবং নিজেদের গায়ের জামা রক্ত রঞ্জিত দেখতে পায়।"[৩১] মোহান্ধতার আচ্ছন্নতা তাদেরকে যেভাবে অমানুষ করে তোলে তাতে তাদের কোমল প্রাণের অবলুপ্তি ঘটে এবং কার্যত তাদের মনুষ্যত্ববোধশূন্য হয়ে যায়। লেখক এই শূন্য হয়ে যাওয়াকে দৃশ্যত কার্যকর দেখাতে চান। ফলত গল্পে আসে জাদুময় পরিসমাপ্তি। তাই গল্পের শেষে ওই পাপীদের কাউকে আর বাহ্যিকভাবে পাওয়া যায় না, খুন করে ফিরে এসে "সেই শনিবারের দুপুরবেলায় রক্তচক্ষু এবং কম্পিত দেহে পৃথিবীকে পিছনে রেখে তারা তাদের গৃহে প্রবেশ করে বিছানায় গিয়ে শোয় এবং প্রবল তাপ ও শারীরিক বিক্ষেপের কারণে তাদের গৃহের লোকেরা তাদের দেহ চাদরে ঢেকে দেয়। তারপর কত মিনিট কত ঘন্টা পর তা তাদের গৃহের লোকেরা বলতে পারে না, তবে একসময় ঘরে ঢুকে তারা বিছানার দিকে লক্ষ করে এবং চাদরের নিচে কোনো মানুষের অবয়ব দেখে না। তারা এসময় ভাবে যে, লোকটি বোধ হয় বাথরুমে গেছে, কিন্তু বাথরুমে তাকে খুঁজে পায় না; এবং তখন, সারা বাড়ির কোথাও এই লোকটিকে, যে লোকটি কিছুদিন হয় জগডুমুর খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেছিল, খুঁজে পাওয়া যায় না।" পরিবর্তে "পাঁচটি বাড়িতে বাড়ির লোকেরা বিছানার ওপর ধূসর বর্ণের একখণ্ড হাড় পড়ে থাকতে দেখে।"[৩২] জাদুকরের হাড়ের নিহিতার্থ প্রকাশে গল্পের শেষে গল্পকার যেভাবে সেই হাড়ের বা হাড়সমূহের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন তাতে গল্পে গড়ে ওঠে এক রূপকথার কায়া, সেই রূপকথা বর্তমান বেনিয়া সভ্যতার ভোগপ্রবৃত্তির, মনুষ্যত্বের কোমলতা হারিয়ে শুধু নিঃসাড়-হাড় হয়ে যাবার সমকালীন বৃত্তান্ত।

এই সময়

বালক মোহাম্মদ সেলিম ও বিধবা যুবতী শিরীনের অতৃপ্ত প্রেমের আখ্যান 'এই সময়' গল্পটি। মূলত প্রণয়োপাখ্যান হলেও লেখকের দৃষ্টি প্রসৃত একটি কালখণ্ডের উপর। কোনোপ্রকার বিশ্লেষণে না গিয়ে শহীদুল জহির মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সমরশাসনের (বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুপরবর্তীকালে) কালখণ্ডে উদ্ভূত পরিস্থিতি কীভাবে দুটি কোমলপ্রাণে হৃদয়বৃত্তি জাগিয়ে তোলে এবং ওই পরিস্থিতি-সৃষ্ট শক্তিধর ব্যক্তিবর্গের অচরিতার্থ লিপ্সার কবলে পড়ে মোহম্মদ সেলিমের নির্মম মৃত্যু (হত্যাকাণ্ড) ঘটে তা নিয়েই লেখক গল্পটির আখ্যানবৃত্ত সাজিয়েছেন[৩৩]।

গল্পের কেন্দ্রে মোহাম্মদ সেলিম ও শিরীনকে রেখে শহীদুল জহির সমাজের বেড়াজাল অঙ্কন করেছেন। প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন ও শক্তির বিচারে সবাই তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও সহায়শূন্য দুটি প্রাণি মোহাম্মদ সেলিম ও শিরীনের উপর নিজেদের প্রতাপ প্রয়োগে স্বার্থ-উদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছে। একটি বিশেষ ক্ষমতাকাঠামোর অন্তর্গত একশ্রেণির ব্যক্তি নিজেদের মনের অন্ধকার কোটরে লুকিয়ে থাকা অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য যেভাবে তাদের চেয়ে কম শক্তিধর ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করে কর্মপরিচালনা করে 'এই সময়' গল্পটি সেই গোষ্ঠীর বা সঞ্চালকবৃন্দের লোলুপতার আখ্যানরূপ।

ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ও পারস্পরিক শক্তি-বিচারে কখনও সমঝোতায় এসে তুলনামূলকভাবে শক্তিশ্রেষ্ঠের কাছে হার মানে। তখন নিজেরা একতাবদ্ধ হয়ে নিজেদের গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠতমের স্বার্থোদ্ধারে সোচ্চার হয় এবং যে করেই হোক সেই লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য লাভ করে। এ গল্প সেই সফলতার আখ্যান। কিন্তু তাদের সফলতা অন্য পক্ষের ব্যর্থতা নিয়ে আসে। নিয়ে আসে করুণ পরিণতি। তাদের কর্মপ্রক্রিয়া অন্যের নিয়তি গড়ে দেয়। সে নিয়তি ট্রাজিক; স্বার্থলিপ্সার অশুভ শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এক অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনায় জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পিতা বাবুল এবং মাতা হাজেরাকে হারিয়ে একা বেঁচে যাওয়া দুর্ভাগ্যসঙ্গী বালক মোহাম্মদ সেলিম। আমৃত্যু দুর্ভাগ্যকে সঙ্গী করে বেড়ে ওঠা বালক যখন নিজের পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ফুলের বাগান গড়ে তোলে, তখন সেই পুলের রেণুঘটিত কাণ্ডে মহল্লায় হাঁচির উপদ্রব ঘটে। লেখক বোঝাতে চেয়েছেন এমন একটি প্রতিবেশ, যেখানে সুন্দরকে প্রতিহত করার শক্তিগুলো সর্বদা ক্রিয়াশীল থেকে যেকোনো সুন্দর কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে নিজেদের অসুখের উপসর্গ হিসেবে চিহ্নিত করে। এমন সময়ের বর্ণনা দিতে লেখক এই গল্পে এমন কিছু চরিত্র গড়ে তুলেছেন, যারা ওই সময়ের রাজনৈতিক বাস্তবতা দ্বারা সুবিধালব্ধ এবং ক্ষমতা

প্রয়োগের শক্তিতে পরিপুষ্ট। এই চরিত্রগুলো ক্ষমতাকাঠামোর বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করলেও স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে সর্বদা একজোট। চরিত্রগুলো যথাক্রমে, স্থানীয় মাস্তান তিনভাই আবু-হাবু-শফি, শরীয়ত পার্টির নেতা মাওলানা আব্দুল জব্বার, পঞ্চম প্রতিরোধ বাহিনীর মেজর ইলিয়াস, ইয়াসিন ব্যাপারির বিধবা স্ত্রী মালেকা বানু। লেখক এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রদ্বয় সেলিম ও শিরীনকে এই ক্ষমতাজালের বেড়াবদ্ধ অবস্থানে স্থাপন করেছেন।

প্রথমত হাঁচির ঘটনায় এইসব বিরুদ্ধশক্তির কোপানলে পড়ে বালক মোহাম্মদ সেলিম এবং দ্বিতীয়ত বিধবা শিরীন বাপের বাড়ি ফিরে এলে তার রূপমাধুর্যের জালে আটকা পড়ে সকল বিরুদ্ধ শক্তি। ইতি-নেতির দুই প্রান্ত হিসেবে সখ্য গড়ে ওঠে বিধবা শিরীন এবং বালক মোহাম্মদ সেলিমের। প্রণয়ের তুলনায় স্নেহসিক্ততা বেশি দৃশ্যমান হলেও শেষপর্যন্ত শিরীর-সেলিমের সম্পর্ক প্রণয়ের। ফুল-পাখি-রঙ দিয়ে যে সম্পর্কের শুরু উদ্যত ঠোঁটের স্পর্শে তার পূর্ণতা:

> এই কিশোর-যুবকের ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে শিরীন আকতার উদ্বেলিত হয়, সে বলে, তুমি আহনা ক্যালা?
>
> ফুল ফুটে নাই, মোহাম্মদ সেলিম বলে, ফুল আনা পারিনিকা।
>
> ফুল ফুটে নাই, ফুটে নাই! তুমি আহনা ক্যালা?ভিতরে আহো !
>
> শিরীন আকতার তার ডান হাত প্রসারিত করে বালকের কাঁধ আকর্ষণ করে তাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে আসে। ড্রইংরুমে কার্পেটের ওপর তারা যখন এসে দাঁড়ায়, মোহাম্মদ সেলিমের ম্রিয়মাণ মুখের দিকে তাকিয়ে... শিরীন আকতারের হৃদয় বিগলিত হয়; তখন বাইশ বছরের এই অনিন্দ্যযুবতী মোহাম্মদ সেলিমকে আলিঙ্গন করে, ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়ে টেনে নামিয়ে তার শুকনো বাদামি ঠোঁটে চুম্বন করে।[৩৪]

দুজনের এই সুন্দর পরিণতি গত শতকের আশির দশকের রাজনৈতিক বাস্তবতায় বেমানান এবং ক্ষমতাকাঠামোর কাছে অস্তিত্ববিনাশী হুমকিস্বরূপ। ফলত, পুনরায় তাদের অস্বস্তি-উৎপাদক মোহাম্মদ সেলিমকে হত্যা করা ছাড়া উপায় থাকে না। সকলকে শক্তিতে পরাজিত করে আবু হোসেন শিরীন আকতারকে জোরপূর্বক বিবাহ করে। লেখক অসামান্য দক্ষতায় সেই বিবাহ সম্পন্ন হবার বিচিত্র এক চিত্র বর্ণনা করেছেন –

> বিয়ের দোয়া পড়ার পর কাজি সাহেব যখন শিরীন আকতারের সামনে বসে বলে যে, ইমারত হোসেনের পুত্র আবু হোসেনের সঙ্গে সে তার বিয়ের প্রস্তাব কবুল করে কি না, তখন সেখানে উপস্থি সকলে স্পষ্ট এবং উঁচু করে উচ্চারিত শিরীন আকতারের 'না' শুনতে পায়। তিনবার শিরীন

আকতার 'না' বলে এবং তিনবারই ঘরের লোকেরা বলে ওঠে, কবুল করছে এবং তারপর বলে, বিয়া হয়া গেল, অখন আমরা যাই।[৩৫]

অতঃপর মোহাম্মদ সেলিমের পরিণতি নেমে আসে নাটকীয় আকস্মিকতায়, অত্যন্ত রূঢ়চিত্রের বর্ণনার মতো শহীদুল জহির বর্ণনা করেছেন সেই ঘটনা:

পরদিন ভোরে ফজরের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়ার সময় মহল্লার লোকেরা শিরীন আকতারদের বাড়ির সামনে লাইটপোস্টের সঙ্গে ভোরের প্রকাশ্য আলোর ভেতর, শিরীন আকতারের প্রেমিক এবং গ্রাজুয়েট হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র মোহাম্মদ সেলিমের মৃতদেহ ঝুলে থাকতে দেখে।[৩৬]

তৎকালীন ক্ষমতাকাঠামোর ভয় দেখিয়ে জয় করার বস্তুসত্যটি লেখক এই মৃত্যু-অব্যবহিত পরের বর্ণনায় সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেন। তদন্তকারী পুলিশ এসে এই হত্যার প্রধান সন্দেহভাজন ওই তিন ভাইয়ের সম্পর্কে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করে তখন গণ্যমান্য সকলেই বলে যে – "তিন ভাই ভালো ছেলে।... তারপর সে লাশকে ঘিরে জড়ো হওয়া মহল্লার লোকদের জিজ্ঞেস করে তাদের কিছু বলবার আছে কি না; তখন দারোগার কথা শুনে মহল্লার লোকেরা প্যান্টের পকেটে হাত গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকা তিন ভাই এবং গণ্যমান্য লোকের দিকে তাকায়, তারা কিছু বলতে পারে না। দারোগা নীরবে অপেক্ষমাণ লোকদের দিকে তাকিয়ে লেখে যে, কারো অভিযোগ নাই।"[৩৭]

বস্তুত অসুন্দরের প্রতিবেশে সুন্দরের বিলীন হয়ে যাওয়ার এক অবক্ষয়ের গল্প 'এই সময়'। গল্পটির মোহাম্মদ সেলিম ও শিরীন সেই নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত তৎকালীন সময়ের ট্রাজিক চরিত্র। 'এই সময়' গল্পটি মূলত আধুনিক জীবনে দুটি অতৃপ্ত প্রাণের ট্রাজেডি-আখ্যান।

কাঁটা

একটি মহল্লার যৌথ জীবনে স্থান করে নেয়া কোনো হৃদয়বিদারক ঘটনা যখন স্থায়ী হয়ে ওঠে, তখন সেই স্মৃতি তাদের মনোতলে বিধে থাকে কাঁটার মতোই। 'কাঁটা' ভূতের গলির মহল্লাবাসীর সেই মনোজাগতিক কাঁটার আখ্যান।

শহীদুল জহির এ গল্পে মূলত মহল্লার যৌথমানসের সজাগ অনুভূতির চিত্র এঁকেছেন ; একটি অসচেতনতাসৃষ্ট ভুল থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা যে যৌথমানস ভুলতে পারে না কোনোমতে। যা তাদের মনে দীর্ঘকালব্যাপী জায়মান থাকে- 'কাঁটা' সেই স্মৃতির অভিজ্ঞতা ও ভুল শোধরানোর প্রচেষ্টার গল্প।

গল্পের মূল বক্তব্য বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালীন ধর্মপ্রসূত জাতিদ্বেষ, উগ্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের সুরক্ষায় হিন্দু-নিধন, বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তীকালীন প্রায় দু দশকব্যাপী নবরূপে মুসলিম জাতীয়তাবাদের চর্চায় পুনরায় হিন্দু বিদ্বেষের জাগরণকে কেন্দ্র করে লেখক গল্পের আখ্যান সাজিয়েছেন।[৩৮]২০০০ সালে ভারতের বাবরি মসজিদ আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মুসলিম চেতনায় পুনর্জাগ্রত ধর্মীয় উন্মত্ততার সূত্রে পুনরায় হিন্দুসম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়ন পরিচালনা পর্যন্ত প্রলম্বিত করেছেন।

কালগতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিষয়ের অভিন্নতা বিচার করে লেখক প্রতীকী চরিত্র হিসেবে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে একই চরিত্র সুবোধচন্দ্র স্বদ্রা ও পরানকে গল্পের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত করেছেন। মূলত লেখক বাংলাদেশের জনমানসে স্বাধীনতাকালীন জাতীয়তাবোধের বিপরীত পশ্চাৎপদ ধর্মীয় উন্মত্ততাজাত মুসলিম জাতীয়তাচেতনার নিরিখে সর্বদা জেগে ওঠা হিন্দু-সম্প্রদায়ের অসহায়ত্বকে গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

উন্মত্ততা ও অসচেতনতার যুগপৎ অবস্থিতি ওই মহল্লার মানুষগুলোকে একটি অভিন্নপ্রবনতাবিশিষ্ট সময়ের বেষ্টনে আকটে রাখে। ফলত তারা একটি সময়ের বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়। অতীত হোক, বর্তমান হোক কিংবা ভবিষ্য যে কালেই হোক না কেন। কর্মের ও বোধের অপরিবর্তিত রূপের কাছে তাদের পরিবর্তিত কালের রূপটি অস্পষ্ট থেকে যায়। কিন্তু তারা একইসঙ্গে কখনও ভুলতে পারে না যে, তাদের অসচেতনতার কারণেই প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল ; মৃত্যু হয়েছিল সুবোধ চন্দ্র স্বদ্রা ও পরানের। ফলত তারা পরবর্তীকালে সচেতন হয়ে উঠতে চায় কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাদের আওতা-বর্হিভূত। ফলত বারংবার খেদ থাকা সত্ত্বেও একই ঘটনা ঘটতে থাকে এবং ধর্মীয় উন্মত্ততার থাকায় বলির শিকার হয় সুবোধচন্দ্র, স্বপ্না ও পরান নামক হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগন।

হয়তো সর্বদাই সুবোধচন্দ্র স্বপ্না সেই ঘটনা শিকার হয় না কিন্তু পরিণতি তো অভিন্ন। তাই অন্য কেউ (হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত) ওই পরিণতি লাভ করলেও তারা একই পরিচয়ে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে তারা তাদের মনে বারংবার স্বপ্না-সুবোধচন্দ্র ও পরানকেই প্রতিস্থাপিত করে এবং অতীত থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলিকেও অঙ্গীকৃত করে ফেলে। ফলত ঘটনার পুররাবৃত্তি হলে তাদের মনে ওই অতীতেরও পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং তাদের স্মৃতিসত্তায় রক্ষিত স্মৃতি অভিন্নতাবশত বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়:

> ভজহরি সাহা স্ট্রিট বা ভূতের গলির লোকেরা এরকম সন্দেহ করে যে, তারা সময়ের একটি চক্রাবর্তের ভেতর আটকা পড়ে গেছে। (ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে) তারা দেখতে পায় যে, তাদের জীবনে সময়ের কাঠামোটি ভেঙে পড়েছে, বর্তমান অতীতের ভেতর প্রবিষ্ট হয়ে গেছে অথবা অতীত বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।[৩৯]

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন বেদনার বারংবার পুনরাবৃত্তির একটি গোষ্ঠীর মানবিক অনুভূতিসমূহকে বাধাগ্রস্ত করে এবং সেই বাধা উৎরাতে না পেরে তারা আত্মজাগতিক সঙ্কটে নিপতিত হয়। মনোজগতের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। 'কাঁটা' এই মনোজাগতিক বিভ্রম ও বেদনাসিক্ত সজাগ স্মৃতিসমূহের হৃদয়স্পর্শী আখ্যান।

'কাঁটা' গল্পের আবদুল আজিজ ব্যাপারির বাড়ির কুয়ায় পড়ে সুবোধ-স্বপ্নার মৃত্যুপ্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি একটি রূপকের সৃষ্টি করে। যেখানে আবদুল আজিজ ব্যাপারির বাড়িটিকে বলা যায় এই বাংলাদেশের রূপক এবং দেশটি সংখ্যাগরিষ্ঠতাসূত্রে মুসলিম আবদুল আজিজের মালিকানাধীন অনন্তর সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকলেও সেই দুয়ের মধ্যে কুয়ার অবস্থিতি বর্তমান থাকে সবসময়। কেননা সম্প্রীতির বন্ধন থাকা সত্ত্বেও বিশশতকের তৃতীয় দশক থেকে এদেশে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ঘটনা ঘটে আসছে; যার ভিত্তিতে দেশবিভাগ হওয়ার পর বোধটি প্রবলতর হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের (এই বঙ্গের) জনমানসে সেটি প্রবল নয়- আনেকটাই নিস্তেজ। কিন্তু মাঝে মধ্যেই সেই নিস্তেজভাব কেটে যায় ; ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা পরস্পরকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয় এবং হিন্দুধর্মী সুবোধ ও স্বপ্নাগণ সেই অন্ধকার কূপে নিপতিত হয়ে প্রাণ হারায়।

আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস

'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস' গল্পটি শহীদুল জহিরের কর্মসচেতনাত্মক অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। নিজের শিল্পসৃজন ও তার প্রকাশের ব্যাপারে লেখকের অখণ্ড মনোযোগের শিল্পরূপ আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস।

গল্পটির নামকরণের মধ্যেই এর আখ্যানরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে: তা হলো – 'দক্ষিণ মৈশুন্দির শিল্পায়নের ইতিহাস'। গল্পটির বয়নকৌশল প্রায়শ মূলপ্রসঙ্গের মনোযোগিতাকে ব্যাহত করলেও লেখক বারংবার তার প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন – কীভাবে কালের

বহমানতায় যন্ত্রের আগমনে দক্ষিণ মৈশুন্দি শিল্পায়নের কবলে পড়ে কালের পরিবর্তনশীলতায় শিল্পপ্রধান মহল্লায় পরিণত হয় এবং সে ক্রমপরিণতি কীভাবে ভবিষ্যতের অভ্যন্তরাভিমুখী যাত্রায় চলমান। কিন্তু লেখক বলতে চান ইতিহাস, ফলে তিনি প্রায়শই সময়ের বৃত্ত ভেঙে অতীতের প্রসঙ্গে চলে যান এবং বর্তমানের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হয়ে মহল্লার শিল্পায়নের পূর্বাপর গল্পবৃত্ত পূর্ণ করেন:

> আমাদের মহল্লা, দক্ষিণ মৈশুন্দির শিল্পায়নের ইতিহাস আমাদের মনে পড়ে; মহল্লায় গরম পড়তে শুরু করলে চৈত্র, বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে তরমুজওয়ালারা তরমুজ নিয়ে আসে এবং আমরা তরমুজ খেতে শুরু করি, আমরা তখন তরমুজ সম্পর্কে সচেতন হই;[৪০]

তরমুজ সম্পর্কে মহল্লার মানুষের এই সচেতনতাই একদিন তাদেরকে, বিশেষত হাজি আবদুর রশিদকে নতুনভাবে ভাবিয়ে তোলে এবং মৃত্যুশয্যায় তরমুজ চেয়ে না পেয়ে সে সারাবছর তরমুজ মজুদের উপায় হিসেবে ছেলেকে পরামর্শ দিয়ে যায় ফুড ফ্যাক্টরি তৈরি করতে। "আমরা এই কোম্পানির মালিক হাজি আব্দুর রশিদের বড় ছেলে হাজি রইসুদ্দিনের মুখে তার পিতার নির্দেশের কথা শুনি এবং আমরা বুঝতে পারি যে, মৃত্যুশয্যাতেও হাজি আব্দুর রশিদের চিন্তা করতে পারার ক্ষমতা পরিষ্কার ছিল, পাঁচবার তরমুজ খেতে চাওয়ার পরও যখন তরমুজ পাওয়া যায় না, তখন তিনি সঙ্কটের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারেন এবং বড় ছেলে রইসুদ্দিনকে বলেন, একটা তরমুজের ফ্যাক্টরি বসাও, তারপর তিনি মারা যান;"[৪১] ফলে দক্ষিণ মৈশুন্দি এলাকায় তরমুজকে কেন্দ্র করে প্রথম খাবার শিল্পের প্রতিষ্ঠান 'হাজি ফুড প্রডাক্ট কোম্পানি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলত, গ্রীষ্মকাল এলেই তরমুজ দেখলে মহল্লার মানুষদের নিজেদের কুটির ঘিরে গড়ে ওঠা শিল্পায়নের ইতিহাস মনে পড়ে। শুধু তরমুজে নয়, প্রায় শিল্পায়ন প্রাসঙ্গিক সকল ইতিহাসই তাদের স্মৃতি বিস্মৃতির অতল থেকে ভেসে আসে কারখানার শব্দে, লেদ মেশিনের আওয়াজের মাধ্যমে।

কালের বহমানতা একটি অনিয়ন্ত্রিত'শক্তি' হিসেবে এ-গল্পে কার্যকর। একটি সময়ে শুরু হওয়া কোনো উদ্যোগ নিয়ত পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলে। আর পূর্ণতার কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই বলেই তা নিত্য ভবিষ্যতের পূর্ণতার দিকে ধাবমান। এই সত্যমূলীভূত বলেই এ গল্পের আখ্যান কোনো পূর্ণ যতির মধ্যে আবদ্ধ করেননি শহীদুল জহির ; এবং অনিঃশেষ গন্তব্যের অন্বেষণে ভবিষ্যতের গর্ভে প্রবাহিত করেছেন গল্পের আখ্যানকে, এদিক থেকে গল্পটি একটি মুক্তমুখী গল্প। এই অভিনব খোলামুখের গল্পকাঠামো নির্মাণে শহীদুল জহির প্রত্যয়ী এবং সচেতন। ফলে আলোচ্য গল্পগ্রন্থে গল্পটি ছাপা হলেও তা শেষপর্যন্ত পূর্ণ-যতিতে থেমেছে। লেখক এর গতিকি আটকাতে নারাজ; ফলত তিনি

পুনরায় তাঁর পরবর্তী গল্পগ্রন্থ 'ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প'- তে গল্পটি যুক্ত করেছেন বিশেষ অনুক্রমণিকাসহ:

> 'আমদের কুটির শিল্পের ইতিহাস' গল্পটি একটিমাত্র অনুচ্ছেদে রচিত, অন্তিমে পূর্ণচ্ছেদসূচক-যতিচিহ্ন বিহীন এবং উন্মুক্ত বা খোলা। গল্পটা 'মাটি' নামক সাময়িকীতে এভাবেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এটাই শুদ্ধ পাঠ।"[৪২]

ধুলোর দিনে ফেরা

'ধুলোর দিনে ফেরা' শহীদুল জহিরের মুক্তিযুদ্ধ ব্যতীত ভিন্নধারার রাজনীতি, তৎসঙ্গে জড়িয়ে পড়া আব্দুল ওয়াহিদের ব্যক্তিগত জীবনের অচরিতার্থ প্রেম ও প্রতিশোধপ্রাপ্ত মৃত্যুর গল্প। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্বকালে ষাটের দশকের শেষের দিকে চৈনিক নেতা মাও সে তুঙের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে চারু মজুমদার কানু স্যানাল প্রমুখের অধিনায়কত্বে ভারতের পূর্বাঞ্চলে যে নকশাল আন্দোলন শুরু হয়, তরি প্রভাব পরবর্তীকালে ছড়িয়ে পড়ে তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল তথা বাংলাদেশেও। সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে সর্বহারা পার্টির তৎপরতায় 'শ্রেণিশত্রু' খতমের লক্ষ্যে যে অধিকার অন্দোলন শুরু হয় তা মূলত দুটি শ্রেণিকে নিজেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়:

১. ভূমিহীন মজুরপ্রধান কৃষকশ্রেণি
২. মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছাত্র-শিক্ষক তথা বুদ্ধিজীবী শ্রেণি।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ভারত-বাংলাদেশে উভয় দেশেই এই শ্রেণির আন্দোলনকে রাষ্ট্রের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং শক্তহাতে দুই দেশের সরকার তাদের নিধন করে। সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। একটি ভূ-খণ্ডের এই রাজনৈতিক বাস্তবতা অনুধাবন করেই শহীদুল জহিরের এই গল্পের মূল চরিত্র আব্দুল ওয়াহিদের আখ্যান বিবেচনা করতে হবে।

কেননা এই গল্পে আব্দুল ওয়াহিদের যেসকল তথ্য পাওয়া যায় গ্রামবাসীর সূত্র ধরে, তাতে জানা যায় প্রায় একুশ বছর পূর্বে সুহাসিনী গ্রামের আব্দুল ওয়াহিদ বন্ধু আবুল হোসেনকে নিয়ে ঢাকা শহরে উচ্চ শিক্ষার্থে গমন করে। সেখানে আবুল হোসেন নিজের লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তার চেয়ে বেশি মেধাবী আব্দুল ওয়াহিদ নকশাল আন্দোলনে যোগ দেয় এবং শ্রেণিশত্রু খতমের লক্ষ্যে নিজের গ্রামেই

আসে সেই নকশালপন্থীদের নেতা হয়ে। নেতৃত্ব দৃশ্যমান থাকলেও সে থাকে অদৃশ্য। গোপন দলের রাজনীতির সাথে যুক্ত থেকে নেতৃত্বদানের দায়িত্ব নিয়েই সে গ্রামে প্রবেশ করে এবং শোষণকারী সম্পত্তিওয়ালাদের বের করে'শ্রেণিশত্রু' বাছাই শুরু করে। অতঃপর করে হত্যা। এরই ধারাবাহিকতায় আব্দুল ওয়াহিদের নেতৃত্বে শত্রু নিধনের মিশনে গিয়ে শত্রুর স্ত্রীর চোখে কিছু চিহ্নের মাধ্যমে নিজের উপস্থিতির প্রমাণ রেখে আসে আব্দুল ওয়াহিদ। এবং এই ঘটনার ১৭ বছর পর আবার যখন সে ফিরে আসে নিজের গ্রামে বিস্মৃত অতীতের মতো, তখন এক বছরের মধ্যে সে প্রতিশোধের শিকার হয়ে নিজের প্রাণ হারায়।

গল্পের উল্লিখিত আব্দুল ওয়াহিদের রাজনৈতিক জীবনের আখ্যান বর্ণনাই শুধু শহীদুল জহিরের লক্ষ্য ছিলো না, এর বাইরেও তিনি রেখেছেন আরেকটি গল্প। সেটি ব্যক্তি আব্দুল ওয়াহিদের। সেই ওয়াহিদ রাজনীতির ব্যক্তিত্ব নয়, সে এক মায়াকাড়া যুবক, যে উচ্চ শিক্ষার্থে ঢাকায় যাবার আগে নিজের চাচাতো বোন নূরজাহানের মনের গভীরে মায়া বা প্রেমের সৃষ্টি করে। তবে গল্পটা শেষপর্যন্ত প্রেমেরও নয়, প্রতিহিংসারও নয়– পরাজয়ের। সমাজপরিবর্তনের ও সর্বহারা মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া বিপ্লবী সৈনিক আব্দুল ওয়াহিদের সার্বিক পরাজয়ের আখ্যান এই 'ধুলোর দিনে ফেরা' গল্পটি।

পরস্পর দুটি স্রোতের মিলনে নির্মিত এই গল্পের একটি স্রোতে দেখা যায়, বালিকা নূরজাহানের মনে আব্দুল ওয়াহিদের প্রতি গড়ে ওঠা বিশ্বাস ও নির্ভরতা যখন প্রেমাকাঙ্ক্ষা উদ্রেক ঘটায়, তখন আব্দুল ওয়াহিদের উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে ঢাকায় যাবার সময় সমাগত, এই পরিস্থিতিতে বালিকা তার কাছে কথাবলা ময়না পাখির আব্দার জানায়। কিন্তু ময়না পাখি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং সময়ের স্বল্পতা থাকায় বালিকাকে প্রবোধ দেবার জন্য আব্দুল ওয়াহিদ শালিক পাখির ছানা দিয়ে যায়। এই শালিক পাখিকে ময়নার ছানা ভেবে বালিকা অধ্যাবসায় শুরু করে এবং পড়ালেখায় ব্যর্থতা প্রদর্শন করে কিশোরী হয়ে ওঠে। অতঃপর আব্দুল ওয়াহিদের সঙ্গী আবুল হোসেন গ্রামে ফিরে আসলেও আব্দুল ওয়াহিদ রয়ে যায় নিজের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। এমতাবস্থায় আবুল হোসেন বিয়ে করে নূরজাহানকে। গল্পের এই খণ্ডে আব্দুল ওয়াহিদের প্রতি নূরজাহানের প্রেমানুভূতি প্রকাশ পায় ময়না পাখি চাওয়ায়, তার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতায় এবং শালিকের ছানা জানা সত্ত্বেও বালিকা থেকে কিশোরী পর্যন্ত সেই ভুল পাখিকে কথা শেখানোর অধ্যবসায়ের মধ্যে। লেখক তাঁর বর্ণনার ভাষায় বলেন, "সে একটি ব্যাখ্যাতীত ঘোরের ভেতর দীর্ঘদিন আটকা পড়ে থাকে।"[৪৩] হয়তো সেই ঘোর প্রেম-ই ছিলো কিন্তু তার কাছে তা স্পষ্ট ছিলো না বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত; কিন্তু বাসররাতে সেই পাখির কথা স্মরণ হলে এবং

পরদিন সকালে সেই পাখিকে মৃতাবস্থায় পেলে তার যে অনুভূতি হয়, সেটি নিঃসন্দেহে প্রেমময়। এবং তা থাকে বলেই তার মনে সেই পাখিটিকে না বাঁচাতে পারার বেদনা ভর করে থাকে। সেই অক্ষয় বেদনা থেকেই সতেরো বছর পরে আব্দুল ওয়াহিদের সাথে প্রথম দেখায় সে সুস্পষ্টভাবে জানতে চায়: "ম্যাবাই ময়নার ছাও কয়া আমাক শালিক দিছিলেন ক্যা?"[৪৪] যেন সে যেমনটা চেয়েছিলো তেমনটা পায়নি, অথচ তার প্রত্যাশা ছিলো ব্যাপক। ফলে, পরবর্তীকালে আব্দুল ওয়াহিদ যখন দুটি ময়না পাখির বাচ্চা এনে পালন করতে থাকে এবং আততায়ীর আক্রমণে মারা যায় তখন সেই শোকাবহ পরিস্থিতিতে সে সবার আগে সেই পাখিগুলোর সন্ধান করে এবং যত্ন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। পাখিগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে আব্দুল ওয়াহিদের স্মৃতি রক্ষার চেয়ে প্রবল থাকে ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষা। সাংসারিক জীবনে নূরজাহান কীভাবে বেঁচে আছে তা যখন কাউকে বলতে পারে না সে, তখন সেই কথাবলা ময়নাগুলোই যেন সে আলাপের সূচনা করে। পাখি দুটির মধ্যে যেন বেঁচে থাকে একজন প্রেমিক আব্দুল ওয়াহিদ এবং একজন নূরজাহান। ফলে পাখিদের মুখে যেন তাদেরই অন্তরালাপ ফুটে ওঠে, আব্দুল ওয়াহিদের মৃত্যুর পর একদিন একটি পাখি অপর পাখিকে যখন জিজ্ঞেস করে "কান্দেন ক্যা?" তখন অন্য পাখি উত্তর দেয় "সুখ নাই জীবনে।"[৪৫]

গল্পের অন্য স্রোতটি পুরোপুরি আব্দুল ওয়াহিদের নকশাল হয়ে সর্বহারাদের পক্ষে বিপ্লবাত্মক কর্মসূচি গ্রহণ, শ্রেণিশত্রু খতম এবং এই আন্দেলনের ব্যর্থতা-পরবর্তী গ্রামে ফিরে আসা ও যুগপৎভাবে মানবীর প্রতি এবং স্বপ্নলালিত প্রেমকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। আবুল হোসেনের গ্রামে প্রত্যাবর্তনের পর জানা যায় আব্দুল ওয়াহিদ তার পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। তারপর তার আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু কিছুদিন পর সুহাসিনী ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নকশালদের উপস্থিতি এবং সুহাসিনীর রশিদ প্রামাণিকের পাগল হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তাদের অত্যাচারের তীব্রতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং যখন ব্যাঙনাই গ্রামের পিতাপুত্র ইয়াসিন বিশ্বাস-জমিরউদ্দিন খুন হয় এবং তাদের লাশের সঙ্গে পাওয়া যায় 'শ্রেণীশত্রু খতম করা চলবে'– এই ঘোষণা সংবলিত কাগজ, তখন ইয়াসিন বিশ্বাসের স্ত্রী প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে রটনা করে দেয় যে, সেই দলের প্রধান ছিলো সুহাসিনীর আব্দুল করিম মিয়ার মেজ ছেলে আব্দুল ওয়াহিদ। এই চিনে রাখা এবং পরবর্তীকালে সুযোগের অপেক্ষায় থাকা গোষ্ঠীর কারণেই ফিরে আসা মাত্রই এক বছরের মধ্যে আব্দুল ওয়াহিদ নিজের ফসলভরা জমির মধ্যে খুনের শিকার হয়। আততায়ীরা তার লাশের সঙ্গে কাগজে লিখে রেখে যায় 'প্রতিশোধ নিয়ে গেলাম'। একুশ বছর পর গ্রামে ফিরে আসা এবং মৃত্যু-পূর্ব এক বছরকালের মধ্যে আব্দুল ওয়াহিদ প্রধানত তিনটি কাজ করে: ক) নিজেকে নতুন করে গুছিয়ে নেয়, কৃষিকাজে নিজেকে নিয়োজিত করে। খ) নূরজাহানের সাথে

তার প্রতারণা এবং তার প্রতি নূরজাহানের প্রেমভাব বুঝতে পেরে তাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের পদক্ষেপ নেয়। গ) পরাজিত সৈনিকের মনে ভর করা স্বপ্নের মতো সেই চেতনাকে প্রতীকীভাবে প্রকাশের চেষ্টা চালায়।

উল্লিখিত তিনটি কাজের বর্ণনাই শহীদুল জহির এই গল্পে গুরুত্বের সঙ্গেউপস্থাপন করেছেন। গল্পের শুরুতেই তিনি এক ধরনের ম্রিয়মান আলোয় আব্দুল ওয়াহিদকে গ্রামে প্রবেশ করিয়েছেন, অনেকটা ভুলে যাওয়া অতীতকে কষ্ট করে মনে করার মতো চেষ্টাকীর্ণ ভাষায় তাকে গল্পে আবির্ভূত করেছেন এবং বারংবার তার আসন্ন মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পাঠকদের। তবে মৃত্যুর দৃশ্যটি খুব মহীয়ান করে দেখাননি তিনি কোনোভাবেই। যেন পূর্বকৃত কোনো পাপের নির্ধারিত সাজাতেই তার মৃত্যু হয়েছে– যা ছিলো সকলের প্রত্যাশিত। গল্পের মধ্যিখানেই আব্দুল ওয়াহিদের মৃত্যু হয়েছে, তারপরও গল্পের রেশ ছিলো দীর্ঘসময়। আদি-মধ্য-অন্তের সমন্বয়ে তিনি উলটপালট এনে শেষ থেকেই শুরু করেছেন, যখন সে প্রবেশ করলো গ্রামে। একুশ বছর পূর্বে গ্রাম থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া আব্দুল ওয়াহিদের একুশ বছর পূর্বের কাহিনিও গল্পে স্থান পেয়েছে, গল্পকার বর্ণনা করেছেন তার অনুপস্থিতিকালের ঘটনামালাও। তবে সেগুলো ফ্লাশব্যাক-বর্ণনাসূত্রে। গ্রামে ফিরে আসা থেকে মৃত্যু-পূর্ববর্তী যে মধ্যবর্তীকাল আব্দুল ওয়াহিদ জীবিত ছিলো, তন্মধ্যে তার নেয়া উদ্যোগসমূহেই মূলত গল্পের প্রাণরসের উপস্থিতি । গল্পের প্রথমার্ধ শেষ হবার আগেই আব্দুল ওয়াহিদ নিজের ফসলভরা ক্ষেতে আততায়ীর হাতে নিহত হয়, সঙ্গে তার ভাই ও অন্যান্য কাছের লোকজন থাকলেও কেউ প্রতিরোধ না করে পালায়, একাকী মারা পড়ে ওয়াহিদ। আততায়ীদের 'প্রতিশোধ নিয়ে গেলাম' লেখা চিরকুট, এবং তার লাশ দেখে বন্ধু আবুল হোসেনের কান্না দেখে গ্রামের লোকেদের যখন প্রসঙ্গক্রমে নূরজাহানের কথা মনে পড়ে গল্পকার তখন শুরু করেন গল্পের দ্বিতীয় কিন্তু প্রধান স্রোতের বর্ণনা।

এই পর্বে গল্পকার সেই মৃত্যু-পূর্ব আব্দুল ওয়াহিদের একবছরের জীবন বর্ণনা করেন। আবুল হোসেনের সাথে প্রথম সাক্ষাতেই আবুল তাকে জানায় যে সে নূরজাহানকে বিয়ে করেছে এবং সে ওয়াহিদকে নিয়ে নিজের বাড়িতে যায়। সেখানে নূরজাহানের সাথে দেখা হলে নূরজাহান প্রথমেই তাকে ঠকিয়ে যাবার ব্যাপারটা তোলে। বালিকা নূরজাহান এখন 'শ্যামল ও সুশ্রী ভরা নদীর মতো', ফলে সেই প্রসঙ্গে আব্দুল ওয়াহিদের লজ্জা হয়। অতঃপর "এই সময়... সে সিরাজগঞ্জ থেকে একটা গোলাপ ফুলগাছ এনে লাগায় এবং একজোড়া কালো ময়না কিনে এনে কথা শেখায়।"[৪৬]এই ফুলগাছ

ও ময়না পাখি কেনার মধ্যে গল্পের মূল চরিত্র আব্দুল ওয়াহিদ নিজের জীবনটাকে সাজিয়ে তোলার স্বপ্ন গড়ে তোলে।

গ্রামের লোকদের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে লেখক একটি সরল বৃত্তকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে জটিল করে সাজিয়েছেন এবং তাতে গল্পে গড়ে উঠেছে এমন একটি আড্ডার ঢং যেখানে যে যেখান থেকে পারছে গল্পটাকে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পূর্ণ করে তুলছে। ফলে জানা যায় প্রথমদিনই নূরজাহান তাকে ঠকানোর প্রসঙ্গের সাথে আরও একটি প্রশ্ন রাখে, সেটি হলো কী লাভ হলো? অর্থাৎ এই যে আব্দুল ওয়াহিদের জীবনের প্রচলিত ধারা থেকে বের হয়ে বিপ্লবের স্বপ্নে জীবন যাপন, যা তাদের দুজনকে পৃথক করে তুললো কিন্তু শেষপর্যন্ত এলো না কোনো সাফল্য, সেই জীবন যাপন করে তবে কী লাভ হলো। এহেন জিজ্ঞাসা আব্দুল ওয়াহিদকে পুনরায় জীবন সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলে এবং তারও কিছুদিন পর সে যখন নূরজাহানকে বলে যে সে কাজটি অর্থাৎ আবুল হোসেনকে বিয়ে করে কাজটি ভালো করেনি, তখনও জীবন সম্পর্কে তার ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় যে, সে ফিরতে চায় এই জীবনের ধারায়। কিন্তু যেদিন সে নূরজাহানকে কাঁদতে দেখে কুয়ার পারে তখন সে বুঝতে পারে আদতে লাভবান হয়নি কেউ। না নূরজাহান, না আবুল হোসেন না সে নিজে। এমতাবস্থায় অন্তত ময়না পাখির শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে কিংবা সেই ময়না পাখির মধ্যে নিজেদের অতীত ফিরিয়ে আনার কল্পনায় সে ময়না পাখি কিনে আনে। এবং পুনর্বার ভালোবাসা জাগানোর মন্ত্রে বন্য গোলাপের চারায় ফুল ফোটানোর অধ্যবসায় শুরু করে। তার প্রত্যেকটি প্রচেষ্টায় একধরণের জীবনমুখিতার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গল্পকার গল্পের এই পর্যায়ে দুইটি ময়না পাখি ও গোলাপগাছের প্রসঙ্গ এনে গল্পের হারিয়ে যাওয়া কাহিনিতে বাঙ্ময়তা দান করেছেন। দুটি ময়নাকে যখন এক খাঁচা থেকে পৃথক করে রাখা হয় তার মধ্যে যেন নূরজাহান ও আব্দুল ওয়াহিদের পৃথক হয়ে যাবার কাহিনিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জীবিতাবস্থায় নূরজাহানকে কান্নারত অবস্থায় দেখে আব্দুল ওয়াহিদ জিজ্ঞেস করতে পারে না যে, সে কেন কাঁদে। সেই দায় যেন পোষা ময়না পাখি তার মৃত্যুর পর মিটিয়ে ফেলে। এবং যে অন্তর্যাতনা থাকা সত্ত্বেও নূরজাহান কখনও বলতে পারেনি মুখ ফুটে, দ্বিতীয় ময়না যেন সেই উত্তরটাই দিয়ে তাদের ভেতরের দুঃখমিশ্রিত কথাগুলো প্রকাশ করে দেয় পাঠকের কাছে। অন্যদিকে বিপ্লবের কড়া লাল রঙের শপথে বলীয়ান হয়ে যৌবনের পুরোটাই আব্দুল ওয়াহিদ ব্যয় করেছিল যে স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে, সেটি বাস্তব হয়নি শেষপর্যন্ত, পরাজয় মেনে তাকে ফিরতে হয়েছিলো সরল জীবনের কাছে। সিরাজগঞ্জ থেকে কেনা সেই গোলাপগাছের মধ্যে আব্দুল ওয়াহিদ আমৃত্যু সন্ধান

করে সেই হারিয়ে ফেলা স্বপ্নের পুনর্জাগরণ। বিরল সেই জাতের গোলাপগাছ, যা কি না ফুল দেয়নি গত আশি বছরেও, যার সাথে মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো স্ত্রী-বিয়োগকাতর আমিনুদ্দিন নামের এক পুষ্পপ্রেমিকের, সেই স্মৃতিবিস্মৃত গোলাপের গাছে নিজের ভালোবাসা স্থাপন করেছিলো আব্দুল ওয়াহিদ। আমিনুদ্দিনের মতো তারও ভালোবাসা জগৎ থেকে দুটি বিষয় বিযুক্ত হয়োছিলো: ১. নূরজাহান ২. নকশাল আন্দোলন। দু জায়গাতেই সে পরাজিত। তার স্বপ্ন ছিলো পুষ্পবৃক্ষের সাথে ভালোবাসার অনভূতির চাষ করে ফুটিয়ে তোলা পরাজিত বিপ্লবের মতো টকটকে লাল রঙের সফলতাফুল। কিন্তু সফলতা পাবার আগে চিরকাল পরাজিত আব্দুল ওয়াহিদ আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে আবার পরাজিত হয়। গল্পকারের ভাষায় "কিন্তু ফুল ফোটা, পাখির কথা বলা এবং পাকা ফসল ঘরে তোলার পূর্বেই সে তার আগের অবস্থায় ফিরে যায় এবং গ্রামের লোকদের বিভ্রান্তি হয়, তারা বলে যে, সে মরার জন্যই গ্রামে ফিরে এসেছিল।"[৪৭]

চতুর্থ মাত্রা

'চতুর্থ মাত্রা' গল্পটি শহীদুল জহিরের সমস্ত গল্প থেকে স্বতন্ত্র। এর বিষয়গুণ ও আঙ্গিক স্বাতন্ত্র্য – দুদিক থেকেই গল্পটি বিশিষ্ট। সংলাপের ব্যবহার, দৃশ্যকল্পের বর্ণনা, চরিত্রগুলোর নাট্যিক উপস্থিতি গল্পটির রূপকল্পে যেমন একাঙ্কিকার আস্বাদ এনেছে, তেমনি এর কেন্দ্রীয় চরিত্রের পুনরাবৃত্তিমূলক আচার এর স্বাভাবিক গতিব্যঞ্জনা ব্যাহত করে নিঃসাড় নাগরিক জীবনের চরম একাকিত্বকে তুলে ধরেছে। নাট্যগুণ থাকা সত্ত্বেও এটি হয়ে উঠেছে এক অবসাদক্লিষ্ট নাগরিক মানুষের জীবনযাপনের প্রাত্যহিক চিত্রসমন্বিত গল্প। এই গল্পে শহীদুল জহির দেখিয়েছেন আব্দুল করিম নামক এক মধ্যবয়সী একাকী পুরুষের একঘেয়ে জীবনের নিঃসঙ্গতা। নগরের মধ্যে থেকেও নগরজীবনের ব্যস্ততা থেকে নির্বাসিত এক সঙ্গলিপ্সু একাকী মানুষ আব্দুল করিমের প্রাত্যহিক জীবনের দৃশ্যসমূহ, সেইসব দৃশ্যে তার একান্ত কামনার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি এবং বাসনা চরিতার্থ করার প্রাণপণ চেষ্টাসমূহকে মূল করেই গল্পকার দৃশ্যযোজনা করেছেন। চলচ্চিত্রের বা নাটকের পাণ্ডুলিপির মতো করে সংলাপকে প্রাধান্য দিয়ে অনধিক দশটি চরিত্রকে সম্পৃক্ত করে শহীদুল জহির আব্দুল করিমের একাকিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন[৪৮]; শুধু বাহ্যিক ঘটনামালা দিয়ে নয়, চরিত্রটির সার্বিকদিকের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে লেখক তার মনোলৌকিক অধ্যাসসমূহও সমান গুরুত্বের সঙ্গে গল্পভুক্ত করেছেন। বস্তুত, আব্দুল করিমের একাকিত্ব কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে এ-গল্প।

'জীবন ও জগতের সাথে সম্পর্কহীন, বিচ্ছিন্ন, বিযুক্ত'[৪৯] আব্দুল করিম 'চতুর্থ মাত্রা' গল্পে নিজেকে নিজের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-ঘনত্বের বাইরে যে অস্তিত্ব, যে অস্তিত্ব থাকে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে, সেই সম্পর্কের মধ্যে খুঁজে বেড়ায়। এই অন্বেষণের মধ্যেই সে নিজেকে যুক্ত করতে চায় সমাজের জীবনস্রোতের সঙ্গে। তার একাকী সংসারে সে সম্পৃক্ত করে কাজের বুয়াকে, কাগজ ক্রেতা-বিক্রেতা পরিচয়ের ফেরিওলাকে এবং আরেকজন ফেরিওলাকে যে কিনা তার মহল্লার ছেলেদের কাছে বিক্রি করে মিষ্টান্ন বা কটকটি। এই সবগুলো মানুষ তার কাছে কাম্য, কেননা সে একাকী। এই নিঃসঙ্গতাকে ভুলে থাকতে কিংবা নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে, কেননা সামাজিক অস্তিত্ব বলে একটি অস্তিত্ব আছে যা জনসম্পৃক্ততায় গড়ে ওঠে, সেটি তার নেই। নিজের দৈহিক অস্তিত্বের বাইরে ওই অস্তিত্বটিকেই খুঁজে ফেরে আব্দুল করিম পুরোটা গল্প জুড়ে। সময় চিরকাল বহমান। এই গল্পে শহীদুল জহির একটি স্থির সময়ের ভেতর বসবাস করা এক ব্যক্তি হিসেবে, কেননা যার ব্যস্ততা নেই তার সময়ের গতিশীলতার সঙ্গে স্পৃষ্টতা নেই, আব্দুল করিমকে তার দৈনন্দিন বৈচিত্র্যহীন জীবনে অঙ্কন করতে চেয়েছেন। প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়ে ঘটনাবৃত্তে আটকে পড়া এই চরিত্রটি নিজের অস্তিত্ব তাই তুলে ধরতে চায় বুয়ার কাছে, বারংবার বুয়াকে সে ডাকে, নিজের রক্ত-মাংসের অস্তিত্বের জানান দেয়, যদিও বুয়ার কাছে একদিনের ব্যতিক্রম ব্যতীত সেই অস্থিমাঁস অস্তিত্ব ধরা পড়ে না বা প্রধান হয়ে ওঠে না কোনোসময়। প্রথম দিকে কাগজের ফেরিওলার কাছে নিত্য দরকষাকষি করে অল্প পরিমাণ পত্রিকা বিক্রি করে নিজের বিক্রেতা সত্তা প্রমাণ করতে চাইলেও যোগান অল্প থাকায় একদিন নিজেই সেই ফেরিওলার কাছে ক্রেতা হয়ে ধরা দেয়। এই পর্যায়ে এসে সে ফেরিওলার সমান্তরাল হয়ে যায়, নগরজীবনে যে অস্তিত্বের সামাজিক মূল্য খুবই নগণ্য। একই বৃত্তে সে নগণ্য থেকে যায় কটকটিওলার কাছেও, যখন সে তার কাছেও ভাঙা কাচ কিনতে চায়। একেবারে নিস্তরঙ্গ জীবনে সে তরঙ্গ আনে মহল্লার শিশু-কিশোরদের মাঝে। যারা প্রতিদিন তার বাসার বাইরের বারান্দা থেকে ভাঙা কাচের গ্লাস সংগ্রহ করে কটকটি কিনে খায় এবং ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে; উপরন্তু অভিভাবকদেরকে এই ঘটনায় উত্তরোত্তর সম্পৃক্ত করে। কিন্তু মহল্লার অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের কলহের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে আব্দুল করিমের অপর্যাপ্ত জোগানকে :

প্রথম ব্যক্তি: আপনে দেখছেন কি অইচে?

আ. ক. : কি হইছে?

প্রথম ব্যক্তি: বুজা পারেন না, কি অইচে?

আ. ক. : বুঝতে পারতাছি না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি: আপনে আবার গেলাস ভাঙ্গছেন ক্যালা?

আ. ক. : গেলাস ভাঙলে আমি কি করব !

দ্বিতীয় ব্যক্তি: ক্যালা ভাঙ্গবেন!

আ. ক. : গেলাস মানুষের ভাঙে না?

প্রথম ব্যক্তি: ভাঙ্গা কাচের গেলাস আপনে দরজার বাইরে রাখেন ক্যালা?

আ. ক. : কি করব, ভাঙা কাচ কোথায় ফালাব।

প্রথম ব্যক্তি: ক্যালা রাখবেন। একখান কইরা ভাঙ্গা গেলাস ক্যালা রাখেন?

আ. ক. : দুইখান তো রাখছি !

দ্বিতীয় ব্যক্তি: দুইখান ক্যালা রাখবেন ! দুইখান ভাঙ্গা গেলাসে এই ইট্টুখানি কটকটি পাওয়া যায়, আর পোলাপানগুলা মারামারি কইরা মরে।

আ. ক. : আমি তার কি করব!

দ্বিতীয় ব্যক্তি: দুইটা ভাঙ্গা গেলাস এইখানে রাইখেন না আপনে। তিনটা ভাঙ্গলে রাইখেন।[৫০]

যদি সে গ্লাস না ভাঙতো কিংবা বেশি পরিমাণ গ্লাস ভেঙে রাখতো তাহলে সন্তানদের চাহিদা মিটতো এবং কলহের উৎপত্তি ঘটতো না। কার্যত তারা আব্দুল করিমকে সন্তানদের প্রাত্যহিক চাহিদা মেটানোর উপায় ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু মনে করে না। ফলে এখানেও আব্দুল করিম ধর্তব্যের মধ্যে আসতে পারে না।

এই যে গণনার বাইরে থেকে যাওয়া আব্দুল করিমের ইতিবৃত্ত, তার প্রতিফলন ঘটে তার মনোলৌকিক ভাবনাবৃত্তে এবং স্বপ্নবৃত্তান্তেও। ফলত, স্বপ্নেও তার নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব প্রকাশের সুযোগ ঘটে না। আগন্তুক লোকের কাছে সে খোলা দৃষ্টিতে নদী দেখার, ধানের ক্ষেত কিংবা শূন্য মাঠ দেখার অধিকার হারায়। নিজের স্বপ্নের ভেতরও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না তার ত্রিমাত্রিক অস্তিত্ব। ত্রিমাত্রার পরে যে চতুর্থ মাত্রা, কার্যত যে মাত্রাটি অন্য তিন মাত্রাকে প্রতিষ্ঠিত করে সুসংহতভাবে, সেই চতুর্থ মাত্রাটি অর্জন করতে ব্যর্থ হয়ে কালের গতিশীলতার সঙ্গে চলতে না পেরে নিজের অনস্তিত্বের মধ্যেই আব্দুল করিম নিজের চতুর্থ মাত্রা প্রতিষ্ঠা করে; সার্থকভাবে কোথাও না থেকেও যে থাকা মানুষকে নিজের বেঁচে থাকাকে অনুভূত করায়, শহীদুল জহির সেটিকেই ‘চতুর্থ মাত্রা’ বলে প্রতিষ্ঠা করেছেন এই গল্পে।

ডলু নদীর হাওয়া ও অনান্য গল্প

'ডলু নদীর হাওয়া ও অনান্য গল্প' শহীদুল জহিরের সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ। বইটিতে যে সাতটি গল্প রয়েছে তন্মধ্যে 'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস'-গল্পটি পুনর্মুদ্রিত: বাকি ছয়টি গল্পই একবারে নতুন। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরাবর্তনের পাশাপাশি বিশ্ব-রাজনীতির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের কু-রূপ পর্যন্ত তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। জীবনের নানাবিধ সংকট-ঘেরা চিত্র-সমন্বয়ে গ্রাম আর নগরের ক্লিষ্ট ছবি তিনি অঙ্কন করেছেন এই গ্রন্থের গল্পসমূহে। ভাষাকাঠামোর প্রমিত রজ্জু ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার যে প্রয়াস তাঁর ক্রমশ দৃশ্যমান হচ্ছিলো দ্বিতীয় পর্বের শুরু থেকে, এ-গ্রন্থের গল্পসমূহে তা আরও নির্দিষ্ট মুক্তির দিকে যাত্রা করেছে। কৌমজীবনের মুখের ভাষা কাহিনি বর্ণনার বাক্যকাঠামোতে অনর্গল প্রবিষ্ট হয়েছে। মানুষের মুখের ভাষা-সংলাপ চরিত্রগুলোকে গল্পেযতোটা জীবন্ত করে তোলে, সাধারণ প্রমিতের মার্জিত ভাষাকাঠামোতে তা ব্যাহত হয়। লেখক ভাষার দূরত্বটুকু দূর করতে গিয়ে গল্প বলার এক লোকভঙ্গিকে উপস্থিত করতে চেয়েছেন, তাতে গল্পের গায়ে এসেছে এক লৌকিক আস্বাদ।

কোথায় পাব তারে

শহীদুল জহিরের সর্বাধিক আলোচিত গল্প 'কোথায় পাব তারে'। গল্পটি এই গ্রন্থের প্রথম গল্প। বাউল গানের কথায় গল্পেরশিরোনাম নির্দেশ করে লেখক গল্পের মূল নির্যাসের প্রতি একটি ইঙ্গিত করেছেন; যা গল্পপাঠের পর পাঠকচিত্তে মূর্ত হয়ে ওঠে। জন্মপরবর্তী মানুষের সমগ্রজীবনের কাঙ্ক্ষিত-লক্ষ্যকে বাউলগণ প্রিয়ার বা ঈশ্বরের রূপকে কল্পনা করেছেন, যাকে পাওয়ার আকুলতা মানুষকে অন্যসব কিছু থেকে বিমুক্ত রাখে– কিন্তু শেষাবধি তাকে পাওয়া হয় না। সেই অপূর্ণ সাধের পূর্ণতার লক্ষ্যেই মানুষের দার্শনিক জীবন পরিচালিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যাকে রূপান্তরিত করেছিলেন পরশপাথর কিংবা জীবনদেবতার রূপকে – বাংলা বাউলদর্শনের সেই জিজ্ঞাসা বা অন্বেষণকে অধুনাকালের শিল্পী শহীদুল জহির নতুন মাত্রায় স্থানান্তরিত করেছেন শহুরে লোকালয়ে।

যেখানে ব্যস্ত নাগরিক জীবনের অংশ হয়েও বেকার যুবক অথবা তাকে বলা যায় উদাসীন – ভিন্ন ব্যাখ্যায় সংসার বিমুখ বাউলও বলা যায় হয়তো- যে নিমগ্ন থাকে নিজের মধ্যে। নিজের বৈষয়িক ব্যাপারে বা পিতার ব্যবসায় যার মনোযোগ নেই পুরান ঢাকার অর্ধশিক্ষিত জনমানুষের কাছে যার আচরণ ভিন্নমাত্রায় প্রকাশিত- সেই যুবক আবদুল করিমের অন্বেষণ- কল্পনার সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটলে

মূর্ত হয়ে ওঠে সেই চিরকালীন কাঙ্ক্ষা ও না পাওয়ার সত্যরূপ। ফলত রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র পুরান ঢাকার মধ্যে নাগরিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও বেজে ওঠে বাউল সুর। সেই ব্যঞ্জনাদনের সফলতার মধ্যেই গল্পটির নিহিততাৎপর্যের বিশেষত্ব এবং গল্পকারের সাফল্য।

এগল্পে সংসারবিবাগী বাউল-স্বভাবী যুবক আবদুল করিমকে এবং তার 'মনের মানুষে'র কাঙ্ক্ষিত কায়ার রূপক হিসেবে অদেখা শেফালি বেগমকে প্রতিস্থাপন করা যায়। এবং যে ঠিকানা শেফালি আবদুল করিমকে দেয় – যার হদিস পাওয়াটা একেবারেই অসম্ভব – তাকে বাউল দর্শনের আরশিনগরের সঙ্গে তুলনা করা যায়:

একটা সাদা কাগজে প্রথমে ঠিকানা লেখা ছিল:
মোছা: শেপালি বেগম
ফুলবাইড়া
মৈমনসিং
এরপর ছিল পথের নির্দেশ:
ঢাকা মহাখালি বাস স্ট্যান
মৈমন সিং শহর, গাঙ্গিনার পাড়
গাঙ্গিনার পাড় – আকুয়া হয়া ফুলবাইড়া বাজার, থানার সামনে
উল্টা দিকে হাঁটলে বড় এড়াইচ গাছের (কড়ই গাছ) সামনে টিএনউ অপিস
টিএনউ অপিস সামনে রাইখা খাড়াইলে, বাম দিকের রাস্তা – নাক বরাবর
হাই স্কুল ছাড়ায়া বরাবর সুজা, ধান ক্ষেত, কাঁটা গাছ, লাল মাটি,
বামে মোচড় খায়া নদী
আহাইলা/আখাইলা/আখালিয়া নদী
নদী পার হয়া ব্রিজ পিছন দিয়া খাড়াইলে,
দুপুর বেলা যেদিকে ছেওয়া পড়ে তার উল্টা দিকে,
ছেওয়া না থাকলে, যেদিকে হাঁটলে পায়ের তলায় আরাম লাগে সেই দিকে
ইদীর পাড় বরাবর এক মাইল হাঁটলে দুইটা নাইরকল গাছ
দুই নাইরকল গাছের মইদ্দে খাড়ায়া গ্রামের দিকে তাকাইলে
তিনটা টিনের ঘর দেখা যাইব
তিনটা ঘরের একদম বাম দিকের ঘরের পাশ দিয়া যে রাস্তা গেছে
সেই রাস্তা ধইরা
আগাইলে চাইর দিকে ধানক্ষেত, পায়ে হাঁটা আইলের রাস্তা

দূরে চাইর দিকে আরো গ্রাম
ক্ষেতে পাকা ধান যেদিকে কাইত হয়া আছে, সেই দিকে,
অথবা, যুদি ধানের দিন না হয়,
যেদিকে বাতাস বয় সেই দিকে গেলে পাঁচটা বাড়ির ভিটা দেখা যাইব,
তিনটা ভিটা সামনে দুইটা পিছনে,
পিছনের দুইটা বাড়ির ডালিম গাছওয়ালা বাড়ি।[৫১]

অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক এই ঠিকানা কোনোভাবেই একটি নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দিতে পারে না। ফলত, কাঙ্ক্ষিত শেপালি বেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না আবদুল করিমের। চিরায়ত বাউলদর্শনের এই কাঠামোতে গল্পটি পাঠ করতে গেলে যে আখ্যান পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় – সংসারবিবাগী বাউল আবদুল করিম তার চিরন্তন অন্বেষণ – মনের মানুষ – শেফালি বেগমের হয়তো আকস্মিক সাক্ষাৎ পায়ও; কিন্তু তখন তার মনের অনুরণনে তা পরিস্ফুট হয় না যে, শেফালিই তার মনের মানুষ। যখন সে জীবনের একপর্যায়ে অনুধাবন করে যে, শেফালি বেগম তার মনের মানুষ এবং তার কাছেই তার যাওয়া উচিত তখন সে তার রেখে যাওয়া ঠিকানা ধরে শেফালির কাছে পৌঁছতে চায়। কিন্তু বাউল-সাধনপদ্ধতির জটিলতার মতোই জটিল তার পথের বিবরণ। সেই বিবরণ ধরে যদিও বা কিছুদূর যাওয়া যায় কিন্তু শেষপর্যন্ত পৌঁছানোর ধৈর্য বা ক্ষমতা সে রাখে না বা রাখতে ব্যর্থ হয়। ফলত কাঙ্ক্ষিত পড়শির দর্শন পাওয়া যায় না; এবং সেই না পাওয়া থেকেই বেদনাপুঞ্জিত হয় হৃদয়ে, সেখান থেকেই বেজে ওঠে গান – কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।

আমাদের বকুল

'আমাদের বকুল' শহীদুল জাহিরের কাছে নিতান্তই একজন বকুলের গল্প নয়। এই বকুল এককভাবে কারো কন্যা, কারো পত্নীর পরিচয়ের ডিঙ্গি পেরিয়ে যখন 'আমাদের' হয়ে যায়, তখন এর বিশেষত্ব সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে শহীদুল জহির সমষ্টির সঙ্গেযুক্ত করে গল্প রচনা করেন, তখন কোনো ব্যক্তিগত বিষয় আর নিতান্ত নির্দিষ্ট পারিবারিক আবহে আবদ্ধ থাকে না – প্রযুক্ত হয় সমষ্টির সঙ্গে। ফলে আমাদের বকুল আমাদের সবার। গল্পের আকালু যেমন বকুলের সঙ্গে যুক্ত, তেমনি আকালু মুক্ত মাঠের কর্মী-মানুষদের সঙ্গে; মাঠের মানুষগুলো আবার যুক্ত তাদের পরিবারের সঙ্গে: ফলত আরোহী-

অবরোহী যুক্তিজ্ঞানে এই সমস্ত জনতার সঙ্গে বকুলের নাড়ি সংযুক্ত। কার্যত সে শুধু আকালুর কন্যা বকুল নয় – আমাদের কন্যা-ভগিনীতুল্য বকুল।

এই গল্পে আমাদের বকুলকে 'আমাদের' ভাবতে গিয়ে দুটি বিষয় পরিচ্ছন্নভাবে ফুটে ওঠে:

১। বকুলকে ভালোবেসে হারানোর চিরন্তন বেদনা।

২। 'আমাদের' শব্দটির সমাজস্তরিক চেতনা।

গল্পে শহীদুল জহির কৃষক আকালু ও ফাতেমার ঘরে যে কন্যা বকুলকে গড়ে তুলেছেন শিল্পীর মতো করে; বাল্যকাল থেকে বেড়ে উঠতে উঠতে সে হয়ে যায় আমাদেরই (পাঠকদের) কন্যাস্বরূপ। মা-হারা সন্তানদ্বয় রূপকথার ছলে যখন বেড়ে ওঠে, তখন তাদের পিতা হিসেবে, সঙ্গী হিসেবে, দুঃখের ভাগীদার হিসেবে পাঠকের চিত্ত-অনুগামী হয় ; কিন্তু গল্পের শেষে যখন বিষ পিপঁড়ার দল খেয়ে যায় বকুলকে তখন আমাদের কন্যার জন্য, আমাদের সঙ্গীর জন্য বেদনার উদ্রিক্ত হয় হৃদয়ে। ব্যক্তি বকুল হাহাকার জাগায় আমাদের বকুল হয়ে।

লেখক শহীদুল জহির একটি কৃষিভিত্তিক আধাসামন্তীয় সমাজকাঠামোর ভূমিস্পর্শী মানুষের আখ্যান রচনা করেছেন এগল্পে। যেখানে বারংবার বিষপিঁপড়ারা রূপক হয়ে রক্ত-মাংসলিপ্সু শোষকের দল শোষণ করে যায় প্রকৃতিলগ্ন উৎপাদন-সম্পৃক্ত মানুষদের; অতি-সরল আকালুদের পারিবারিক-মানসিক স্বস্তি নিয়ে যারা আনন্দ লুটে নেয় অপেক্ষাকৃত চতুরতায়; যেখানে ফাতেমার শারীরিক সৌন্দর্য লেহন করে সবাই, যেখানে হঠাৎ ফাতেমা অদৃশ্য হয়ে যায় কোনো শরীরলিপ্সু ক্ষমতাবাদীর 'অলৌকিক' (সাধারণ যুক্তির বাইরে) কর্মকাণ্ডে, সেখানে সেই ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেওয়ানোটা পরিপার্শ্বের মানুষের নিত্তনৈমিত্তিক আনন্দের ব্যাপার। সেখানে আকালু তাদের চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা পরিচালিত। সেখানে শিশুর মা- হারানোটা বড় প্রসঙ্গ নয়; মর্মজ্বালা বাড়ে যদি সে মায়ের মতো যৌবনবতী হয়ে ওঠে। সেখানে বিশ্লেষণহীনভাবে নারীর মৃত্যুর কারণ দেখানো যায় বিষপিঁপড়াকে – শহীদুল জহির সেই ভূমিজ মানুষের জীবনবৈকল্যের স্বরূপ এঁকেছেন এ-গল্পে।

অনেকটা ছেলে-ভুলানো ছড়ার ভঙ্গিমা শহীদুল জহির এ-গল্পে ব্যবহার করে গল্পটিকে প্রচল ছোটগল্পের বয়নভঙ্গি থেকে পৃথক করে তুলেছেন। গল্পের পরিচর্যায় সর্বত্র এবং বর্ণনাভঙ্গির প্রতিটি বাক্যে তিনি মূর্ত করে তুলেছেন বাংলার প্রাচীন কথনভঙ্গিটিকে। ফাতেমা হঠাৎ নিখোঁজ হলে যখন সন্তানেরা মাকে খোঁজে তখন আকালু যে ভঙ্গিতে খুঁজতে নির্দেশ দেয় তাতে লোকছড়ার ঝোঁক সুস্পষ্ট:

যেদিন ফাতেমা নিখোঁজ হয়, সেদিন সকালে অথবা দুপুরে অথবা বিকালে বাড়ির সকলে যখন বুঝতে পারে যে, ফাতেমাকে অনেকক্ষণ হলো দেখা যাচ্ছে না, তারা, বাড়ির লোকেরা, আকালু বকুল এবং আমির হোসেন তাকে চারদিকে খোঁজে।

আকালু বলে, দেখতো রান্দে নাকি ।

তারা রান্না ঘরে যায়, দেখে যে, রান্না ঘর খা খা খালি পড়ে আছে...

আকালু বলে, দেখতো গোয়াইল ঘরে কিছু করে নাকি।[৫২]

এইভাবে খোঁজ চলতে থাকে; কিন্তু নিরুদ্দেশ ফাতেমার কোনো সন্ধান মেলে না। ফাতেমার নিরুদ্দেশ হওয়ার মধ্যে গল্পের চমৎকারিত্ব যেমন রয়েছে তেমনি বেদনা রয়েছে এ-গল্পে বকুল নামের মেয়েটির নিখোঁজ হয়ে যাবার মধ্যে। মাতা-কন্যা দুজনেরই নাম-না-জানা পিঁপড়ার খাদ্যে পরিণত হয়; এবং শহীদুল জহির শোষণের পারম্পর্য ধরে রাখেন পুরুষানুক্রমে। এক অভেদ্য শোষণজালে আবদ্ধ এই প্রান্তিক মানুষের জীবনের দুঃখগাথা শহীদুল জহির চরম নিরাসক্তিসহ তুলে আনেন। এক অনির্দিষ্ট নিয়তির মতো তাদের জীবনের প্রতিটি মোড়ে মোড়ে শত্রুর বসবাস। রূপ-যৌবনের যে অভিশাপ নেমে এসেছিলো ফাতেমার ভাগ্যে, মাত্রই রজঃস্বলা কন্যা বকুলের জীবনও সেই অভিশাপে শেষ হয়ে যায়:

তখন একদিন মাচার ওপর শুয়ে সে তার (বকুলের) পেটের ব্যথাটা টের পায়, ব্যথা অল্প অল্প করে বাড়ে, তারপর তার মনে হয় যে, তার তলপেট ছিঁড়ে গেল; এবং তখন বকুলের কাপড় ভিজে যায়। সে রাতে এক বিহ্বলতার ভেতর বকুল রান্না ঘরের মাচা থেকে নেমে ভিটার পিছনে বিচিকলার ঝোঁপের দিকে যায়, সেখানে সে একটা মোটা কলাগাছের গোড়া জড়িয়ে ধরে মাটির ওপর কাত হয়ে পড়ে থাকে, মা মা বলে কাঁদে; তখন বিচিকলা ঝোঁপের ভেতর লাল পিঁপড়া প্রতীক্ষায় ছিল, তারা তাদের ঢিপি ছেড়ে উঠে আসে।

পরদিন সকালে গ্রামের যারা আকালুর ভিটার পিছন দিকে যায় তারা বিচিকলার ঝোপের কাছে বকুলের শাড়ি পড়ে থাকতে দেখে; সুহাসিনীর লাল পিঁপড়া বকুলকে খেয়ে যায়।[৫৩]

বস্তুত, ভোগের প্রবলপ্রতাপের কাছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর খাদ্য হয়ে বেঁচে থাকার অসহায়ত্ব ও লোকবিশ্বাসে উধাও হয়ে যাওয়া সম্পর্কিত যে ভ্রান্ত ধারণা তার মূলান্বেষণ করেছেন শহীদুল জহির এই গল্পাখ্যানে।

মহল্লায় বান্দর আব্দুল হালিমের মা এবং আমরা

'মহল্লায় বান্দর আব্দুল হালিমের মা এবং আমরা'- গল্পটি একাধারে একটি মহল্লার যুদ্ধকালীন বাস্তবতার গল্প, সেই বাস্তবতায় মহল্লাবাসীর (আমরা) সামগ্রিক পরিস্থিতি বয়নের গল্প এবং সেই মহল্লাবাসীদের একজন আব্দুল হালিমের মা কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে সন্তান আব্দুল হালিমকে হারায়- সেই ভয়াবহতা ও সাহসিকতার গল্প।

শহীদুল জহির দ্বিস্তরিক কৌশলে গল্পটির আখ্যান নির্মাণে মনোযোগী হয়েছেন। তিনি মহল্লায় বান্দরের উপস্থিতির সংবাদ দিয়ে তাদের উৎপাতের বর্ণনা দিয়েছেন এবং সেই সূত্রে বহুদিন পূর্বে মহল্লা বান্দরহীন হয়ে যাবার অতীত টেনে এনেছেন। সেই অতীতের প্রাসঙ্গিকতায়, ১৯৭১ সনে কীভাবে এই মহল্লার মানুষ ও বানরের উপর পাকিস্তানি আক্রমণ ও নির্যাতন উপস্থিত হয়– বলেছেন সেই গল্প । শহীদুল জহির যেন সেই বাস্তবতা রোমন্থনের উদ্দীপকরূপে মহল্লায় বানরের পুনরাগমন ঘটান এবং মাত্র দুটি বানর আসায় এক পর্যায়ে সহজেই প্রতিভাত হয় যে, এই মহল্লায় শহীদ আব্দুল হালিম এবং তার দয়িতা হাসিনা আকতার ঝর্নার প্রতিরূপকে বানরদ্বয় এই মহল্লায় আসে। এতে মহল্লায় দুরকমের পরিপূর্ণতা আসে –

১। হারানো স্বজনের শূন্যতা পূর্ণতা পায়
২। হারানো অতীতের আমোদপ্রদায়ক বানরশ্রেণি ফিরে এসে এই নাগরিক জীবনের মহল্লায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে স্বস্তির উপলক্ষ; যেমনটা অতীতে ছিল।

লেখক, মহল্লার মানুষের সামষ্টিক চৈতন্যে বানরের ঐতিহাসিককাল থেকে সজীব উপস্থিতি ছিলো, এবং একাত্তর সনের মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতায় বানরের অনাবিল মহল্লাজীবন বিপর্যস্ত হয়ে বিলীন হয়ে গিয়েছিল কিছুকালের জন্য – এই দুইটি সূত্র একীভূত করে এই গল্পের প্লট সাজিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের পর বিপন্ন বানর প্রজাতি পুনরায় নিজেদের অবস্থান তৈরি করলে মহল্লাবাসীর মনে নিয়ত কার্যকর হতে থাকে পুরনো স্মৃতি। শহীদুল জহির সেই স্মৃতিসূত্র ব্যববহারের পূর্বে মহল্লায় বানরে-মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন আঁকতে চেয়েছেন গল্পের শুরুর বাক্যে:

> ভূতের গলির লোকেরা বানর নিয়ে ব্যস্ত থাকে' তারা দেয়ালের ওপর অথবা দূরে ছাতের কার্নিশে লেজ ঝুলিয়ে বসে থাকা এই খয়েরি রঙের জানোয়ারের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে, বান্দর বান্দর, ওই যে বান্দর।[৫৪]

বানরের এই দৃশ্য মহল্লাবাসীদের দূরতর অতীত থেকে রক্তাক্ত স্মৃতিসমূহ জাগিয়ে তোলে, "তখন হয়তো কখনো ভূতের গলির লোকেরা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে, হয়তো জটিল সময়ের ভেতর কাহিল হয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলে।"[৫৫] তবে যেভাবেই তারা বলুক, একাত্তর ভয়াবহ স্মৃতি তাদের স্মরণপটে যুগপৎভাবে দুঃখ ও অর্জনের ঘটনা হয়ে বেঁচে থাকে। ফলে সঙ্গে সঙ্গেই তারা সেই ঘটনায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত আব্দুল হালিমকে স্মরণ করে:

> যখন ২৫ তারিখের রাতে নয়াবাজারের কাঠের গোলা পুড়তে শুরু করে তখন ভূতের গলি তার বাইরে থাকে না; ভূতের গলিতেও অবধারিতরূপে একাত্তর সন নেমে আসে এবং তখন আব্দুল হালিম এই সময়ের পাকচক্রে ধরা পড়ে।"[৫৬]

ফলত গল্পটি আর বানরকেন্দ্রিক বেড়ে ওঠে না। ১৯৭১ সনে পাকসেনাদের নির্যাতনের শিকার হয়ে মানুষ ও বানর একই শ্রেণিভুক্ত হয়ে যায়। তাই "মহল্লার লোকেরা বলে যে, ভূতের গলিতে আগেও বানর ছিল। যারা মহল্লার পুরাতন বাসিন্দা তারা মনে করতে পারে যে, একসময় তারা মহল্লায় অনেক বানর দেখেছে"[৫৭], শহীদুল জহির এই গল্পের মধ্যে ছেদ আনেন মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ-স্মৃতির মধ্যবর্তী কালের মাধ্যমে। যুদ্ধকালে মানুষের সঙ্গে বানরও মহল্লা ছাড়া হয়ে গেলে এই পরিচিত দৃশ্যে ছেদ ঘটে। তারপর বহুদিন পর বানর ফিরে এলে মহল্লাবাসীর সামষ্টিক ভাবনায় পুরনো স্মৃতিসহ বহু ঘটনা কার্যকর হয়। লেখক এই কার্যকারণসূত্র ব্যবহার করে গল্পটির বাকি অংশ বর্ণনা করেন। মধ্যবর্তী সেই অংশটুকু ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধ, আব্দুল হালিম, তার মা এবং মহল্লার অন্যসকলের সম্মিলিত কাহিনি। যুদ্ধচলাকালে মহল্লার কলেজ-পড়ুয়া ছেলে আব্দুল হালিমের প্রেম, পলায়ন ও মৃত্যু গভীরভাবে দাগ কাটে সকলের মনে। তার মায়ের আহাজারিতে সর্বদা দগদগে ঘা হয়ে থাকা সেইসব ঘটনা তার বিস্মৃত হতে পারে না; এবং মহল্লায় বানরের পুনরাগমন ঘটলে সেই স্মৃতি তাজা হয়ে ওঠে। তারা যেন মহল্লায় নতুন আসা এক জোড়া বানরের মধ্যে আব্দুল হালিম ও হাসিনা আকতার ঝর্ণাকে দেখতে পায়। শত্রুর সন্নিধানে যে প্রেম রয়ে গিয়েছিলো অপূর্ণ, বানরদ্বয়ের উন্মাতাল প্রেমবানে মহল্লাবাসীদের মনে তা যেন পূর্ণতর অবয়ব পেতে থাকে। নগরক্লিষ্ট জীবনে একটু প্রশান্তি লাভের সুযোগ এনে দেয় বানর-দম্পতি:

> মহল্লার লোকেরা কেউ কেউ কখনো বানর দেখার জন্য এখলাসউদ্দিনের বাসায় যায়, চার তলার ছাতে উঠে দূরে ফখরুলদের সিঁড়িঘরের ওপর বানর দুটোকে দাপাদাপি করতে দেখে; তাদের তখন খুব আমোদ হয়।[৫৮]

জনজীবনে জীবনাস্বাদলাভের পুনরাকাঙ্ক্ষা-জাগানিয়া এই গল্পটিতে শহীদুল জহির বস্তুত সময়ের সীমানা ভেঙেছেন। বর্তমানকাল ও ১৯৭১-এর স্মৃতিবাহিত অতীত- এ-দুস্তরের সময় শহীদুল জহির

এমন মুন্সিয়ানায় একীভূত করেছেন যে, কালগত ঐক্যের প্রচলভঙ্গি এখানে মুহুর্মুহু ভেঙে পড়েছে; তদুপরি, চৈতন্যপ্রবাহরীতিকে করেছেন সমষ্টির স্মৃতিমন্থনে রূপান্তর, ফলে সেই সময়বিন্যাসের কৌশলে এসেছে নতুন মাত্রা। চৈতন্যপ্রবাহরীতিতে সময়ের উল্লম্ফন দৃশ্যমান এবং তা পৃথককরণ সহজতর হলেও শহীদুল জহিরের ভঙ্গি কিঞ্চিৎ বঙ্কিম ও জটিলতাক্রান্ত। তবে এসব বিবেচনার বাইরে গিয়ে শুধু নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলেই এ-সত্য প্রতীয়মান হবে যে, মানুষ ও ভিন্ন প্রাণীর স্বাভাবিক মেলবন্ধনে লেখক এক গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের কথা বলেছেন; 'মহল্লায় বান্দর, আব্দুল হালিমের মা এবং আমরা' শিরোনামে যা সংবদ্ধ রূপ লাভ করেছে।

ইন্দুর-বিলাই খেলা

'ইন্দুর-বিলাই খেলা' গল্পটি সমাজের ইতিহাস শুধু নয়, সভ্যতার ইতিহাসের সুপ্রাচীন ক্ষমতাকাঠামোর রূপকী আয়োজনে ভরপুর। সময়াবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই খেলা যে অনন্তকাল ধরে চলমান থাকবে (শুধু চরিত্র বদল হবে) সেই মার্কসীয় চিরন্তনতা অনুধাবন করেই শহীদুল জহির গল্পটি রচনা করেছেন। তদুপরি, বয়নবৈশিষ্ট্যগত অভিনবত্বের কারণে গল্পটি স্বতন্ত্র মর্যাদা ও আলোচনার দাবিদার। শহীদুল জহির বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পশ্চাতে একধরনের শোষণের রূপকথা নির্মাণ করতে চেয়েছেন ইন্দুর-বিলাই খেলার আড়ালে। সবসময়-ই শোষককে বিড়ালের স্থলাভিষিক্ত ও শোষিতকে ইঁদুরের প্রতীকে প্রকাশ করে তিনি একটি খেলার নিয়ম নির্দেশ করেছেন – যেটি বিশ্বব্যাপী শোষক-শোষিতের দ্বান্দ্বিক ক্রীড়াময় বাস্তবতাকে তুলে ধরে।

সমাজে-সভ্যতায় নিত্যপ্রবহমান এই দ্বান্দ্বিক ক্রীড়ার উৎস হিসেবে তিনি মহল্লার গল্পে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সম্পৃক্ত করেছেন; ফলত গল্পটি একটি মহল্লার নিছক অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে থাকেনি, একটি জাতির ইতিহাসের সঙ্গে এর উৎপত্তির কাল-সমীভূত হয়েছে। 'ইন্দুর বিলাই খেলা' গল্পটিতে খণ্ডখণ্ড চিত্রে (অনেকটাই মধ্যযুগীয় কাব্যের আখ্যান গঠনের বা নির্মাণের কৌশল অবলম্বনে) একটি মহল্লার শোষণচিত্র তুলে ধরলেও, সামগ্রিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতির আখ্যান এতে সাঙ্গীকৃত করেছেন শহীদুল জহির।

গল্পস্থ কাঠামোতে তিনি ইন্দুর-বিলাই খেলার সাতটি নমুনা-আখ্যান বর্ণনা করেছেন, সেখানে ইন্দুর অর্থাৎ শোষিতরা সবাই এই মহল্লার অন্তর্ভুক্ত, ভিন্ন বিচারে, সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। নমুনাগুলোতে যখন ইন্দুর ও বিলাইয়ের পারস্পরিক খেলার বর্ণনা দেয়া হয়, তখন যেন ক্ষুদ্রায়তনে

লেখক পুরো বাংলাদেশকেই উপস্থাপন করেন। স্বাধীনতা-পূর্ব ও পরবর্তীকাল মিলে এসব আখ্যানাংশের ব্যাপ্তিকাল; তবে খেলোয়াড় ও সময় বিবেচনায় এর যে কোনো নির্দিষ্টতা নেই এবং সেই খেলা যে কেবল বিলাইয়ের ইচ্ছা-নির্ভর খেলা সেটিও লেখক গল্পের শেষে মন্তব্য করেছেন:

> এই খেলার শেষ নাই, খেলোয়াড়ের শেষ আছে; খেলোয়াড় খেলা ছেড়ে যায়, কিন্তু খেইল জারি থাকে। উল্লেখ্য যে, বালকদের খেলা ছাড়া অন্যান্য খেলার ক্ষেত্রে... কেবল বিলাইরা ইচ্ছা করে খেলা ছেড়ে যেতে পারে, ইন্দুররা পারে না; বিলাই খেলতে চাইলে ইন্দুরকে খেলতে হবে।[৫৯]

বস্তুত, সহজে অনুমেয় যে, বিশ্ব-রাজনীতির দখলদারী মনোবৃত্তি, উত্তর-সাম্রাজ্যবাদ এবং স্থানীয় শাসনকাঠামোর ভোগপ্রবৃত্তিকে লেখক তাঁর এই গল্পের কাঠামোভুক্ত করেছেন বক্তব্যের বিশালত্বে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ কাদেরকে বিড়ালে আর কাদেরকে ইঁদুরে রূপান্তর করে, স্বাধীনতা অর্জনের পর সেই বিড়ালের স্থলাভিষিক্ত কারা হয় এবং ইঁদুর শ্রেণি কালপরম্পরায় কীভাবে মূষিকজীবনের বাধ্যতামূলক জীবনাবাদ করে, সেই কষ্টকথাই শহীদুল জহির এ-গল্পের মর্মমূলে প্রোথিত করেছে।

পাশাপশি, ইন্দুর-বিলাই খেলার গল্পস্থলে তিনি এই খেলার উৎপত্তিকাল ও তৎসাময়িক ঘটনাসমূহ, মানুষের জীবনাচার; বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নবোদ্ভূত বিড়াল শ্রেণি এবং সমাজাভ্যন্তরের ইন্দুর শ্রেণির গল্প তুলে এনে একটি দীর্ঘকাল-পরিসীমায় গঠিত, সমাজকায়ায় শোষণের অপরিবর্তিত নীতির অবস্থান নির্দেশ করেছেন। অনন্তকাল ধরে এ-খেলা চলতে থাকবে – এমন বক্তব্য দিয়ে তিনি একটি আবহমান সামাজিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

প্রথম বয়ান

একটি যুগলের ঘটে যাওয়া অতীতের রোমাঞ্চকর প্রেমসম্পর্কের স্মৃতিবাহিত আখ্যান 'প্রথম বয়ান'। চল্লিশ বছর পর বৃদ্ধ আবদুর রহমানের হঠাৎ চল্লিশ বছর আগের স্মৃতিকাতরতা, একটি চুনমাখা-ল্যাম্পপোস্টের সূত্র ধরে কাহিনির মুখ খুলে দেয়। পাঠকের সামনে নিয়ে আসে তার কৈশোরে ঘটে যাওয়া অপূর্ণ প্রেমের সম্ভাব্য কাহিনি। মহল্লার সুফিয়া আক্তারের সাথে প্রেমের সম্ভাবনা জাগানিয়া ফুলের ডালের আদান-প্রদান ও তন্নিহিত প্রেমভাবনার বিলম্বিত অনুধাবন এ-গল্পের মূল রসদ। কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববতী ফুলের ডালের ঘটনা শুধুমাত্র ল্যাম্পপোস্টের বাতি জ্বালানো দেখার আনন্দের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এবং কীভাবে যুদ্ধকালে একই জায়গায় আশ্রয়প্রাপ্ত সুফিয়া আক্তার ও

আব্দুর রহমানের রহস্যময় বক্তব্যের আদান-প্রদান একটি প্রেমসারণি গড়ে তোলে সেই কাহিনি এবং ও সার্বিক পরিস্থিতির বাস্তবতায় সেই প্রেম চূড়ান্ত সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয় কীভাবে, সেই গল্পই আখ্যানকার শহীদুল জহির করেছেন 'প্রথম বয়ান'-এ।

বস্তুত, এটি বৃদ্ধ আবদুর রহমানের একপ্রকার মানসিক প্রশান্তি অন্বেষণ; অতীতের অন্ধকার থেকে জোনাকির ঝিলমিল আলোর মতো স্মৃতি রোমন্থনের গল্প। সে সময় হয়তো সুফিয়ার সঙ্গে আবদুর রহমানের প্রণয়গত ব্যাপার কিছুই ঘটেনি কিন্তু খানিক সম্ভাব্যতার সঙ্গে প্রাণের যোগ ঘটিয়ে এ-গল্প সৃষ্টি করেছে সে নিজের ভেতর। ফলত, পানের দোকানি ইদ্রিস আলি যখন সুফিয়া বেগমের অস্তিত্ব নিয়ে সত্যতা যাচাই করতে যায়, তখন সে সুফিয়ার স্থলে শামিমার নাম উচ্চারণ করে এবং ভিন্ন কৌশলে আখ্যান বাঁক নিতে আরম্ভ করে ভিন্ন সম্ভাবনার দিকে:

> ইদ্রিস আলির ব্যাপারটা বুঝতে যারপর নাই কষ্ট হয়, সে বিভ্রান্ত হয়া পড়ে; সুপিয়া না, এটা ছিল শার্মিমা !হতে পারে, নয় কেন?[৬০]

এই বাধাপ্রাপ্তির পর, আব্দুর রহমানের সাথে এতাদিন জমিয়ে তোলা গল্পের চরিত্র বদল হয়ে যায়; কিন্তু ঘটনা-পরম্পরা থাকে অভিন্ন। শুধু নাম পরিবর্তন করে, ইদ্রিস আলি সুপিয়ার স্থলে শামিমা বা সুলতানা বা অন্য যে কারোর গল্প কল্পনা করে, এবং গল্পটি শুরু হয় প্রথম বয়ানকৃত গল্পের আদলেই:

> অনেকদিন আগে হয়তো আব্দুর রহমান এবং আবুল হোসেন মন্দিরের বারান্দায় লুঙ্গি আর হাতাকাটা গেঞ্জি পরে বসে ছিল, তখন সন্ধ্যা বেলা জোড়পুলের দিক থেকে তার আম্মা অথবা দাদি আম্মার সঙ্গে শামিমা, হয়তো শামিমা বেগম অথবা সুলতানা, হাতে বড় সাইজের একটা জাম্বুরা নিয়ে হেঁটে আসে।[৬১]

ইদ্রিস আলির উপর বিতৃষ্ণাবশত আখ্যানের বাঁক ও চরিত্র পরিবর্তন করে তার যে ছবি আব্দুর রহমান তৈরি করে, তা হয়ে যায় অনেকটাই প্রথম বয়ানের সুফিয়ার বয়ানের মতো – এতেই প্রথম বয়ানের মৌলিকত্ব নির্দিষ্ট হয়। লেখক সেই মৌলিকত্বের দিকে ইঙ্গিত করে গল্পের নাম করেছেন এবং গুরুত্ব দিয়েছেন 'প্রথম বয়ান'-এর উপর।

তৎসঙ্গে শহীদুল জহির এটিও দেখাতে সচেষ্ট থেকেছেন যে, গল্প জমে ওঠে মানুষের মনে ; একটি Type ধরে এগুলো খানিকটা এদিক- সেদিক করে বানানো সম্ভব বহুগুণ বয়ান। কিন্তু প্রথম বয়ানের Type-এই গড়ে ওঠে পরবর্তী সকল গল্পের শরীর। যেন কাঠামোবাদী ছকে ফেলেই সুফিয়ার স্থলে

শুরু করা যেতে পারে শামিমা বা সুলতানার গল্প। কার্যত প্রথম বয়ানটিই কাঠামোগতভাবে আদি ও অকৃত্রিম। প্রথম বয়ানের আব্দুর রহমান ও সুফিয়া আক্তারের বয়ান তাই মৌলিককাঠামো নির্দেশী।

ডলু নদীর হাওয়া

'ডলু নদীর হাওয়া' গল্পটি এ-গ্রন্থের নামগল্প। শহীদুল জহিরের চট্টগ্রাম জীবনের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ শিল্পপ্রমাণ এ-গল্পটি। রূপকথার গল্পের মতো লোকমোটিফ-সমৃদ্ধ গল্প 'ডলু নদীর হাওয়া'। কিছু শর্তের সঙ্গে বিশ্বাসের শক্তি ও দুর্বলতার রহস্যঘেরা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এ-গল্পের কাঠামো।

তৈমুর আলী ও এলাচিং ওরফে সমর্তবানুর শর্তভিত্তিক দাম্পত্যজীবনের নিয়তিসাপেক্ষে টিকে থাকা এবং গল্পশেষে সেই শর্তের ভাঙলে তৈমুর আলির মৃত্যু এবং সম্ভাববাক্যসমূহে সেই শর্তের অকার্যকারিতা প্রমাণের পর তৈমুরের মৃত্যুর কারণনিয়ে গড়ে ওঠা জল্পনা-কল্পনার ভিত্তিপ্রস্তরের উপর গল্পের দেয়াল তুলেছেন শহীদুল জহির। তৎপরিপ্রেক্ষিতে গল্পটি হয়ে উঠেছে প্রেমের-দ্বন্দ্বের – প্রেম ও দ্বন্দ্বের মিশেলে গড়ে ওঠা রহস্যের আধার।

জসিমউদ্দিন ওরফে জইস্স্যা করাতি এবং আরাকান-কন্যা অঙমেচিং-এর একমাত্র কন্যা, রূপবতী এলাচিংকে ভালোবেসে তৈমুর আলী জীবনের এক আমৃত্যু চলমান পরীক্ষার মুখোমুখি হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত তা তার সঙ্গী হয়েই থাকে। করাতি-কন্যা এলাচিংকে পছন্দ করে তাকে পাবার জন্য তৈমুর পালন করে না এমন কোনো শর্ত বাকি থাকে না। সমর্তের প্রেমিক সুরত জামালকে চালাকিতে বাধ্য করে অন্যত্র সরিয়ে দেয় প্রথমত সে; অতঃপর ভয়ংকর ফাঁদ পাড়ি দিয়ে, নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও সে আপাতত জয় করে সমর্ত বানুকে। নিজের পছন্দের মানুষকে দূরে সরিয়ে দেবার প্রতিশোধ আজীবন নেয় সমর্ত, তৈমুরের কাছ থেকে; বাসর রাত থেকেই সে অবতীর্ণ হয় সেই খেলায়, দুটি বিড়াল নিয়ে বাসর ঘরে ঢোকার শর্ত মেনেও সে নিস্তার পায় না। তার জন্য উপবিষ্ট দুই পাত্রের খাবার খেয়ে একটি বিড়াল বাঁচে অন্যটি মওে যায়। তার উৎকণ্ঠা চরম পর্যায়ে উন্নীত হয় যখন, সে দেখে যে, এলাচিং তার জন্যও আলাদা দুইটি গ্লাসে শরবত রেখেছে। সে পরীক্ষায় পড়ে যায় এবং মৃত্যু-পর্যন্ত সে অপরাজিত থেকে, শেষপর্যন্ত নিজেই রহস্যের জালে ধরা দেয় এবং মৃত্যুবরণ করে। খেলার শুরুটা লেখক বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> অতঃপর তৈমুর আলি যখন পানি খাওয়ার জন্য টেবিলের কাছে যায় সে দেখে যে, দুটো গ্লাসে পানি ভরে রাখা হয়েছে। তখন তার উত্তেজনা নেমে আসে এবং সে খেলাটাকে মেনে নেয়।[৬২]

সমর্তবানু বা এলাচিংয়ের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান সেই পরীক্ষা গ্রহণের কাজকে কেন্দ্র করে। আরাকান রক্তের উত্তরাধিকার এই কন্যা তার রহস্যময়তা একদিনের জন্যও পরিষ্কার করে না তৈমুরের কাছে; মায়ের কাছ থেকে পাওয়া হিরার আংটির গোপন মারণাস্ত্র দিয়ে সে পরীক্ষা নিতেই থাকে তার। অন্যদিকে, উত্তরাধিকারদের নিয়ে অলৌকিকভাবে বেঁচে থাকে তৈমুর; কিন্তু শেষপর্যন্ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং সে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়:

> বস্তুত এলাচিংয়ের একাধিকবার বিড়াল মারা সত্ত্বেও হীরার আংটির বিষয়টা হয়তো তৈমুর আলির বিশ্বাস হয় নাই, বিশেষ করে যখন প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ এই খেলা চলে এবং সঠিক গ্লাসটা চিনে নিতে তার একবারও ভুল হয় না, তখন তার সন্দেহ একরকম বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে যায় – তার মনে হয় যে, কোথাও জারিজুরি আছে, এলাচিং আগেও মিথ্যা বলেছে হয়তো এখনো বলে। কিন্তু এই সন্দেহের জন্য অথবা অবশেষে ক্লান্ত হয়ে কিংবা হয়তো পিপাসার কারণেই (সে) দুইটা গ্লাসের সব পানি খেয়ে (মৃত্যুবরণ করে)।[৬৩]

বিশ্বাসের খেলায় তৈমুরের ধৈর্যচ্যুতি তাকে মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করে। গল্পটি জমিয়ে তুলতে লেখক এলাচিং চরিত্রটিকে গড়ে তুলেছেন এমন এক ছাঁচে, যেটা তার আরাকানি মা- থেকে পাওয়া। শহীদুল জহির বিশ্বাসের অন্ধকারতম যে-দিকটাকে 'সংস্কার' বলে, সেই সংস্কারকে মূল মোটিফ হিসেবে এ-গল্পে ব্যবহার করেছেন। তৈমুরের সাংসারিক জীবনের অভ্যন্তরে রোপণ করেছেন সেই সংস্কারের বীজ। মায়ের কাছ থেকে পাওয়া হিরের আংটিটি সেই সংস্কার-স্মারক। গল্পের শেষে পুত্রকে নিয়ে পরীক্ষা করে এলাচিংয়ের ভ্রান্তি হয়তো কাটে কিন্তু চল্লিশ বছরের যাবতীয় ঘটনায় যে আংটি কার্যকরভাবে বিভিন্ন পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়েছে তার কোনো ব্যাখ্যাযোগ্য উত্তর মেলে না। শহীদুল জহির জীবনের সেই অব্যাখ্যাত আবেদনকেই গল্পের মূলে প্রতিস্থাপিত করেছেন।

তথ্যনির্দেশ:

১. ১৯৭৫ থেকে ১৯৯১– নিজেকে একটু একটু করে বদলেছেন এই লেখক। তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে ক্রম-রহস্যময়, কুহকি।– কিন্নর রায় । সূত্র: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (সম্পাদিত) শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ; পাঠক সমাবেশ, ঢাকা; ২০১০; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ২০৩।

২. আহমাদ মোস্তফা কামালকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে শহীদুল জহির স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন এ-ব্যাপারে: "আমার বর্ণনায় যে সামষ্টিক বর্ণনাভঙ্গির ব্যবহার, সেটা যে কীভাবে হয়েছে, তা ঠিক বলতে পারবো না। *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* লিখতে গিয়ে এটা হয়েছে।"– সূত্র: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫৯৭।

৩. "জাদুবাস্তবতার ব্যাপারটা তো আমি মার্কেজের কাছ থেকে পেয়েছি। এবং এটা আমি গ্রহণ করেছি দুটো কারণে। প্রথমত, চিন্তার বা কল্পনার যে গ্রহণযোগ্য পরিধি সেটা অনেক বিস্তৃত হতে পারে বলে আমি মনে করি। ... দ্বিতীয়ত, আমি আসলে বর্ণনায় টাইমফ্রেমটাকে ভাঙতে চাচ্ছিলাম এবং সময়ের একতল থেকে অন্যতলে অনায়াসে যাতায়াত করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু ট্র্যাডিশনাল ধারায় আমি তা পারছিলাম না। ... আমার সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই আমি জাদুবাস্তবতা ব্যবহার করতে শুরু করি, কারণ জাদুবাস্তবতায় এ সুযোগ আছে।" – আহমাদ মোস্তফা কামাল কর্তৃক গৃহীত শহীদুল জহিরের সাক্ষাৎকার। সূত্র: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫৯৬-৫৯৭।

৪. "আমি মনে করি যে, আমার গল্পের ক্ষেত্রে (ঐতিহ্য) যেটুকু এসেছে সেটুকু হল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এবং সৈয়দ শামসুল হক। ... কারণ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র লেখার প্রভাব আমি সৈয়দ হকে দেখি। সেখান থেকেই পার্টিকুলারলি আমি দখল করি।" – আর কে রনি কর্তৃক গৃহীত শহীদুল জহিরের সাক্ষাৎকার। – সূত্র: প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ৬২২।

৫. "পারাপারের গল্পগুলোতে...সমাজের বঞ্চিতদের কথা সরাসরি বলার, বিদ্রোহের এবং জীবনকে জয়ী দেখানোর একটা ব্যাপার আছে, প্রবণতা আছে। ... পরে আমি পদ্ধতিগতভাবে সরে গেছি, এখন আমার মনে হয় ... জীবন জয় এবং পরাজয়ের চাইতে বড় কিছু, সাহিত্যের কাজ এই জীবনকে ধারণের চেষ্টা করা। – কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর কর্তৃক গৃহীত শহীদুল জহিরের সাক্ষাৎকার। সূত্র: প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫৬৬-৫৬৭।

৬. "এই 'আমরা' মহল্লাবাসীই।... এটা হচ্ছে এক ধরনের পদ্ধতি যেখানে বর্ণনা ও এবং কাহিনী তৈরির স্বাধীনতা নেয়া, জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করা বা জনশ্রুতিকে ব্যবহার করার যে সুবিধা, সেটাকে ব্যবহার করা।" – আহমাদ মোস্তফা কামাল কর্তৃক গৃহীত শহীদুল জহিরের সাক্ষাৎকার। সূত্র: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫৯৪।

৭. ডলু নদীর হাওয়া : ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; ২০০৪।

৮. আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল নেই কেন : ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প; শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা; ১৯৯৯

৯. প্রাগুক্ত

১০. প্রাগুক্ত

১১. প্রাগুক্ত

১২. প্রাগুক্ত

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. "সত্যি বলতে কি ১৯৯২-এ প্রকাশিত 'কাঠুরে ও দাঁড়কাক' থেকে সম্পূর্ণ অন্য এক শহীদুল জহিরকে আমরা পাই। রূপকথা অথবা পুরাণকথার মোড়কে তিনি দেখাতে চান নিষ্ঠুর, তথাকথিত আধুনিক পৃথিবীর নানা অসুখ।"– কিন্নর রায় মোহাম্মদ আবদুর রশীদ; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ২০৩

১৬. দ্রষ্টব্য – কিন্নর রায়। সূত্র: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ২০৪

১৭. কাঠুরে ও দাঁড়কাক : ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প; প্রাগুক্ত

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. প্রাগুক্ত

২০. প্রাগুক্ত

২১. প্রাগুক্ত

২২. প্রাগুক্ত

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. প্রাগুক্ত

২৫. প্রাগুক্ত

২৬. ডুমুরখেকো মানুষ: ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প; প্রাগুক্ত

২৭. প্রাগুক্ত

২৮. দ্রষ্টব্য – মোহাম্মদ আজম: শহীদুল জহির: নবীন বীণার প্রবীণ বাদক। সূত্র: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ২৬২

২৯. ডুমুরখেকো মানুষ: ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প; প্রাগুক্ত

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. প্রাগুক্ত

৩২. প্রাগুক্ত

৩৩. কাজল শাহনেওয়াজ: শহীদুল জহিরের জন্য। সূত্র: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৩২৫

৩৪. এই সময়: ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প; প্রাগুক্ত

৩৫. প্রাগুক্ত

৩৬. প্রাগুক্ত

৩৭. প্রাগুক্ত

৩৮. গল্পের শুরুতেই লেখক গল্পের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন – "বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আশির দশকে দ্বিতীয় সামরিক শাসনের কাল শুরু হয়" - শহীদুল জহির: কাঁটা; প্রাগুক্ত

৩৯. কাঁটা; প্রাগুক্ত

৪০. আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস : ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প; প্রাগুক্ত

৪১. প্রাগুক্ত

৪২. শহীদুল জহির : অনুক্রমণিকা: 'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস' পুনর্মুদ্রণ সম্পর্কে। সূত্র: ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প: মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; ২০০৪

৪৩. ধুলোর দিনে ফেরা : ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প; প্রাগুক্ত

৪৪. প্রাগুক্ত

৪৫. প্রাগুক্ত

৪৬. প্রাগুক্ত

৪৭. প্রাগুক্ত

৪৮. দ্রষ্টব্য: মহীবুল আজিজ; সূত্র: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১০২

৪৯. দ্রষ্টব্য: আহমাদ মোস্তাফা কামাল; প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ১৭৩

৫০. চতুর্থ মাত্রা : ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প; প্রাগুক্ত

৫১. কোথায় পাব তারে : ডলু নদীর হাওয়া ও অনান্য গল্প, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ২০০৪; পৃষ্ঠা – ২০-২১

৫২. আমাদের বকুল : ডলু নদীর হাওয়া ও অনান্য গল্প, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ২৫

৫৩. আমাদের বকুল : প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৩৯

৫৪. মহল্লায় বান্দর আব্দুল হালিমের মা এবং আমরা: প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৪০

৫৫. প্রাগুক্ত

৫৬. প্রাগুক্ত

৫৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৪১

৫৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫৫

৫৯. ইন্দুর-বিলাই খেলা :ডলু নদীর হাওয়া ও অনান্য গল্প; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৮০

৬০. প্রথম বয়ান :ডলু নদীর হাওয়া ও অনান্য গল্প; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৯৫

৬১. প্রাগুক্ত

৬২. ডলু নদীর হাওয়া : ডলু নদীর হাওয়া ও অনান্য গল্প; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১০০

৬৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১১১

পঞ্চম অধ্যায়

শহীদুল জহিরের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রকরণ

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা

শহীদুল হক থেকে নানাবিধ রূপান্তরসহ শিল্পী শহীদুল জহিরের আত্মপ্রকাশ ঘটে 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসটির মাধ্যমে। 'পারাপার' গ্রন্থের শহীদুল হক এই উপন্যাসে যেন একেবারে নতুন করে নিজের স্বকীয় শিল্পপথ অন্বেষণ করেছেন; এবং বলাবাহুল্য, সে প্রচেষ্টায় তিনি অবিসংবাদী সাফল্য পেয়েছেন। ফলে এই উপন্যাসটি বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে বিষয়বয়ন ও শিল্পভাষ্যে হয়ে উঠেছে একটি অনন্য মাইলফলক। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ আখ্যানাংশ ও তার স্মৃতিতাড়িত আবদুল মজিদের বাংলাদেশের আশির দশকে পরিবর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে নিজেকে মেলাতে না পেরে নিজেকে ও নিজের অন্যান্য সদস্যকে বাঁচানোর সংকল্প থেকে এলাকা ছেড়ে চলে যাবার আখ্যানকে মূল করে শহীদুল জহির বাংলাদেশে তথা বাংলা কথাসাহিত্যের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসটি সাজিয়েছেন।এটি একাধারে হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম চলাকালীন বিদ্যমান নৃশংসতার বয়ান; তুলে ধরেছে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু-হত্যা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতির খোলবোল পরিবর্তনের সমসাময়িক দলিল এবং সেই পরিবর্তনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী, মুক্তিযুদ্ধে স্বজন হারানো মানুষের চিত্তক্ষোভের মর্মকথা ও প্রতিবাদের অসাধারণ শিল্পস্মারক। সেই সঙ্গে আপসহীন বাঙালির দৃঢ় মেরুদণ্ডের প্রত্যয়দীপ্ত অস্তিত্বের অবিচল মনোভাব প্রকাশের দিকটিও সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেছে উপন্যাসটি।

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সমরশাসনের সময় জাতীয় রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তি যখন নিজেদের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হিসেবে বিবেচিত রাজনৈতিক দলগুলোও যখন সামরিক অপশাসন থেকে মুক্তির আন্দোলনে তাদেরকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে গুরুত্ববহ করে তুলছে, শহীদুল জহির সেই সময়টাকেই বেছে নিয়েছেন নিজের গল্প-উদ্গামের কাল হিসেবে। কার্যত তিনি সেই স্বৈরশাসনের সময়ে, ১৯৮৫ সনের একদিন উপন্যাসের গল্প শুরু করেছেন। পরিপার্শ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় একজন বিবেকবান মানুষের যখন উপলব্ধি হয় যে, যারা এখন রাজনৈতিক সিদ্ধি হাসিলের জন্য জনসাধারণকে কাছে ডাকছে, মাত্র দেড় দশক আগে তারাই ওই

একই উদ্দেশে কামিয়াবি অর্জনের জন্য একটি মহল্লার জনসাধারণের জীবন ভস্ম করে দিয়েছিলো সামগ্রিকভাবে, তখন সেই মানুষটির স্মৃতিশক্তি কার্যকর হয়ে ওঠে এবং প্রাক্তন স্মৃতির বীভৎসতায় বারংবার কেঁপে ওঠে তার অন্তর। 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসে শহীদুল জহির তেমন সজাগবিবেকের চরিত্র হিসেবে আবদুল মজিদকে উপস্থাপন করেছেন– যার পরিবারের একাধিক সদস্য ও পরিচিত জ্ঞাতি-বন্ধু অনেকেই ১৯৭১ সনের মহান মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের মহল্লার রাজাকার-আলবদরদের কসাইবৃত্তির কাছে প্রাণ হারিয়েছে। সেইসব প্রাণের আত্মত্যাগের পরিবর্তে তারা অর্জন করেছে একটি নিরাপদ রাষ্ট্র; যেটি স্বাধীন, সার্বভৌম এবং শত্রুর কবল থেকে মুক্ত। এমন একটি দেশে যেখানে স্বস্তিকর বসবাসই প্রত্যাশিত, সেখানে সেইসকল চিহ্নিত শত্রুর পুনরুত্থান নিঃসন্দেহে তাতের চিত্তলোকে দুঃসহ স্মৃতি জাগিয়ে তোলে । তারা পুনরায় নিরাপত্তহীনতায় ভোগে এবং পুনরায় নিজেদের সন্তান-সন্ততি হারানোর আশঙ্কা অনুভব করে। আবদুল মজিদের চরিত্রে লেখক সেই ভয় জাগিয়ে তুলেছেন এবং সেই ভয়ের তাড়নায় তার যে অনুভব-অনুভূতি এবং আত্মরক্ষার যে আকুতি, সন্তানকে এই ভয়াল থাবা থেকে বাঁচিয়ে রাখার যে চেষ্টা সেটাই এই উপন্যাসে উপজীব্য করে তুলেছেন।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আবদুল মজিদের এই সতর্ক ও সজাগ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে একটি পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে লেখক উপন্যাসটি শুরু করেছেন:

> উনিশ শ পঁচাশি সনে একদিন লক্ষ্মীবাজারের শ্যামাপ্রসাদ লেনের যুবক আবদুল মজিদের পায়ের স্যান্ডেল পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে ব্যর্থ হয়ে ফট করে ছিঁড়ে যায়। আসলে বস্তুর প্রাণতত্ত্ব যদি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে হয়তো বলা যেত যে, তার ডান পায়ের স্যান্ডেলের ফিতে বস্তুর ব্যর্থতার জন্য নয়, বরং প্রাণের অন্তর্গত সেই কারণে ছিন্ন হয়, যে কারণে এর একটু পর আবদুল মজিদের অস্তিত্ব পুনর্বার ভেঙে পড়তে চায়।[১]

আবদুল মজিদের স্যান্ডেল ছিঁড়ে যাবার মধ্য দিয়ে লেখক ইঙ্গিত করেছেন মূলত তার হৃদয়ের তান ছিন্ন হবার দিকে। যেন যে শক্তির জোরে সে জীবনপথে চালিত হতো, সেই মনোবলে হঠাৎ টান লেগে ছিঁড়ে গেছে। এমতাবস্থায় পরিস্থিতি ব্যাখ্যা আবশ্যক। ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রয়োজন অপর এক ধরনের পরিস্থিতির বর্ণনা; যা আবদুল মজিদের স্মৃতিতে সবসময় জাগ্রত হয়ে আছে। সেটি হলো মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতির স্মৃতিচিত্র। কার্যত লেখক আবদুল মজিদের অভিজ্ঞতা রোমন্থনসূত্রে ১৯৭১ সনের দৃশ্যরাজি বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রে রায়সা বাজারের (রায় সাহেব বাজার) মোড় থেকে শুরু হয়ে তৎসংলগ্ন কয়েক বর্গকিলোমিটারকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটির

ঘটনা সংঘটিত হলেও ক্ষুদ্রাকারে এটি মুক্তিযুদ্ধকালীন সমগ্র বাংলাদেশেরই প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। শহীদুল জহির বিস্তৃত আয়নার ভগ্নাংশে প্রতিফলিত করেছেন তৎকালীন রক্তাক্ত রূপ। কার্যত উপন্যাসটি আবদুল মজিদ ও তার পরিবার এবং তার মহল্লার অন্যান্য সাধারণ মানুষ, বিপরীতে বদু মাওলানাদের কার্যকলাপের প্রতিফলনের মাধ্যমে তৎসাময়িক সারা বাংলাদেশের লাখো আবদুল মজিদ ও বদু মাওলানাদের কাহিনি হয়ে উঠেছে। পুরান ঢাকার কেন্দ্রস্থলের ওই জমিন ও মানুষেরা যেন ১৯৭১ সালের পাশবিকতা আক্রান্ত বাংলাদেশের লোহিত জমিন ও মানুষ।

আখ্যানায়তনের বিবেচনায় বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে অন্যতম ক্ষুদ্র এই উপন্যাসটি মূলত একটি অঞ্চলে ঘটে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ বিমানবিকতার কথাকেই স্মৃতিসূত্রে তুলে এনেছে। লক্ষ্মীবাজারের শ্যামাপ্রসাদ লেনের যুবক আবদুল মজিদ কারকুন লেন হয়ে রায়সাবাজারে আসার পথে নবাবপুর রোডে উঠে মাইকে আবুল খায়েরের জনগণকে ধন্যবাদ প্রদানের সচিৎকার কণ্ঠ শুনে সচকিত হয়ে ওঠে এবং তার মনে এই আবুল খায়েরের পৈতৃক পরিচয়ের বৃত্তান্ত জেগে ওঠে। সেই সূত্রে এই নবাবপুর রোডের ওপর দণ্ডায়মান থাকা অবস্থাতেই সে প্রাক্তন স্মৃতির বেদনায় কাতর হয়ে যায়। নবাবপুর রোডের ওপর দাঁড়িয়ে "আবদুল মজিদ যখন তার দৃষ্টি আবুল খায়েরের দীর্ঘ এবং তরুণ শ্মশ্রু আর নীল রঙের জোব্বার ওপর রাখে, তার মনে হয়, আকাশে যত কাক ওড়ে সেগুলো আবুল খায়েরের জোব্বার ভেতর থেকেই যেন বের হয়ে আসে।"[২] তার মনে পড়ে আবুল খায়েরের "পিতা বদরুদ্দিন মাওলানার সে এক অজ্ঞাত রহস্যময় ভালোবাসা ছিল কাকের জন্য।"[৩] পিতা ও পুত্রের প্রসঙ্গ এনে অতীত ও ঘটমান বর্তমানের যে সম্মিলন আবদুল মজিদ নিজের মনে সাজায় তাতে সৃষ্টি হয় এক মনোসংকট। কেন তৈরি হয় এই সংকট, 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' সেই ইতিহাসেরই আখ্যান।

১৯৭১ সনের মহান মুক্তিযদ্ধ চলাকালে লক্ষ্মীবাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বদু মাওলানা ও তার সহযোগীদের চালানো তাণ্ডবলীলা এবং পাকদোসরদের সেবাদানে এলাকাবাসীর উপর চালানো নির্মম অত্যাচারের কাহিনি এবং সেই অত্যাচারে আবদুল মজিদের পরিবারের উৎকেন্দ্রিক জীবনযাপন – মূলত এটিই বর্তমান উপন্যাসের প্রধান আখ্যান। কিন্তু শহীদুল জহির তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিকে শুধু এই দুটি পক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওই ভয়াবহ কালের জনজীবনকে তিনি সর্বোচ্চ সীমারেখায় ধরতে চেয়েছেন নিজের বর্ণিতব্য আখ্যানে। তাই "আবদুল মজিদ-মোমেনা-বদু মাওলানার গল্প, মোহাম্মদ সেলিম-মায়ারাণীর গল্প, ইসমাইল হাজাম-হিজড়া আবুল বাশারের গল্প, আজিজ পাঠান-বদু মাওলানার গল্প, বদু মাওলানা-পাকিস্তানি আর্মি-রাজাকার আবদুল গনি-মোমেনার

গল্প ইত্যাকার সমুদয় গল্পই *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতার* মতো বিশদ ও কুজ্ঝটিকাময় প্রান্তরের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে পরস্পরকে ছুঁয়ে, পরস্পরকে চিরে, অসংখ্য জীবনদায়িনী খালের মতো।"[৪]

আখ্যান-অন্তর্ভুক্ত উল্লিখিত চরিত্রসমূহ নাগরিক জীবনে একই মহল্লার অধিবাসী; তাদের সকলের জীবনে রয়েছে একটি অভিন্ন রঙের বন্ধন। সেই রঙ একান্তই মহল্লা-কেন্দ্রিক কৌমজীবনের পারস্পরিক ভালোবাসা-সমৃদ্ধ। কার্যত ১৯৭১ সনে নেমে আসা সেই যুদ্ধকালীন নির্মমতা এককভাবে কাউকে স্পর্শ করেনি; আক্রান্ত হয়েছে সেই কৌমজীবনে পরস্পর-সম্পৃক্ত সবাই। উপন্যাসের প্রধানপাত্র আবদুল মজিদ আক্রান্ত সবার সাথে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত; ফলে শুধু আব্দুল মজিদের গল্প বয়ন করতে গেলে প্রাসঙ্গিকভাবেই সে যাদের সাথে যুক্ত তাদের গল্পও জায়গা করে নেয়। কেননা, আবদুল মজিদের জীবনে তাদের ভূমিকা এবং তাদের জীবনে আবদুল মজিদের ভূমিকা যোগ করলেই কেবল একটি পূর্ণ বৃত্ত পাওয়া সম্ভব। শহীদুল জহির পূর্ণায়ত গল্পের ছকই কষেছেন বর্তমান উপন্যাসে।

একই মহল্লার সংঘবদ্ধ জীবনের স্মৃতিতে আত্মত্যাগ ও আত্মীয় হারানোর বেদনা নিয়ে পুনরায় জীবন শুরু করা মানুষগুলো যখন দেখে পুরনো শত্রু আবার শক্ত শেকড়সহ ডালপালা মেলে বিস্তার লাভ করছে, তখন স্বভাবতই প্রাক্তন দুঃসহ স্মৃতি নাড়া দিয়ে জেগে ওঠে এবং তাদের সন্ত্রস্ত করে তোলে পুনরায়। সেই স্মৃতিসূত্র ব্যবহার করেই শহীদুল জহির উপন্যাসটি শুরু করেছেন। বদু মাওলানার হিংস্রতার স্মৃতি জেগে ওঠে তার সন্তানের কণ্ঠস্বর শুনে। সেই আগুনঝরা দিনের যে দৃশ্য প্রথমেই লক্ষ্মীবাজোরের অধিবাসীদের স্মৃতিসূত্র ধরে লেখক উপন্যাসে তুলে আনেন তা হলো বদু মাওলানা কর্তৃক মানুষের মাংস কাককে খাওয়ানোর: "লক্ষ্মীবাজারের লোকদের মনে পড়ে, একাত্তর সনে বদু মাওলানা নরম করে হাসত আর বিকেলে কাক ওড়াত আকাশে। এক থালা মাংস নিয়ে ছাদে উঠে যেত বদু মাওলানা আর তার ছেলেরা। মহল্লায় তখনো যারা ছিল, তারা বলেছিল, বদু মাওলানা প্রত্যেকদিন যে মাংসের টুকরাগুলো আকাশের দিকে ছুড়ে দিত, সেগুলো ছিল মানুষের মাংস।"[৫] ১৯৭১ সনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসরদের সম্মিলিত হত্যাকাণ্ডে কী পরিমাণ মানুষ অমানুষিক কায়দায় প্রাণ হারিয়েছিলো, কেমন নৃশংসতার সঙ্গে তারা মানুষকে জন্তু-জানোয়ারের খাবারে পরিণত করেছিলো, লেখক উপন্যাসের প্রথমেই সেই বর্ণনা দিয়ে একাত্তর সনের মুক্তিযুদ্ধের সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে প্রবেশ করেছেন।

ধর্মের দেশবিভাগের পূর্বে ও পরে এদেশে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের অবভাস জিইয়ে রাখা হয়েছিলো।একাত্তরে তা চরমভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। হিন্দুদের ষড়যন্ত্র থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা

করার দৃঢ় সংকল্পে জেগে উঠেছিলো পাকিস্তানি শাসক ও পাকিস্তানপন্থিরা। কওমের অখণ্ডতা রক্ষার নামে পাকিস্তানের পরিচালিত এই যুদ্ধের নির্মমতা যে খাঁটি মুসলমানকেও হতবাক করে দিয়েছিলো, লেখক সেই প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন 'মহল্লার সবচাইতে প্রাচীন মুসলমান পরিবারটির প্রধান খাজা আহমদ আলী'র বিস্ময় ও ভয়ের বর্ণনার মাধ্যমে; যে অভিজ্ঞতা তাকে স্তব্ধ করেছিলো সেটি হলো সেই ছিটিয়ে দেয়া মাংসখণ্ডগুলোর একটি খণ্ড যখন আহমদ আলীর পায়ের কাছে পড়ে এবং সে আবিষ্কার করে এটি কোনো মহিলার নাকের মাংস। যা তাকে স্তব্ধ ও ভীত করে দেয়– "সেই বিকেলে মাংসটুকরোটি হাতে তুলে নিয়ে তিনি দেখেন যে, সেটার গায়ে ছোট্ট মসুরের ডালের মতো একটি পাথরের ফুল। তিনি হাহাকার করে ওঠেন, দুহাতের অঞ্জলিতে টুকরোটি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে বড় ছেলে খাজা শফিকের সহায়তায় সেটা দাফন করেন নিজের বাড়ির অঙিনায়। তারপর মাগরিবের নামাজ পড়ার সময় তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। একটি অদেখা মেয়ের জন্য লক্ষ্মীবাজারের এক বিষণ্ন বৃদ্ধের হৃদয় সেদিন ভেঙে পড়ে।"[৬] এই মাংসকাণ্ডের গল্প করতে গিয়েই তিনি এই যজ্ঞে দুর্ভাগ্যক্রমে জড়িয়ে পড়া মানুষগুলোর প্রসঙ্গ আনেন, যারা ঘটনাক্রমে বদু মাওলানার প্রতিশোধের হিস্যায় পড়ে যায়। সেই অদেখা মেয়ের জন্য খাজা আহমদ আলীর কান্নার পাশাপাশি তিনি বর্ণনা করেন আবু করিমের বড় ছেলের হারিয়ে যাবার কথা, যে কিনা এক টুকরা মাংস পেয়েছিলো কুড়িয়ে, মানুষের পায়ের নখের টুকরা। তিরি বর্ণনা করেন জমির ব্যাপারির কুয়োতলায় পৌঁছে যাওয়া আরেক টুকরা মাংসের বিবরণ, যেটি জমির ব্যাপারি পরেরদিন ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো বদু মাওলানার বাড়িতে এসে এবং সেই ফিরে পাওয়া মাংসের টুকরাটি ছিল একজন মুসলমানের শিশ্নের খণ্ডাংশ, যেটি সনাক্ত করায় বদু মাওলানা তার দ্বিতীয় স্ত্রী লতিফাকে পরপুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রয়েছে সন্দেহে সেই রাতেই তালাক দেয় এবং সকাল বেলা বের করে দেয় বাড়ি থেকে।

একদিকে বদু মাওলানা ও তার সহচরদের হিংস্র অবস্থিতি, অন্যদিকে সন্ত্রস্ত সাধারণ মহল্লাবাসী এবং তাদের ব্যক্তিজীবনের হেনস্থাবস্থা– এই দুইদিকের মধ্যস্থ শক্তি হিসেবে খাজা আহমদ আলীর পরিবার এবং মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার গল্প লেখক আয়োজন করেছেন এই উপন্যাসে। খাজা পরিবার ব্যতীত মহল্লার হিন্দু-মুসলিম সকল পরিবারের গল্প লেখক একক রেখায় বিন্যস্ত করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকটা প্রান্তিক অবস্থানের একটি পরিবার – একজন ভুক্তভোগী স্মৃতিকাতর চরিত্র আবদুল মজিদের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করে শহীদুল এই আখ্যান ফেঁদেছেন। বস্তুত, ক্ষমতাকেন্দ্রের কোনো প্রকার অবস্থান না-পাওয়া এই বিশেষ শ্রেণি; যারা রাষ্ট্রের শুধু অর্থনৈতিক আয়োজনে যুক্ত রাখে নিজেদের– তারা, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রের স্বাধীনতার দাবিতে সংঘটিত জনযুদ্ধে সমান হিস্যার দাবিদার উঠেছিল ১৯৭১ সনে– সেই শ্রেণির এক ভুক্তভোগী চরিত্রের প্রেক্ষণ-কথনে

শহীদুল জহির মুক্তিযুদ্ধের আরেকটি নতুন রূপ যেন তুলে ধরতে চেয়েছেন। ইতিহাসের সেই ক্রান্তিলগ্নে এই শ্রেণির জীবনে নেমে আসা শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞতার বয়ান যেন এটি, এখানে কুণ্ডলায়িত তাদের ব্যক্তিজীবনের অভিঘাতসমূহ। সেই সূত্র ধরেই উপন্যাসের সূত্রধার আবদুল মজিদের ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার দৃশ্যমালা পাওয়া যায় উপন্যাসে। জানা যায়, কৈশোরে দেখা মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধীদের অনাচার, তাদের পরাজয় – এসবের পর সেই পরাজিত শক্তি আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না – এই প্রত্যয়ে স্থির থেকে স্বপ্ন বুনে বুনে সসংসার দিন কাটাচ্ছিল এই আবদুল মজিদ। তারপর দেশে সমরশাসন এলো পরপর কয়েকবার; ধাক্কা খেলো স্বপ্ন; তবুও স্বাধীনভাবে বেঁচে থেকে দিন কাটানোর হঠাৎ বিরতিতে সে যখন দেখে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করার জন্য একাত্তরের সেই পরাজিত শক্তির সঙ্গে বিজয়ীদের কেউ কেউ হাত মেলাচ্ছে, পরাজিতের জয়ধ্বনিসূচক ধ্বনিও সে আওড়াচ্ছে জয়ীর মতোই সহুঙ্কারে, তখনই সে ভেঙে যায় এবং আবিষ্কার করে যে, " কৈশোরের আতঙ্কের সেই দিনে সে যে বিষয়টি বাদ দেয়ার কথা বলেছিল সেটা কোনোভাবেই বাদ হয়ে যায় নাই এবং তাই, পনের বছর পর সেই একই আলখাল্লা পরা বদু মাওলানার ছেলে, খায়ের মাওলানার কথা শুনে রায়সা বাজারে বাজার করতে যাওয়া ত্যাগ করে সে ছেঁড়া স্যান্ডেল হাতে বাসায় ফিরে তার স্ত্রী ইয়াসমিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।"[৭]

অতঃপর তার পুরনো স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে– 'সে দেখে ইয়াসমিনের শীর্ণ গ্রীবার গোড়ায় একটি শিরা দপদপ করে, সে সেখানে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে; মোমেনার গলার পাশে এই জায়গায় বেয়নেট গেঁথে দেয়া হয়েছিল।' মোমেনা তার বোন। মাতৃসমা বোন। মুক্তিযুদ্ধের করুণতম অভিজ্ঞতা তার। যুদ্ধশেষে যে বোনের লাশ সে শনাক্ত করে নিয়ে এসেছে, সেই বোনকে বদু মাওলানা যে অপমান করেছিলো সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার আগেই পুনরায় বদু মাওলানারআঘাতেই মৃত্যু হয়েছে যে বোনের, মোমেনা সেই বোন। তীব্র ঘৃণা সত্ত্বেও সামান্য 'মান্দারপো' গালিটাও যাকে দিতে পারেনি আবদুল মজিদ, যুদ্ধে সেই মাওলানা পরাজিত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের দুই বছর পর মাওলানার পুনরাভিষেক এবং মাত্র পনের বছরের মধ্যে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির সমর্থন পেয়ে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে বুক ফুলিয়ে সবাইকে 'ভাইসাব' বলে সম্বোধন করার স্পর্ধা তাকে আবার কোনো অনাগত বিষাদের ব্যাপারে চিন্তিত করে তোলে। তাই স্ত্রী "ইয়াসমিনের বাহুর ভেতর নিজেকে সমর্পণ করে সে সুস্থির হতে চায়, এই দ্যাশের মাইনষেরে এ্যলায় বদু মাওলানার পোলায় কয়, ভাইছাব। কয়, আপনেগো ধন্যবাদ। জ্বরাগ্রস্তের মতো আবদুল মজিদ ইয়াসমিনের গলা জড়িয়ে ধরে 'আপা, আপা' বলে ফোঁপায়।"[৮] পুরনো শত্রুদের পুনরায় অধিষ্ঠিত হতে দেখে মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী নেতা আজিজ পাঠানের কাছে যায় কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে শত্রুর সাথে মিলতে বাধ্য

আজিজ তাকে কোনো সদুত্তর দিতে পারে না। রাজনৈতিক ভরসার জায়গাটি থেকে সে আজিজের বিচ্যুতি অনুভব করে এবং পুনরায় ভগিনীহারা বালকের মতো প্রতিশোধ নিতে না পারার গ্লানিতে স্মৃতিকাতর হয়ে ওঠে। এর ঠিক ছয় মাস পর নিজের সদ্যভূমিষ্ঠ কন্যার নাম যখন স্মৃতিতে সদাজাগর বোনের নামে 'মোমেনা' রাখে তখন সে পুনরায় শত্রুর শাসানিতে পড়ে যায় বদু মাওলানা যখন আবার সেই দৃষ্টিতে তাকে বলে, "বইনের নামে নাম রাকছো, বইনেরে ভুলো নাইকা?"[৯]

বস্তুত বোনের সেই স্মৃতি আবদুল মজিদের পক্ষে কখনোই ভোলা সম্ভব নয় এবং সে এটিও বুঝতে পারে যে, বদু মাওলানাও সেই ঘটনা ভোলেনি। অতএব শত্রুতা জিইয়ে আছে এখনও, এবং মনে করে এই পুনরুত্থানের কালে বদু মাওলানা বা তার উত্তরপুরুষ দ্বারা সেই ক্ষতির শিকার হতে পারে আবদুল মজিদের পরিবারের যে কেউ। এমতাবস্থায় লক্ষ্মীবাজার মহল্লা ছেড়ে যাওয়া ছাড়া সে কোনো পথ পায় না সম্ভাব্য ক্ষতি এড়াবার। পরিবারের সবার সাথে কথা বলে মনে হয় "এটাই একমাত্র যৌক্তিক সিদ্ধান্ত। প্রথমত, সে চায় না, তার মেয়েটি তার বোনের মতো বদু মাওলানা কিংবা তার ছেলেদের জিঘাংসার শিকার হোক এবং তার মনে হয় বাস্তবতা এভাবে এগোলে এরকম যে ঘটবে না তা কেই বা বলতে পারে না। তার মনে হয় বদু মাওলানা একাত্তর সনের সেই একই রাজনীতির চর্চা করে এবং সে এখনো জানে আবদুল মজিদ এবং তার পরিবার মোমেনার মৃত্যুর জন্য এখনো তাকে ঘৃণা করে।"[১০] দেশীয় রাজনীতির বাস্তবতায় শত্রুর পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় এভাবেই আবদুল মজিদ ও তার পরিবারের জীবন সংশয়াপন্ন হয় এবং এরপর মাত্র এক বছরের মধ্যে ১৯৮৬ সনে পিতৃভিটে ছেড়ে দিয়ে মহল্লা থেকে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায় তারা।

লক্ষণীয় যে, যুদ্ধচলাকালে মার্চ মাসের শেষ কয়েকটি দিন ব্যতীত কোনো সময়েই আবদুল মজিদ মহল্লা ছাড়েনি, দেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রতিকূল বাস্তবতায়, মূলত রাজনৈতিক বিরূপ-বাস্তবতায় নিপতিত হয়ে, উত্তর পুরুষকে সম্ভাব্য সংঘাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সে পিতৃভিটে বিক্রি করে দিয়ে সপরিবারে সেই শত্রুব্যুহ ছাড়তে বাধ্য হয়। পিতৃভিটে থেকে উন্মূল হয়ে আবদুল মজিদের চলে যাওয়ার মাধ্যমে লেখক বাংলাদেশে স্বাধীনতা-পরবর্তী একটা রাজনৈতিক সংকটসময়ের ছবি এঁকেছেন, যখন শত্রু-মিত্রতে কোনো ভেদ দৃষ্ট হয় না এবং মিত্র-ভাব-অবলম্বী জীবন কল্পনা যে পরিস্থিতিতে অসম্ভব। স্বাধীনতাকামী একজন অস্তিত্বপরায়ণ মানুষের কাছে সেটিই হয়ে ওঠে ভয়ালতম পরিস্থিতি এবং তাকে অন্যত্র অন্যভাবে জীবন সাজানোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেই সিদ্ধান্তের পেছনে ক্রিয়াশীল থাকে এমন এক সঙ্কটাপন্ন অনুভূতি, পূর্ব-অভিজ্ঞতার ফলে যা সহসা কার্যকর হয়ে ওঠে এবং অস্তিত্ব কাঁপিয়ে দেয়। কিন্তু সবার বেলায় তেমনটা ঘটে না। এই সত্য কার্যকর বলেই

সেদিন শত্রুদের সাথে হাত মেলাতে কার্পণ্য করে না বিশ্বস্ত নেতৃত্বের দলটি – রাজনীতি এগিয়ে যেতে থাকে, এগিয়ে যেতে থাকে মানুষের সামষ্টিক জীবন। তাই, লেখকের বর্ণনায়: "মহল্লার লোকেরা তাদের (মজিদদের) এই আচরণে প্রথমে হয়তো বিস্মিত হয়; তবে একসময় তারা হয়তো বুঝতে পারে, কেন আবদুল মজিদ মহল্লা ছেড়ে চলে যায়, অথবা এমনও হতে পারে যে, আবদুল মজিদের এই সংকটের বিষয়টি মহল্লায় এবং দেশে হয়তো কেউ-ই আর বুঝতে পারে নাই।"[১১]

আবদুল মজিদের এই মহল্লা ত্যাগ করে উন্মুল হয়ে যাবার মূল-আখ্যান ছাড়াও সামষ্টিক জনতার মহল্লাভিত্তিক যে কৌম জীবন, এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সেই তাণ্ডবলীলায় কুণ্ডলি পাকিয়ে যাওয়া যৌথ জীবনের কিছু উপকাহিনিও এই আখ্যানভুক্ত করেছেন ঔপন্যাসিক। স্বতন্ত্র তন্তুর ন্যায় সেই কুণ্ডলিতে পাওয়া যায় মোহাম্মদ সেলিম ও মায়ারাণীর অসমাপ্ত প্রেমাখ্যান; বদু মাওলানার সন্তান বাশারের ক্লৈব্য আবিষ্কার ও তৎপরবর্তী ইসমাঈল হাজাম ও গণি রাজাকারের দ্বৈরথের উপাখ্যান, তদুপরি রাজনৈতিক পালাবদলে আবদুল আজিজের পরিবর্তন এবং খাজা আহমেদ আলির পারিবারিক বিসর্জনের আখ্যানাংশ। বস্তুত পক্ষ-বিপক্ষ দলের একদিকে বদু মাওলানা এবং অপরদিকে আবদুল মজিদ – এ-দু'য়ের মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের অস্থির সময়ে গড়ে ওঠা দ্বৈরথ-ই উপন্যাসকে প্রাণবন্ত করেছে এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী পনের বছর পর্যন্ত কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ফলত 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' শুধু মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস হিসেবে নিজের পরিচয় আটকে রাখেনি, হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের পঁচাত্তর-পরবর্তী দেড় দশকের রাজনৈতিক বাস্তবতার আখ্যান। যে আখ্যানে লেখক দেখিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে জয়ী একটি দলের শুধু রাজনৈতিক সফলতা অর্জন-হেতু নৈতিকতার ঐতিহাসিক পতনের দৃশ্য। যে দৃশ্য আবদুল মজিদের মতো লোকদের সংকটগ্রস্ত করে তোলে এবং উন্মুল হতে বাধ্য করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেপাকিস্তানি মিলিটারিদের সহায়তায় নিজেদের মহল্লার সকলের উপর অত্যাচারের যে বীভৎসতা চালায় বদু মাওলানা, তাতে মহল্লার সকলের একমাত্র শত্রু হয়ে দাঁড়ায় সে। তখন আবদুল মজিদ একটি গৌণ চরিত্র কিন্তু সকল ঘটনার প্রত্যক্ষ ফলভোগী। সে মোমেনার ভাই হিসেবে ফলভোগী, মোহাম্মদ সেলিম এবং মায়ারাণীর মধ্যকার সম্পর্কসূত্র হিসেবে ফলদর্শী এবং বোনের অপমানের প্রতিশোধ না নিতে পারার আত্মদহন-সূত্রে বদু মাওলানার প্রতিপক্ষ। কার্যত যুদ্ধশেষে সে বেঁচে থাকে ওইসকল চরিত্রের উত্তরাধিকার হিসেবে এবং দেশের বিরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পড়ে পুনঃক্ষমতাপ্রাপ্ত বদু মাওলানাদের পুরনো শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে নিজের উত্তরাধিকারদের ভবিষ্যৎকালীন সংকট চিন্তায় নিপতিত হয়ে।

আখ্যানের ডালপালা বিস্তারের বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও লেখক উল্লিখিত দ্বৈরথকেই কেন্দ্রে রেখেছেন এবং কোথাও সামান্যতম বিচ্যুত হননি নিজের সংকল্পে। মহল্লার নির্যাতিত প্রতিনিধি আবদুল মজিদের স্মৃতিসূত্র থেকে বর্ণিত হওয়ায় সেই উপকাহিনিগুলো আবদুল মজিদের আখ্যানের সাথেই নিজেদের গল্প বর্ণনা করেছে, নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে স্বতন্ত্র কোনো আখ্যান রচনা করেনি; তাতে করে মূল গল্পধারাটি আরো যৌক্তিক ভিত্তি পেয়েছে। পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার সহযোগে বদু মাওলানা যে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় পুরো মহল্লাব্যাপী, তাতে সবাই আক্রান্ত হয়; বিপর্যস্ত হয় সবার জীবন; সেই বিপর্যয়ের সুযোগে বদু মাওলানা নিজের সকল ব্যক্তিগত শত্রুতার প্রতিশোধ নিয়ে নেয়। সেই প্রতিশোধের রোষ থেকে তের বছরের বালক আলাউদ্দিন যেমন রেহাই পায় না, তেমনি যুদ্ধ শেষ হয়ে এলেও মোমেনা রক্ষা পায় না তার দুষ্টদৃষ্টির কবল থেকে। এবং এমনি রোষের শিকার আরও ছাপ্পান্নো জন মৃতের খুলি আবিষ্কার করে রাজাকার আবদুল গনির স্বীকারোক্তি মোতাবেক। এইসব বদনসিব মানুষ কোনো না কোনো সূত্রে বদু মাওলানার একচ্ছত্র আধিপত্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো যুদ্ধের সময়; ফলে তাদের এই পরিণতি মেনে নিতে হয়। মুসলিম কওমের অখণ্ডতা রক্ষায় অবশ্য কর্তব্য হিসেবে বদু মাওলানা এই হত্যাকাণ্ড চালায় এবং বিভিন্ন সূত্র ব্যবহারে শত্রু চিহ্নিত করে। তন্মধ্যে দুটি সূত্র হচ্ছে অমুসলিম বা হিন্দুয়ানি এবং অপরটি বাঙালির সংস্কৃতিচর্চা। সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালির কতিপয় লক্ষণের মধ্যে সঙ্গীত ও পুষ্পপ্রীতি অতি সাধারণভাবেই চর্চিত ছিলো। তুলসি গাছ শুধু বাঙালি হিন্দুর উপাস্য বৃক্ষমাত্র ছিলো না, সর্বস্তরের বাঙালি তাকে গণ্য করতো ঔষধি বৃক্ষ হিসেবে; কিন্তু স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে অতিমাত্রায় শুদ্ধতাকামী কওমভাজন ধর্মধ্বজীমুসলিমদের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিরোধিতার নামে সর্বসঙ্গীতের প্রতি যে কুরুচিপূর্ণ ধারণা সৃষ্টি হয় তা ১৯৭১ সনে আরও প্রকট রূপ ধারণ করে এবং তুলসি গাছ ও জবা ফুল হয়ে ওঠে হিন্দুয়ানির জোরালো চিহ্ন।

ঐতিহাসিক বাস্তবতার এই চিহ্ন দুটি শহীদুল জহির এই উপন্যাসে খুব দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। প্রথমত, বাসন্তী গোমেজের কাছে সঙ্গীত শিক্ষায় নিযুক্ত মোমেনা একদিন এই সঙ্গীতের কারণে বদু মাওলানার বাজে উক্তির শিকার হয়ে ঘরে ফেরে এবং কান্নায় ভেঙে পড়ে; উপরন্তু শত্রুতার প্রথম ধাপে নিপতিত হয় সে। অতঃপর একদিন বৃষ্টিক্লান্ত সন্ধ্যায় রাজাকার আবদুল গনি মায়ারাণীদের বারান্দার উপরে থাকা তুলসি গাছটার পাতা চিবুতে চিবুতে বদু মওলানার সামনে হাজির হলে মওলানার প্রশ্নের জবাবে সে তুলসি পাতা চিবানোর কথা বলে, তখন এই হিন্দুয়ানির চিহ্ন সম্পর্কে বদু মওলানা সচকিত হয় এবং মহল্লার সকল বাড়ি থেকে তুলসি গাছ তুলে ফেলার হুকুম দেয়। এতে সম্প্রদায়-অবমাননার মতো কাজে সে লিপ্ত হয় এবং সেই কাজের সূত্র ধরে মোমেনাদের বাড়ির জবা ফুল গাছটিও উপড়ে ফেলতে নির্দেশ দিলে মোমেনার বাধার শিকার হয়। ফলত, মোমেনা

তার শত্রুতার খেলায় সরাসরি জড়িয়ে পড়ে। তারপর মওলানার নালিশের পরিপ্রেক্ষিতে মাকরানি লেফটেনান্টের অপারেশন থেকে বেঁচে গেলেও মোমেনার শেষরক্ষা হয় না। ছাইয়ের গাদায় বা চৌকির তলায়, যেখানেই তাকে লুকিয়ে রাখা হোক, ডিসেম্বরের ১০ তারিখ তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শেষে আবদুল মজিদ রায়েরবাজারের বধ্যভূমি থেকে তার ক্ষত-বিক্ষত লাশ উদ্ধার করে। বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতি পালনকারী এই চরিত্রের প্রতি শেষপর্যন্ত রাজাকারদের নজরদারি এবং তুলে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে শহীদুল জহির যেন প্রতিভাসিত করেন শহীদ বুদ্ধিজীবীদের গুম-খুন হয়ে যাবার একেকটি আখ্যানের নমুনা। এভাবেই মহল্লার গণশত্রুতে পরিণত হয়ে যাওয়া বদু মওলানা চিহ্নিত হয় এই উপন্যাসে। কিন্তু যুদ্ধজয়ের সুসংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছানোর আগেই শত্রু অদৃশ্য হয়ে যায়; তার অনুপস্থিতিতে তারই আলখাল্লা প্রভৃতি পুড়িয়ে নিজেদের ক্ষোভের প্রশমন ঘটায় মহল্লাবাসী।

যুদ্ধ শেষ হলেও বদু মওলানা ও আবদুল মজিদের আখ্যানে ইতি টানেন না লেখক। যুদ্ধজয়ের দুবছর পর স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রতি বঙ্গবন্ধু-কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা ঘোষিত হলে বদু মওলানার পুনরুদয় ঘটে মহল্লায় এবং পুনর্বাসিত হবার জন্য সবার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে। সন্তান-হারা মায়েরা তাকে ক্ষমা করে না, উপরন্তু আলাউদ্দিনের মা ঝাঁপিয়ে পড়ে মওলানার ওপর। এই প্রতিশোধ-স্পৃহা সম্ভবত চলতেই থাকতো যদি না আজিজ পাঠান তাকে অভয় দিতো। সর্বোচ্চ নেতা যাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন তাদের সুযোগ দেয়ার ঔচিত্যবোধে পাঠান বদু মওলানাকে ছেড়ে দেয় আজিজ পাঠান। অতঃপর বাংলাদেশের ইতিহাসে বদু মওলানাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ১৯৮০ সনে বদু মওলানা তার পার্টির ভারপ্রাপ্ত 'আমির'কে সংবর্ধনা দিয়ে বড় নেতা হয়ে ওঠে এবং তারপর তার পুরনো ইতিহাসকে মুছে ফেলতে তৎপর হয়; চলতে থাকে ইতিহাস-বিকৃতি। বাংলাদেশের ইতিহাস বিকৃত করার সেই প্রচেষ্টায় সে আজিজ পাঠানকে পরিণত করে গ্রিক বীর আলেকজান্ডারে এবং নিজেকে আলেকজান্ডারের সামনে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী রাজা পুরু হিসেবে চিহ্নিত করে আরেকজন বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সে লোকজনকে বলে বেড়ায় সেই কাহিনি: "বীর রাজা পুরুর মতো সে বিজয়ী আলেকজান্ডারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সে দেখেছিল যে, আলেকজান্ডাররা সবসময় পুরুদের সঙ্গে একই ব্যবহার করে; কারণ একমাত্র বীরই চিনতে পারে বীরের লক্ষণ সকল।"[১২] এই বিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে সে যুদ্ধের পর ধরা পড়ে মারা যাওয়া রাজাকার আবদুল গনিকে দিতে চায় 'শহিদে'র মর্যাদা। ভিক্টোরিয়া পার্কে সমবেত মানুষদেরকে সে পার্কের বেঞ্চি দেখিয়ে বলে যে, "ওই বেঞ্চের ওপর আবদুল গনি শহীদ হয়েছিল", কিন্তু উপস্থিত জনতা ভাবে যে সে অন্য কোনো গনির কথা বলছে। উপরন্তু যুদ্ধকালীন মহল্লার সবচেয়ে স্থিতধী অভিভাবক, দেশপ্রেমিক খাজা আহমেদ

আলীকে 'মোনাফেক' বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পিছপা হয় না। তারপর উপস্থিত হয় বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো সরকারবিরোধী আন্দোলন। আর সে সময়টাকেই নিজেদের শক্ত মাটি পাবার উপলক্ষ হিসেবে নেয় তারা। সরকার পতনের লক্ষ্যে ইতিহাসের সবচেয়ে বিরুদ্ধস্বভাবী দুটি দল জোট বাঁধে; আর তখনই 'রাজনীতিতে শেষকথা বলতে কিছু নাই' নামক একটি ভ্রষ্ট বিশ্বাসকে রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এতে নৈতিক পরাজয় ঘটে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির। 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' সেই নৈতিক পরাজয়ের আখ্যানেতিহাসও বটে। ফলত, সংকটসম্ভাবনা সূচিত হয় আবদুল মজিদের মতো স্মৃতিরক্ষক ও অস্তিত্বভাবুক চরিত্রসমূহের জীবনে; তারা পিতৃভিটে থেকে স্বেচ্ছায় উন্মূল হয়ে যায়।

ইতিহাস, রাজনীতি ও জীবনের সামগ্রিক বাস্তবতার আখ্যান রচনা করতে গিয়ে আখ্যানবৃত্ত-বয়ন ও বয়নের ভাষা-পরিকল্পনায় চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন শহীদুল জহির। স্মৃতিসূত্রে বর্ণিত আখ্যানে সময়ের ক্রমকে ইচ্ছামতো ভেঙেছেন, বর্তমানে থেকেও পরিবেশ প্রতিবেশের উদ্দীপনে এবং চরিত্রসমূহের প্রক্ষেপণ-পরিচর্যায় যখন তখন অতীতগামী হয়েছেন। অতীত ও বর্তমান এখানে পরস্পরকে ভেদ করা সেলাইয়ের ফোঁড়ের মতো। উপন্যাসের ঘটনা মাত্র এক বছরের, কিন্তু স্মৃতি-সূত্রে তা ১৫/১৬ বছর ব্যাপৃত। সময়ের স্বাভাবিক পরিবর্তনের যুক্তি ধরে মুক্তিযুদ্ধকালের কিশোর আবদুল মজিদ যুবক হয়েছে, বাবা হয়েছে। রাজনীতিতে সাফল্যের ক্রম ধরে আজিজ পাঠান ও বদু মওলানা দুজনেই বড় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঘটনার ঐক্য বজায় রেখেই একজন সাধারণ ক্ষমালব্ধ শত্রু ও তার উত্তরাধিকারেরা পুনরায় শত্রুশক্তি রূপে আবির্ভূত হয়েছে এবং হয়তো লেখক শেকসপিয়রীয় ট্রাজেডির সূত্র ধরে এগিয়েই, নিজেদের কর্মফল নিজেদের কেমন গ্লানিকর যন্ত্রণায় নিপতিত করে তা দেখিয়েছেন।

ঘটনাস্থলে মানচিত্র ব্যবহারে জহির এতোটাই দক্ষতা দেখিয়েছেন যে, উপন্যাসের বর্ণনা পড়েই ধারাবাহিকভাবে ১৯৭১ সনে মার্চ-পরবর্তী পুরান ঢাকার দ্বন্দ্বসংকুল অঞ্চলগুলো পরিদৃষ্ট হয়। উপদ্রুত বিভিন্ন মহল্লার সামষ্টিক জীবনের বিধ্বস্ত রূপ বর্ণনায় তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে একজন সমাজতাত্ত্বিক হয়ে উঠেছেন। সমাজের স্তরক্রম-অনুযায়ী চরিত্রগুলোর মনস্তত্ত্ব এবং যুদ্ধ ও জীবন সম্পর্কিত অনুভূতি ও তাদের কৃত্যসমূহের সবিশ্লেষ উদ্ধারণে সেই জ্ঞান কাজে লাগিয়েছেন দক্ষতার সঙ্গে; তৈরি করেছেন চরিত্রসমূহের স্বরভিন্নতার সমাবেশ; সেই সূত্রে আবদুল মজিদ, মোমেনা, মোমেনার মা, কিশোর আলাউদ্দিন, আলাউদ্দিনের মা, মোহাম্মদ সেলিম, মায়ারাণী মালাকার, ইসমাইল হাজাম, খাজা আহমেদ আলি, আজিজ পাঠান, রাজাকার আবদুল গনি, বদু মাওলানা প্রমুখ

প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। এক মুহূর্তের উপস্থিতি সত্ত্বেওপ্রতিবাদী কিশোর আলাউদ্দিন আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের হাড্ডি খিজিরকে স্পর্শ করেছে। উপন্যাসে এদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত দ্বান্দ্বিকতা এবং শ্রেণিগত দ্বান্দ্বিকতা সমানতালে ক্রিয়াশীল থেকে আখ্যানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে- যা উত্তরাধুনিক আখ্যান শৈলীর শর্তসমূহকে দৃশ্যমান করে তোলে। একই সমাজভুক্ত হওয়ায় চরিত্রগুলোর মৌখিক ভাষায় কোনো প্রভেদ দৃষ্ট হবার কোনো ছিলো না আখ্যানে, কিন্তু ক্ষমতাকাঠামোয় অবস্থিত শ্রেণির চরিত্র ফুটে উঠেছে সেই মৌখিক ভাষায়।

উপন্যাসের বর্ণনভাষ্যে শহীদুল জহির চমক সৃষ্টি করেছেন । এই বিশেষ ভাষারীতি মূলত জহিরীয় বিশেষত্ববাহী– যা তাঁকে নব্বই-পরবর্তী বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একটি বাক্যে প্রচুর সংযোজকমূলক অব্যয় পদ ও সাপেক্ষসর্বনাম ব্যবহার করে তিনি যৌগিক বাক্যের এমন জাল তৈরি করেছেন, যেখানে আবদ্ধ হয়ে পাঠক একটি প্রবহমান আবর্তে ঘুরতে থাকে এবং একটি ঘটনার সঙ্গে খণ্ড খণ্ড ভাবে সম্পৃক্ত হতে থাকে। যেমন:

> "মৃত ব্যক্তিদের সকলে ছিল পুরুষ এবং এদের ভেতর সবচাইতে কম বয়স্ক বালকটির বয়স ছিল তেরো বৎসর এবং সবচাইতে বৃদ্ধের আশি। এদের ভেতর দুজন ছাড়া অন্য সকলকে তারা মাটির ওপর থেকে কুড়িয়ে আনে, যেন তারা ঝড়ে উৎপাটিত সেইসব বৃক্ষ সরিয়ে আনে, যেগুলো শাখা পল্লব বিস্তার করে আঙিনায় খাড়া ছিল।"[১৩]

উদ্ধৃত বাক্য দুটিতে মার্চের অভিযানে মহল্লায় মৃত সাতটি লাশ সংগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটি ব্যবহার করেছেন ওই হত্যাযজ্ঞ ও শহিদ হওয়া মানুষগুলোর গুরুত্ব বোঝাতে। ওই ঝড়টা যেন পঁচিশে মার্চের গণহত্যা; আর শাখা-পল্লব বিস্তারী বৃক্ষ হচ্ছে এতোদিন নিজেদের জ্ঞাতি ও উত্তরাধিকারের সম্পর্কে আবদ্ধ থাকা মানুষগুলো– আজ যারা মৃত। পরিস্থিতি ও ব্যক্তিত্ব বর্ণনায় শহীদুল এইরূপ ভাষা ব্যবহার এই উপন্যাসে বারংবার সুপ্রযুক্ত হিসেবে দৃষ্ট।

ফলত, উপন্যাসে প্রথমবার এসেই লেখকের বর্ণনসাফল্যে বদু মওলানা সেই ভয়াবহ যুদ্ধকালের রাহুশক্তি হিসেবে নিজেকে চেনাতে সক্ষম হয়। ১৯৮৫ সনে বদু মওলানার পুত্র আবুল খায়েরের সজ্জা দেখে সহজেই "লক্ষ্মীবাজারের লোকদের মনে পড়ে, একাত্তর সনে মওলানা নরম করে হাসত আর বিকেলে কাক ওড়াত মহল্লার আকাশে। এক থালা মাংস নিয়ে ছাদে উঠে যেত বদু মওলানা আর তার ছেলেরা। মহল্লায় তখনো যারা ছিল, তারা বলেছিল, বদু মওলানা প্রত্যেকদিন যে মাংসের টুকরাগুলো আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিত, সেগুলো ছিল মানুষের মাংস।"[১৪]

বর্ণনার এই নিহিত শক্তি তিনি কখনও প্রবলপ্রতাপে একটি শব্দেও প্রকাশ করেছেন। যেমন 'বলাৎকার' শব্দটি। পঁচিশে মার্চের ভয়াবহতম ক্র্যাকডাউনের অভিজ্ঞতায় লক্ষ্মীবাজার মহল্লার সবাই বুঝে যায় যে 'জগৎ-সংসারে একটি ব্যাপার আছে, যাকে বলাৎকার বলে।' লেখক তাদের সামষ্টিক চৈতন্যকে ব্যবহার করে বর্ণনা করছেন– "তাদের মনে হয় যে, একমাত্র মুরগির ভয় থাকে বলাৎকারের শিকার হওয়ার আর ছিল গুহাচারী আদিম মানবীর। কিন্তু পাকিস্তানি মিলিটারি এক ঘন্টায় পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে মানুষের বুনে তোলা সভ্যতার চাদর ছিঁড়ে ফেলে এবং লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা তাদের মহল্লায় মানুষের গুহাচারিতা এক মর্মান্তিক অক্ষমতায় পুনরায় অবলোকন করে; তারা মা এবং ছেলে, পিতা এবং যুবতীকন্যা একসঙ্গে বলাৎকারের অর্থ অনুধাবন করে।"[১৫] উত্তরাধুনিক বিবেচনায় শব্দের অর্থের অনির্দিষ্টতার তত্ত্ব এখানে ব্যাহত হয় এবং সকল পাত্রবিশেষে শব্দটি একই অর্থ উৎপাদন করে।

তবে আখ্যানটিকে আরও সপ্রাণ করে তুলতে তিনি সংখ্যা বা সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন নির্দ্বিধায় আর বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে ব্যবহার করেছেন বার ও তারিখ। যেমন: " ডিসেম্বরের একুশ তারিখে জিঞ্জিরায় রাজাকার আবদুল গণি ধরা পড়ে" ; "উনিশ শ আশি সনে মহল্লার লোকেরা জেনেছিল যে, এই কুকুরের মৃতদেহ বদু মাওলানার কাছে প্রিয় ছিল সাতটি মানুষের লাশের চাইতেও বেশি।"[১৬]

ভাষার প্রতি মনোযোগের পাশাপাশি আখ্যানের কিছু অংশে তিনি তৈরি করেছেন ড্রামাটিক রিলিফ; অনাকাঙ্ক্ষিত বিপর্যাস ঘটিয়ে সেসব অংশে তিনি নিহিত সত্যের উদ্ঘাটন করেছেন। যেমন– বদু মওলানার সেই আলখাল্লা সংরক্ষণ, যেটাতে ক্যাপ্টেন ইমরান তার পেশাব মুছেছিল বিধায়, মানুষ ভাবছিলো, বদু মওলানা আর সেটি পরছে না। "কিন্তু তারা পরে জেনেছিল যে, তাকে ক্যাপ্টেন ছুঁয়েছিল এই ব্যাপারটির প্রতি সম্মান দেখানো এবং স্মৃতি ধরে রাখার জন্যই সে জোব্বাটি সংরক্ষণ করেছিল।"[১৭]এখানে একজন পাকিস্তানি সেনার আরেকজন পাকিস্তানপ্রেমীর প্রতি প্রদর্শিত ভালোবাসায় অসারতা ও স্বার্থসিদ্ধির ভাবটি যেমন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তেমনি একেবারে অজ্ঞতার সঙ্গে তুচ্ছকে মহীরূহ করে তোলার ভৃত্য-মনোবৃত্তিটিও ফুটে উঠেছে। অন্যত্র তুলসি গাছ উৎপাটন করতে গিয়ে উপকারী ও ভিন্ন স্বাদের খাবার হিসেবে পাকসেনাদের তুলসি পাতা-ভোজী হয়ে যাওয়ার মধ্যেও ঘটনার বিপর্যাস ঘটিয়ে আখ্যানে চাঞ্চল্য তৈরি করেছেন জহির।

বস্তুত, ভাষা ব্যবহার ও আখ্যানবৃত্ত রচনায় উল্লিখিত সকল চমৎকারিত্ব প্রয়োগ করেই শহীদুল জহির তাঁর এই অভিনব কথাশিল্প বয়ন করেছেন, যা মূলত স্বাধীনতা-সমকালীন ও উত্তরকালীন পনের বছরের বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও রাজনীতির অভিজ্ঞতা-জাত অন্তর্দাহের বয়ান।

আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সর্বশেষ উপন্যাস হলেও মুদ্রণকাল বিবেচনায় 'আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু' শহীদুল জহিরের দ্বিতীয় উপন্যাস। 'নিপুণ' নামক সাহিত্য ম্যাগাজিনে এটি প্রকাশ পায় 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসের কয়েক বছর পর ১৯৯১ সালের জুন মাসে। লেখকের মৃত্যুর পর ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু' উপন্যাসটির গ্রন্থ-সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর বিষয় এবং ভাষাশৈলী বারংবার শহীদুল জহিরের দ্বিতীয় পর্বের গল্পসমূহের সঙ্গে সম্পৃক্তি প্রকাশ করে। দ্বিতীয় পর্বের শহীদুল জহির তাঁর গল্পে এমন এক সময়-পরিসরের বাঙালিদের নিয়ে আসেন, যখন মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন মিইয়ে গেছে জাতির জনকের হৃদয়-বিদারক মৃত্যুর ঘটনায় এবং ভয়ে কুঁকড়ে গেছে সামরিক শাসনের দীর্ঘকালীন পেষণে। কেন্দ্রীয় শাসনের জবরদখল রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে দিয়েছিলো যে রুগ্‌ণতা, শহীদুল জহির সেই অসুস্থতাক্রান্ত মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন এ-পর্বের গল্পে-উপন্যাসে। চাকরিসূত্রে লেখক নিজেও এই কালখণ্ডের অন্ধকারতম সময়ে ছিলেন সরকারের নীতি-নির্ধারণী গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। সচিবালয়ের আমলাদের জীবন 'সৎ' এবং 'অসৎ'– এই কাঠামোতেই তিনি পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন; অনুভব-সংবেদন তুলনামূলক বেশি ছিলো বলেই তিনি সেইসব জীবনকাঠামোর পরাবর্তন এবং তার নিহিত অন্তর্বেদনাকে নিজের মতো করে কাহিনিকাঠামোয় বাঁধতে পেরেছেন এবং নিজেকে রাখতে পেরেছিলেন সেই পচনকামী জীবনাভ্যাস থেকে শিল্পীর দূরত্বে। ফলত এক আমলার জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও পতনের মোটা ধাক্কাগুলো ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে শহীদুল জহির রচনা করেছেন 'আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু' উপন্যাসটি।

আয়তন-বিচারে মাত্র চার ফর্মায় মলাটবদ্ধ এই উপন্যাসটি তাঁর অন্য তিনটি উপন্যাস থেকে ভিন্ন শুধু একটি চরিত্রকে ঘিরে এ-উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত। দ্বিতীয় পর্বে শহীদুল জহির এমনকি ছোটগল্পেও যখন বিস্তৃত আখ্যান ও বহু চরিত্রের আয়োজনে মনোযোগী হয়েছেন, সেখানে এই উপন্যাসটির একক চরিত্র ঘিরে আবর্তন হওয়াটা আগ্রহের সঞ্চার করে। সেই আগ্রহের কেন্দ্রে আবু ইব্রাহীমের অবস্থান। ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে ছোট সংসারের মধ্যবিত্ত জীবন তার; তবু অন্তরে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বান্ধবী হেলেনকে না পাওয়ার বেদনা। সাধারণ মধ্যবিত্তের সকল বৈশিষ্ট্যই আবু ইব্রাহীমে বিদ্যমান কিন্তু সমস্ত পতনের ব্যূহমুখ থেকে সতর্কভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা ব্যক্তি সে। সন্তানের সঙ্গ তার ভালো লাগে, প্রকৃতির নির্জনতায় নিজের স্মৃতিতে ডুবে যেতে ভালো লাগে; নিজেকে বিশ্লেষণ করতে ভালো লাগে। নিজের অবস্থান পরিবর্তনের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তার আছে; কিন্তু সবচেয়ে শক্তভাবে আছে তার নিজের মনের জগতে সর্বদা বিশ্লেষণাত্মক এক বোধ– সে বোধ তার পরিচালন শক্তি।

এক মীমাংসিত জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছানোর পথে প্রাকপ্রৌঢ় বয়সে আবু ইব্রাহীম কিঞ্চিৎ মতিভ্রমে পথ হারায় এবং এক অযাচিত মৃত্যুকে বরণ করে লক্ষ্যচ্যুত হয়। তার এই শেক্সপিয়রীয় ট্রাজেডির আখ্যানবৃত্তই 'আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু' উপন্যাস; যদিও ঔপন্যাসিক বারংবার আবু ইব্রাহীমকে গ্রিক ট্রাজেডির নায়ক হিসেবেই আখ্যা দিয়েছেন। নিয়ন্ত্রণের বাইরের কোনো শক্তি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তার জীবনে যেভাবে ট্রাজেডি ঘটায় তার জীবনের, তাতে লেখকের বক্তব্যের সমর্থন করা যায়; কিন্তু চরিত্র হিসেবে আবু ইব্রাহীমের যে নীতি-আদর্শ থেকে ক্রমবিচ্যুতি তিনি দেখিয়েছেন, তাতে করে আবু ইব্রাহীমের স্খলন সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং গ্রিক নিয়তির তুলনায় তাকে শেক্সপিয়রীয় ট্রাজেডি-কাঠামোর সঙ্গেই বেশি মেলানো যায়। কেননা নিয়তিকে সে অস্বীকার করেছিলো অনেক আগেই, রাজনৈতিক বিশ্বাসে সে যখন মাও ৎসে তুং- কে নেতা হিসেবে মেনে তার বই পড়ে আদর্শকে আঁকড়ে ধরেছে। বস্তুত, প্রেমের ব্যর্থতা-জনিত নিষ্প্রভবোধ এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের বাস্তবায়ন না করতে পারার ব্যর্থতা – এ দুয়ের মিশ্রিত 'গ্লানিবোধ তাকে পেছন থেকে ঠেলে ধরেছে'।[১৮] ফলত, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও গুণগত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নিজেকে বিকশিত করার কোনো প্রেরণা সে পায়নি জীবনে। চাকরি আর সংসার, পাশাপাশি স্মৃতিকাতরতার ভাবাবেগ ব্যতীত তার জীবনে প্রত্যক্ষ কোনো বৈশিষ্ট্য ছিলো না। যতোটা প্রয়োজন ততোটায় সীমাবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত আবু ইব্রাহীম কার্যত অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর জন্য কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিলো না। তবু নায়কের জৈব জীবনে দুর্বলতা আসে, কর্মে ত্রুটি হয় এবং নিজের দুর্ভাগ্য মেনে নিতে হয় নিজেকেই।

অথচ কানাডীয় চিকিৎসক "নরম্যান বেথুনের মৃত্যু সম্পর্কে ... মাও সেতুং বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, কিছু কিছু মৃত্যু আছে হাঁসের পালকের মতো হাল্কা, আর অন্য কিছু মৃত্যু আছে স্থায়ী পাহাড়ের মতো ভারী। আমরা দেখব যে, লাল কালি দিয়ে এই বাক্যের নিচে রেখা টানা আছে এবং সহজেই বুঝতে পারব যে, এই কাজটি আবু ইব্রাহীম করেছে।" কিন্তু আবু ইব্রাহীমের যখন এক অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু ঘটবে, এই ঘটনার কথা মনে পড়লে মনে হবে যে, "আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছি; তার মৃত্যুর কোনো মানে আমরা খুঁজে পাব না। হাঁসের পালকের চাইতেও হাল্কা এবং তুচ্ছ এক মৃত্যুর ভেতর তাকে আমরা পতিত হতে দেখব।"[১৯] শহীদুল জহির এই মৃত্যুর আখ্যানই বর্ণনা করেছেন। প্রচলিত সমালোচনায় আবু ইব্রাহীমের এই মৃত্যুর কাহিনিকে সাযুজ্য বিচারে গাবরিয়েল মার্কেজের 'এ ডেথ ফোরটোল্ড' উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করলেও বস্তুত 'আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু' উপন্যাসের মৃত্যুকাহিনি স্বতন্ত্র। কেননা, জীবনের দিকে পরিভ্রমণ-ই ছিলো তার লক্ষ্য।

লক্ষ করলে প্রতীয়মান হবে যে আসন্ন ভবিষ্যতে কোনো প্রকার মৃত্যু-সম্ভাবনা ছাড়াই এগিয়ে যাচ্ছিলো আবু ইব্রাহীমের জীবন। কোনো সংশয়-জাগানিয়া কর্মকাণ্ড ছাড়াই ছিলো তার নিত্যদিনের পথচলা; স্ত্রী মমতার ভাষায় একটু 'পাগলামি' তার মধ্যে ছিলো, বিশ্লেষণ করলে সেটাকে মধ্যবিত্তের বুর্জোয়া মনোবৃত্তির রোম্যান্টিকতা ব্যতীত অন্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। একটু একাকিত্ব উপভোগী সে আর ফুরসৎ পেলেই যে কারো মাঝে হেলেনের ছায়া অন্বেষণ। কিন্তু " মমতা হেলেনের বিষয়টি জানত, আবু ইব্রাহীম তাকে বলেছিল।"[২০] অতএব এ নিয়ে সংসারে মনোমালিন্য ব্যতীত কোনো তিক্ততা ছিলো না। হেলেনের স্মৃতি, স্ত্রী-কন্যা-পুত্র, আত্মীয়-পরিজন, সহকর্মী সিদ্দিক হোসেন– মূলত এই ব্যক্তিবর্গ ঘিরেই আবু ইব্রাহীমের জীবন। সে জীবনে দোল দিয়ে যায় হেলেন বেড়াতে এসে এবং খালেদ জামিল নামক এক মধ্যস্বত্বভোগী। কার্যত এদের আগমনেই গল্পের সংকট ঘনীভূত হয়।

বহুদিন পর হেলেন আবু ইব্রাহীমের বাসায় বেড়াতে এলে "আবু ইব্রাহীমের নিকট অতি পুরাতন একটি সত্য পুনরায় প্রকাশিত হয়, তা হলো এই যে, হেলেনকে ছাড়া সে মরে যায়নি। তার মনে হয় যে, হেলেনের সে প্রেমিক ছিল না, পূজারী ছিল এবং হেলেন দেবীদের মতোই পূজারীকে অবহেলা করতে শিখেছিল।"[২১] কিন্তু ধীরে ধীরে দেশে অবস্থান করা দিনগুলোতে হেলেন যখন ইব্রাহীমের সঙ্গে মিশতে থাকে বেশি বেশি, তখন ঈর্ষার স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে যায় মমতার। সন্তানদের নিয়ে চলে যায় বাপের বাড়ি। মিরপুরের রূপনগরে সরকারি আবাসন প্রকল্পে জমির আবেদনের উৎসাহে একসময় মমতা ফিরে আসে।

কিন্তু হেলেন যায় না। একদিন এক বন্ধুর খালি বাসায় সময় কাটানোর ব্যবস্থা করে তারা। অথচ আবু ইব্রাহীম যখন "সম্ভাব্য ঘটনা থেকে মাত্র একটি রাত্রির ব্যবধানে দাঁড়িয়ে, সে যখন এই সত্যকে নিরাবরণ অবস্থায় নিজের সামনে স্থাপন করে, সে তখন দেখে যে, তার হৃদয় এক বেদনায় ভরে যায়; আবু ইব্রাহীম এই বেদনা নিয়ে সে রাতে ঘুমায়।"[২২] বলাবাহুল্য, আবু ইব্রাহীম এই আয়োজনে নিজের অবনমন দেখতে পায়, পূজারী থেকে ভোগীতে পরিণত হবার যন্ত্রণা তাকে বেদনার্ত করে। ফলে, সকালে সে কায়োমনোবাক্যে প্রার্থনা করতে থাকে মনে মনে, "আজকে তুমি ফিরে যাও হেলেন, মানুষকে এভাবে কখনো ফিরে যেতে হয়, একা বিষণ্ন ও আনত হয়ে, আজকে তুমি ফিরে যাও।"[২৩] কিন্তু সম-পরিমাণ যন্ত্রণাক্লিষ্ট হয়ে হেলেনও প্রস্তাবিত জায়গায় যায় না। তিন চার দিন পর হেলেনের চিঠি পায় আবু ইব্রাহীম, চিঠিতে সে লেখে যে, "আমি তোমাকে কখনো দুঃখ দিতে চাইনি ইব্রাহীম।"[২৪]

পতনের সমূহসম্ভাবনা থেকে নিজেকে ধরে রাখলেও বেদনাসিক্ততা তার হৃদয়কে আর্দ্র করে রাখে। হেলেনের চিঠি পড়ে "আবু ইব্রাহীম বুঝতে পারে যে, তার কিছু করার নেই, এবং এরপর কিছুদিন তাকে পুনরায় সেইসব গ্রিক চরিত্রের মাতো মনে হয়, যারা নিয়তি দ্বারা পীড়িত হয় এবং সেই নিয়তিকে বহন করে চলে।"[২৫] কিন্তু আবু ইব্রাহীম কোনোভাবেই গ্রিক চরিত্রের মতো নিয়তিশাসিত নয়। শুদ্ধসত্তায় উত্তরণের যে অস্তিত্ববাদী আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষাই তাকে পরিচালিত করে, একাকিত্বের মধ্যেও সে বেঁচে থাকে। সেই বেঁচে থাকায় হেলেনের অভিঘাত তাকে দুর্বল করে নিশ্চয়, তবু বাঁচার স্বপ্ন তার মরে না।

স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে গেলে আপাত ব্যর্থতাকে ভুলে শোককে গুণগত রূপান্তরের মাধ্যমে জীবনের পাথেয় করে তুলতে হয়। কিন্তু অনির্দিষ্ট কোনো না কোনো কার্যকারণ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে, প্ররোচিত করে চিন্তাসীমার রেখা অতিক্রম করতে। খালেদ জামিল এই শূন্যতায় আবির্ভূত হয়। অতঃপর, লেখক আবু ইব্রাহীমের পরবর্তী পরিণতি নির্দেশসূত্রে যোগ করেন:

> "এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে হবে যে, অন্য এক নিয়তির মতো খালেদ জামিল আবু ইব্রাহীমের জীবনে প্রকাশিত হয় এবং বস্তুত তার মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত ক্রিয়াশীল থাকে।"[২৬]

লটারিতে জমির মালিক হয় আবু ইব্রাহিম। চল্লিশ হাজার টাকা প্রয়োজন। শ্বশুর সাধলেও নিতে চায় না সে। কিন্তু একটা সিমেন্টের আমদানি-বাণিজ্যে মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে খালিদ জামিল আবু ইব্রাহীমের দারস্থ হয়। এটাই তার জীবনধারণের মাধ্যম। ইব্রাহীমকে ধরার জন্য সে বাক্যজাল রচনা করে, সর্বনিম্ন দর হাঁকা কোম্পানিকে 'প্যাকিং স্পেসিফিকেশনের' ফাঁকিতে ফেলে টেন্ডারটা পেতে চায়। দশ হাজার টন সিমেন্টে প্রায় ২০ হাজার ডলারের ব্যবসা করে মুনাফা করতে চায়, সেজন্য উৎকোচ হিসেবে নগদ ৩০ হাজার টাকাও রেখে যায় ইব্রাহীমের বাড়িতে এসে:

> "আবু ইব্রাহীম যখন টেবিলের উপর রাখা ইনভেলপটির দিকে তাকায় তখন তার দৃষ্টিতে কি ছিল, বিষণ্নতা অথবা হরষ, তা আমরা বলতে পারি না।"[২৭]

তবে হর্ষ যে ছিলো না, তা আবু ইব্রাহীমের পরবর্তী কর্মকাণ্ডেই স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা শুরু থেকেই সে নিজের পতন-ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলো, খালেদ জামিলের কাছে স্বস্তি বোধ সে করেনি একবারও। যদিও "আবু ইব্রাহীম সজ্ঞানে তার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং নির্ধারিত ঘটনাটি ঘটার জন্য অপেক্ষা করছিল; যদিও তার ভেতরে একই সঙ্গে ছিল অনভ্যস্ততার অস্বস্তি।"[২৮] এই অস্বস্তি অস্তিত্ববাদীদের কাছে আত্মপ্রক্ষালনের পূর্বশর্ত। যেহেতু "মৃত্যু আবু ইব্রাহীমের বড় অপ্রিয় প্রসঙ্গ ছিল"[২৯] সেহেতু

জীবনের পথে সাহসী পদক্ষেপই ছিলো তার আরাধ্য। কিন্তু খালেদ জামিলের উপস্থিতি ও প্রস্তাবসমূহ তাকে পুনরায় পতনের কিনারায় নিয়ে যায়:

> "আবু ইব্রাহীম দেখতে পায় যে, সে এই লোকটির বাক্যজাল ভেদ করতে পারে না। দুর্বলতা এবং পতন তাকে ক্রমান্বয়ে গ্রাস করতে থাকে সেই দিনটি পর্যন্ত, যে দিনটি সহসাই আসে এবং যেদিন সে নিজের বিশ্বাসকে পুনরায় শক্ত করে নেয়।"[৩০]

এই শক্ত বিশ্বাসের কারণেই সে টেন্ডারের কোটেশনগুলো পুনর্নিরীক্ষণ করে এবং 'প্যাকিং স্পেসিফিকেশনে'র বিষয়টি 'নেগোশিয়েটেবল' বলে নোট দিয়ে সর্বনিম্ন দর হাঁকা কোম্পানির পক্ষে থাকে এবং দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা খালেদ জামিলের কোম্পানিকে নাকচ করে দেয়। অতঃপর খালেদ জামিল কৈফিয়ৎ চাইতে এলে ইব্রাহীম তাকে নিজের কর্তব্যনিষ্ঠা ও অপারগতার কথা জানায়, "খালেদ জামিল তার এই কথা শুনে ভুল করে একটু হাসে এবং এভাবেই সে ভুল করতে থাকে, অথবা এভাবেই সে যেন এক পরিচয় থেকে অন্য এক পরিচয়ের ভেতর এসে দাঁড়ায় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে আবু ইব্রাহীম তার বিসর্জিত চেতনার প্রান্ত থেকে তাকে শনাক্ত করে।"[৩১]

এই শনাক্তিসাফল্যই আবু ইব্রাহীমকে যুদ্ধ করার শক্তি জোগায়; খালেদ জামিল তার অর্থ ফেরত চাইলে সে তাকে দু-একবার অস্বীকার করে নিজের সামর্থ্য প্রদর্শন করে। তারপর এক মঙ্গলবার জিপিওর সামনে টাকা ফেরত দিতে গেলে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে আবু ইব্রাহীম নিহত হয়। আর "এভাবে হাঁসের পালক খসে পড়ার চাইতেও হাল্কা এবং তুচ্ছ এক মৃত্যু আবু ইব্রাহীমকে গ্রাস করে এবং তাকে নিয়ে সঙ্গত কারণেই আমাদের আর কোনো আগ্রহ থাকে না; তাকে আমরা বিস্মিত(বিস্মৃত) হই।"[৩২] আদতে কেউই তাকে আর মনে রাখে না। জীবনের প্রয়োজনে, সন্তানদের ভবিষ্যৎ কল্পনায় দু বছর পর তার স্ত্রী মমতাও আব্দুল হাকিম নামক একজনের জীবনসঙ্গিনী হয়। কবরে একাকী পড়ে থাকে আবু ইব্রাহীম, শেকসপিয়রের ট্রাজেডির নায়কদের মতো নিজের কর্মক্রটিতে পড়ে গিয়েও যে নিজেকে শেষপর্যন্ত বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তির পথ থেকে টেনে এনেছিলো; কিন্তু এক বঞ্চিত শ্রেণির অথবা এক শোষক শ্রেণির ক্ষুধার প্যাঁচে পড়ে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তুচ্ছ এক মৃত্যুকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলো।

অস্তিত্বসংগ্রামী আবু ইব্রাহীমের মৃত্যুকে কেন্দ্রে রেখে শহীদুল জহির উপন্যাসটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে আবহ প্রতিষ্ঠা করেছেন তা অনন্য। সিরাজগঞ্জ শহরের কালিবাড়ি রোড়ের মমতাদের বাড়ির প্রাঙ্গণ থেকে জানাজার জন্য আবু ইব্রাহীমের লাশের খাটিয়া মসজিদের দিকে নিয়ে যাবার সময় থেকে শুরু হলেও এ গল্পের অতীত দৃশ্য মমতার স্মৃতির ফ্লাশব্যাক ব্যবহার করে শহীদুল জহির গল্পের প্রথম

দৃশ্যে ফিরেছেন। তারপর যথারীতি গল্প শেষের দিকে এগিয়ে গেছে এবং পুনরায় ইব্রাহীমের লাশের সঙ্গে সিরাজগঞ্জে ফিরে গেছে; অতঃপর দু বছরে মমতার শোকে ইব্রাহীম বেঁচে ছিলো। কিন্তু কথাকার গল্পটিকে মমতার পরিণতি দেখিয়ে তুলনামূলকভাবে আরও স্পষ্ট করে আবু ইব্রাহীমের একাকী হয়ে যাবার চিত্র এঁকেছেন।

অনুপস্থিত চরিত্রকে দৃশ্যে আসার আগ পর্যন্ত নানাবিধ রূপে হাজির করেছেন; যেমন হেলেন চরিত্রটি। দৃষ্টির সামনে পরিস্ফূট হবার আগপর্যন্ত ইব্রাহীম বারংবার তাকে আবিষ্কার করেছে, কখনও কন্যার রূপে, কখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায়, যেখানে অতীত ছিলো তার হেলেনের সঙ্গে:

> "লাইব্রেরীর এই বারান্দা, মধুর ভূতুরে ক্যান্টিন, কলাভবন, সবখানেই তার পায়ের চিহ্ন আছে এবং এখনো লাইব্রেরীর পিছনের চত্বরে পাম গাছের কাছে ঘাসের উপর দীর্ঘশ্বাসের মতো বাতাস বয়ে যায়।"[৩৩]

এতে করে চরিত্রের মাহাত্ম্য পরিষ্কার হয়ে যায় আবির্ভাবের পূর্বেই। কিন্তু খালেদ জামিলের মতো চরিত্রকে তিনি এতা বড়ো ভূমিকা দিয়ে হাজির করেন না। সর্বক্ষেত্রে এরা স্বার্থ হাসিল করতে চায়। তবে দৃশ্যে আসামাত্রই চরিত্রটি নিজের যোগ্যতা প্রকাশ করে এবং প্রতিনায়কের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। ভাষায়, ভঙ্গিমায়, চাতুর্যে ও গাম্ভীর্যে নায়কের উপর প্রায়শ প্রভাববিস্তারী এহেন খল চরিত্র নির্মাণে শহীদুল জহির সিদ্ধহস্ত; প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসে বদু মাওলানা, 'মুখের দিকে দেখি' উপন্যাসের মামুন ওরফে খরকোস ওরফে কুতুবউদ্দিন আইবেক প্রমুখ চরিত্রের নাম। তাঁর ছোটগল্প বা উপন্যাসের চরিত্রসমূহ তাই সর্বদাই স্বতন্ত্র চারিত্র্যনির্দেশী। সেই চরিত্রগুলো প্রাণবন্ত তাদের মুখের ভাষায়। জহির চরিত্রসমূহের উৎস-ভূগোলের ভাষাভঙ্গিমা দিয়ে নির্দ্বিধায় তাদের সবাক করেন; যদিও তারা মান বাঙলা ব্যবহারেও প্রায়শ সমান পটু। 'আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু' উপন্যাসের আবু ইব্রাহীম তাই বাসায় স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে সিরাজগঞ্জের লোকোচ্চারণে ভাব বিনিময় করে কিন্তু অফিসিয়ালি সে ইংরেজি ও মান বাংলা ব্যবহারে সমান পারদর্শী ; নিম্নোল্লিখিত উদ্ধৃতাংশের নিম্নরেখ বাক্যগুলো লক্ষ করলে বিষয়টি স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে:

> তারপর সেদিন বিকেলে সে(খালেদ জামিল) পুনরায় আবু ইব্রাহীমের বাসায় আসে।
>
> তদবির করতে এলেন?
>
> খালেদ জামিল তার কথায় বিব্রত হয় না, মুখের হাসি ধরে রেখে বলে, তা নয়, আছেন কেমন?
>
> আছি।

খালি ঘরে বসে থেকে দিন কাটে?

আর কি করব?[৩৪]

তবে বর্ণনার ভাষ্য ব্যবহারে এই উপন্যসে তিনি প্রচলিত প্রমিত বর্ণনকাঠামো মেনে চলেছেন– যা পরবর্তীকালে তিনি আর বজায় রাখেননি, 'মুখের দিকে দেখি' উপন্যাসের বর্ণনভাষ্য যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিষয়টি তর্কসাপেক্ষ, তবে শহীদুল জহির নিজেই এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন পরবর্তীকালে('মুখের দিকে দেখি' উপন্যাসের আলোচনায় দ্রষ্টব্য)। লেখক এই উপন্যাস পর্যন্ত সেই অংশগ্রহণ থেকে একটু দূরেই ছিলেন, ভাষার খেলায় মেতেছেন পরবর্তীকালে প্রকাশিত গল্পে ও উপন্যাসে। যার সহজ সংকেত পাওয়া যায় পরবর্তী উপন্যাস 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল'তে। বস্তুত, বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি অস্থির রাজনৈতিক সময়ের জীবন বাস্তবতায় এক আমলা, তার হৃদয়গত রোম্যান্টিক বেদনা, দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্তি এবং মুক্তিলাভের প্রাণান্তপ্রচেষ্টা দেখানোর পাশাপাশি লেখক ওই বাস্তবতার দিকেও ইঙ্গিত দিয়েছেন, যেখানে সর্বাত্মকরণে শুদ্ধতাকামী এক সংগ্রামীর মৃত্যুটাও অনিশ্চিত। এটা কোনো নিয়তি-শক্তি পরিচালিত মৃত্যু নয়, বরং সার্বিক বাস্তবতা এমন পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছে যে, যখন কোনো ইচ্ছাই স্বাভাবিকভাবে পূরণ হবার নয়। পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলো নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে নিজেদেরকেই আক্রমণের বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করে।

সে রাতে পূর্ণিমা ছিল

বিষয়, কাহিনি-কাঠামো ও পরিণতি প্রদর্শনে 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' শহীদুল জহিরের একটি উচ্চাভিলাষী আয়োজন। প্রান্তিক ভূগোলের পরিসীমায়, মেধায়-আত্মবিশ্বাসে, কৌশলে ও দূরদৃষ্টিগুণে সুহাসিনী গ্রামের ক্ষমতাকেন্দ্র হয়ে ওঠা মফিজুদ্দিনের শূন্য থেকে মহীরূহ বৃক্ষের মতো উত্থান এবং গুপ্তহত্যার শিকার হয়ে সপরিবারে নিঃশেষ হওয়ার ট্রাজিক আখ্যান এই উপন্যাস। বিশাল মহিমাগুণে একজন জননেতার প্রকৃত নেতা হয়ে ওঠার পর ক্ষমতার হাত বদল নিয়ে সম্ভাব্য যে প্রচলিত কাহিনিকাঠামো রয়েছে, সেই কাঠামো ব্যবহার করেই শহীদুল জহির নিজের গল্প ফেঁদেছেন এবং ইতি টেনেছেন একেবারে স্বকীয় ভঙ্গিমায়। দীর্ঘ জীবন নিজ মৃত্যু-সম্পর্কিত ভ্রান্ত বিশ্বাসের পতন হলে নির্দিষ্ট দিনের বহু পূর্বে এসে মৃত্যু হানা দেয় মফিজুদ্দিন মিয়াকে; রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রবল

আঘাতে সপরিবারে মৃত্যুর কাছে পরাজয় বরণ করে সে, আর সাথে সাথে একটি পরিবারের এবং সেইসঙ্গে একটি জনপদের ঐতিহাসিক উত্থানের ইতিবৃত্ত আপাত পরিণতি লাভ করে।

বস্তুত মফিজুদ্দিনের উত্থান-পতনের আখ্যান হলেও অন্যান্য ব্যক্তি-চরিত্রের আখ্যানাংশও এতে জড়িয়ে রয়েছে পরিপূরক মহিমা নিয়ে। মফিজুদ্দিনের মতো কেন্দ্রীয় চরিত্র আলোতে নিয়ে আসার আগে তার জন্মবৃত্তান্ত গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন লেখক। ভূমিহীন কৃষক আকালুর কুড়িয়ে পাওয়া কন্যাশিশু, যার কোনো নাম জানা যায়নি কখনও; সেই শিশু কৈশোরে উত্তীর্ণ হয়ে সেই পালক আকালুর স্ত্রীতে রূপান্তরিত হয়ে যে সন্তানের জন্ম দেয় সে-ই হয় পরবর্তীকালের মফিজুদ্দিন। মিয়া বাড়ির জামাতায় পরিণত হয়ে সে 'মিয়া' উপাধি অর্জন করে। এই উপাধি অর্জনের পথে মফিজুদ্দিন-চন্দ্রভানের মিলনাখ্যানও এই কাহিনিগর্ভের প্রধানতম অংশ হিসেবে লেখক তুলে এনেছেন। অতঃপর মফিজুদ্দিনের সংগ্রামকঠিন ও সাফল্যপূর্ণ জীবনের বিস্তার, সন্তানাদি, তেরো পুত্রের জন্মদান এবং সেই পুত্রসমষ্টির মধ্যে তিনটি পুত্র যথাক্রমে মোল্লা নাসিরউদ্দিন, সিদ্দিক মাস্টার এবং রফিকুলের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাংশ, বিশেষত প্রণয়ঘটিত ব্যক্তিগত বিষাদের কাহিনি জুড়ে শহীদুল জহির এই ট্রাজিক আখ্যনটিকে রূপময় করে তুলেছেন। কার্যত, পুত্রত্রয়ের জীবনে ঘটে যাওয়া এইসব কাহিনি যুক্ত করে লেখক কেন্দ্রীয় চরিত্র মফিজুদ্দিনের জীবনেরই বিস্তার দেখিয়েছেন; যার সাধ ছিলো সারাজীবন জীবনের চাষ করে যাওয়া– যদিও তৎপূর্বে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু এসে সপরিবারে তাকে বিনাশ করেছে।

শূন্য থেকে মহীরূহে পরিণত হওয়া মফিজুদ্দিনের আখ্যান বর্ণনায় লেখক স্পষ্টত দুটি পক্ষ তৈরি করেছেন; একদিকে যারা মফিজুদ্দিনের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তাকে অনুসরণ করার মৌন প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে সর্বদা, অপরদিকে মফিজুদ্দিনের বাল্যকালের ও উত্থানপর্বের বন্ধু করিম খাঁর পুত্র আফজাল খাঁ ও পৌত্র ইদ্রিস খাঁ। আঞ্চলিক রাজনীতির ক্ষমতা দখলে মফিজুদ্দিনের বন্ধুপুত্রের অভিলাষ প্রাথমিকভাবে নিবৃত্ত করতে পারলেও পৌত্রের অভিলাষ-সিক্ত কুচক্রান্ত থেকে মফিজুদ্দিন রক্ষা পায় না। ফলত ক্ষমতার হাত বদলের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের মতোই এখানে একটি উপরিকাঠামো পাওয়া যায়, যেখানে শেষপর্যন্ত মফিজুদ্দিন পরাজিত এবং সপরিবারে নিহত।

ক্ষমতাবৃত্তের অন্তরালবর্তী আর যেসকল আখ্যানাংশ লেখক 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তাতে প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠেছে মফিজুদ্দিন-চন্দ্রভান, বাজারের বেশ্যা নয়নতারা কর্তৃক মফিজুদ্দিনের জীবনদান, মহিমাপূর্ণ হয়ে উঠেছে সিদ্দিক মাস্টার-আলেকজানের মিলনকাহিনি, নাসিরউদ্দিন-দুলালির দ্বান্দ্বিক দ্বৈরথ এবং রফিকুল-জান্নাত আরার অস্পষ্ট প্রেমোপাখ্যান। এইসব উপাখ্যানে মফিজুদ্দিনের সরব ও নীরব উপস্থিতি কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে তাকে পুষ্ট করেছে, দান

করেছে বিশালত্ব; যা ছাপিয়ে উঠেছে রায়গঞ্জ, সুহাসিনী প্রভৃতি জনপদের সামষ্টিক জীবনমাহাত্ম্যকে। বস্তুত, 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' মফিজুদ্দিন মিয়ার-ই আখ্যানভুক্ত জীবনবৃত্ত।

পিতা আকালু ও বোবা মায়ের সন্তান হিসেবে অসম্ভব তেজোদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে মফিজুদ্দিন, প্রবলপ্রাণের বিচ্ছুরণে সে কৈশোরেই সাহসিকতার সঙ্গে কাজিদের পাগলা কুকুর পাল্টা ধাওয়া করে মেরে ফেলে নিজের বীরত্ব নিয়ে জনজীবনে নিজের অস্তিত্বের জানান দেয়। তার এই বীরোচিত উত্থান সহজেই জনমনে নায়কের আসন দখল করে এবং সামষ্টিক জীবনের ভাবনাপ্রবাহে জন্ম দিতে থাকে একের পর এক নায়কোচিত কল্পনার। সেই কল্পনা সত্যতার শাখাপ্রশাখা নিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে তার যাত্রাদলের সাথে পালিয়ে আবার ফিরে আসার ঘটনায়, বেশ্যা নয়নতারার চাতুর্যে ডাকাতদের কাছ থেকে জীবন নিয়ে ফিরে আসায়, নয়নতারার হাট প্রতিষ্ঠায় এবং অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে মিয়া বাড়ির কন্যা চন্দ্রভানকে বিয়ে করার সাফল্যের মধ্য দিয়ে। সামন্তীয় সমাজকাঠামোর প্রান্তবর্তী সামান্য বর্গাচাষীর পুত্র হিসেবে কেন্দ্রস্থ মিয়াবাড়ির জামাতা হিসেবে অধিষ্ঠান– রূপকথার মতো উত্থানের এই কাহিনি সহজেই তার সম্পর্কিত রহস্যময় ধারণাসমূহকে জনসাধারণের মনে সত্য-মিথ্যা মেশানো এক বিশ্বাসে পরিণত করে। মফিজুদ্দিন মিয়া সেই বিশ্বাসে বসবাসকারী এক লোকনায়ক, যার উত্থান ও পতনের সাথে পূর্ণিমারাতের মায়ামেশানো জ্যোৎস্নার সংযোগ অবিচ্ছিন্নভাবে বহমান।

প্রথম উপন্যাস 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'র মতোই শহীদুল জহির তাঁর এই দ্বিতীয় উপন্যাসের আখ্যান সাজিয়েছেন নিজস্ব ভঙ্গিমায়। স্মৃতিসূত্র ব্যবহারের সাহায্যে সিনেমা-সম্পাদনার লিনিয়ারিটিরক্ষা করে প্রাসঙ্গিকভাবে কাহিনির খণ্ডাংশগুলোর পরম্পরা বিন্যাস করেছেন তিনি। এতে প্রচলিত কাহিনি ও সময়ের ধারাবাহিক ঐক্য রহিত হয়েছে কিন্তু গড়ে উঠেছে এক বয়ানের ঘোর যাতে পাঠক সহজেই নিজেকে মানিয়ে নিয়ে ঘটনার অনুক্রমে যুক্ত থাকতে সক্ষম হয়। এক পূর্ণিমা রাতে সপরিবারে মফিজুদ্দিন মিয়া আততায়ীর হাতে নিহত হলে গ্রামের জনমহলে সে ঘটনার কীরূপ প্রভাব পড়ে এবং কীভাবে নিজেদের কথোপকথনে তার তুলে আনে মফিজুদ্দিনের উত্থান ও পতনের পূর্বাপর, সেই ভঙ্গি, যা অনেকটা আবহমান বাংলার স্বাভাবিক বৈঠকী গল্প বলার ধরনকে স্মরণ করিয়ে দেয়, সেই দেশীয় ভঙ্গিতে তিনি প্রান্তিক গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের স্মৃতিবাহিত মুখনিঃসৃত আখ্যান হিসেবে উপন্যাসের বর্ণনা শুরু করেছেন। কিন্তু এই বক্তা বা বর্ণনাকারী কোনো না কোনোভাবে বর্ণিতব্য চরিত্রের জীবনাখ্যানের সঙ্গে জড়িত। সেই সংযোগসূত্রেই সে অন্যান্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ থেকে সে স্বতন্ত্র এবং অধিক গ্রহণযোগ্য। এই যোগ্যতাবলেই গ্রামের পুরনো নাপিত, বর্তমানে মুদি দোকানদার তোরাপ আলি এই আখ্যানের পূর্বাপর বর্ণনা করে। তবে আখ্যানের সকলপ্রকার

বর্ণনাসূত্রকেই মূল চরিত্রসমূহের বা ঘটনাসমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখে লেখক এর ঘটনসত্যতার যুক্তিযুক্ত বিবরণ দিয়েছেন।

উপন্যাসের শুরুর বাক্যটি লক্ষ করলেই পরিষ্কার হবে যে, শহীদুল জহিরের লক্ষ্য ছিলো সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে আখ্যান বয়ন করা। লেখক শুরু করেছেন এভাবে:

> গ্রামের লোকদের সে রাতের চাঁদের কথা মনে পড়ে এবং তারা সেই চাঁদের বর্ণনা দেয়। আততায়ীদের হাতে ভাদ্র মাসের এক মেঘহীন পূর্ণিমা রাতে সুহাসিনীর মফিজুদ্দিন মিয়া সপরিবারে নিহত হবার পরদিন, গ্রামবাসীদের কেউ কেউ মহির সরকারের বাড়ির প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়।[৩৫]

বাক্য দুটির মধ্যে নিম্নরেখ শব্দসমূহ বিশেষ দৃষ্টির দাবিদার; যেখানে লেখক গ্রামবাংলার একটি চিরায়ত আড্ডার পরিবেশ রচনা করেছেন; একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যাবার পরের দিনে গ্রামের কেউ কেউ যেখানে জড়ো হয়ে নিজেদের সামলে নিচ্ছে এবং ঘটনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে। কিন্তু সেই সকালে তাদের মনে যখন সেই ঘটনার ত্রস্তভাব বিরাজমান এবং তারা মনে করতে পারে শুধু সেই দুর্ঘটনার রাতের ভরা পূর্ণিমার কথা, তখন ঘটনা এগিয়ে নিতে লেখক তোরাপ আলিকে নিয়ে আসেন।

তোরাপ আলি থেলো হুঁকোয় তামাক টেনে নিজের সেই রাতের অভিজ্ঞতা ও পূর্বের কাহিনি বর্ণনা করে। গ্রামের সবাই যখন জানে যে, মফিজুদ্দিন মিয়ার ১১১ বছর বেঁচে থাকার কথা থাকলেও মাত্র ৮১ বছর বয়সে সপরিবারে নিহত হয়েছে, তখন লেখক এই বয়সের রহস্য উন্মোচন করেন তোরাপ আলির মাধ্যমে। তোরাপ আলি বলে সে কীভাবে একবার চুল কাটতে গিয়ে নিজের ওস্তাদের শেখানো জ্ঞানে মফিজুদ্দিনের হাতের রেখা দেখে বুঝতে পেরেছিলো তার খণ্ডিত জীবনের কথা। তারপর "সে বলে, আমি চুল কাটা থামায়া তাকায়া থাকি, জিজ্ঞাস করি, ম্যাসার আপনের হাতের রেখাগুলান এই রকম ক্যা? ম্যাসাব বিরক্ত হয় কি না আমার কথা শুইন্যা, তা বুজিবার পারি না, কেমন গম্ভীর হয়্যা কয়, কি রকম? আমি সাহস রাইখ্যা কই, কেমন জানি গড়ায়া পইড়ত্যাছে, কি জানি বায়া পইড়ত্যাছে জমিনের দিকে মনে হয়।" তোরাপের এই সংশয় উড়িয়ে দিয়ে মফিজুদ্দিন তাকে জানায় যে, "হাতের রেখায় সে বিশ্বাস করে না" এবং তোরাপকে জানায় "আমি একশ এগার বচ্ছর বাঁচমু, এইট্যা লেখা হয়্যা আছে।"[৩৬] অতঃপর সে তোরাপকে প্রমাণ দেখায়; তোরাপ আলি বলে যে, "সে দেখতে পায় বার্ধক্যে কুঁচকে আসা নিতম্বের চামড়ার ওপর যেন কালি দিয়ে লেখা আছে ১১১"[৩৭]। এই প্রমাণ পাওয়া তোরাপ ফলত, উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলির মধ্যে কর্তৃত্ব অর্জন করে এবং সে বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গেই নিজের অভিজ্ঞতা বয়ান করে।

তোরাপের বয়ানসূত্রেই উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দেরমনে পড়ে মফিজুদ্দিনের এই দীর্ঘ জীবনলাভের যাবতীয় সূত্র এবং সেই স্মৃতিসূত্র ব্যবহার করেই লেখক মফিজুদ্দিনের জন্মকাহিনি স্মরণ করে। মফিজুদ্দিনের জন্মকাহিনি স্মরণসূত্রে লেখক সহজেই আখ্যানের সলতেপাকানো অধ্যায়ের শুরু করেন এবং শুরু হয় মফিজুদ্দিনের পিতা আকালু এবং বাক্‌প্রতিবন্ধী মাতার কাহিনি। অনেকটা 'চেইন টেল'*-এর মতো করে তিনি কাহিনি অতীতের অধ্যায়কে বর্তমানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। যেহেতু স্মৃতিসূত্রেই বর্ণিত হয় কাহিনি সেহেতু আগের কাহিনি পরের কাহিনি পরস্পর সুতোর মতো জড়িয়ে থাকে অনেক সময়। জনমানুষের স্মৃতি থেকে আহৃত কোনো ঘটনা প্রয়োজন অনুযায়ী কোনো পরম্পরাক্রম না মেনেই অনেক সময় সংযোজিত হয় এই উপন্যাসে। যেমন তোরাপ আলি ও অন্যান্যের স্মরণে প্রথমেই অতি সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ বর্ণিত হয়েছে এই উপন্যাসে। অতঃপর মফিজুদ্দিন মিয়ার পিতা-মাতা, মাতার দুর্ভাগ্যময় জন্ম পরবর্তীকালে মফিজুদ্দিনের পিতা আকালু-কর্তৃক তার পুনর্বাসন এবং তৎপরবর্তীতে আকালুর সঙ্গে সেই বোবা কন্যার বিবাহ এবং বিবাহ-পরবর্তীকালে এক পূর্ণিমা রাতে মফিজুদ্দিনের স্মরণীয় জন্মলাভের কাহিনি সন্নিবেশিত হয়েছে। এরপর শুধু মফিজুদ্দিনের উত্থানের বিচিত্র খণ্ডদৃশ্য। মফিজুদ্দিনের কাজিদের পাগলা কুকুর পাল্টা ধাওয়া করে মেরে ফেলার মাধ্যমে বীরত্বপূর্ণ অভিষেক এবং সেই অভিষেক স্মারক হিসেবে চিরদিনের জন্য পাওয়া সেই জনপদের 'কুত্তা মারার মাঠে'র গল্পের সঙ্গে নিজের সম্পৃক্তি তাকে জনমানসে 'লোকনায়ক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে মফিজুদ্দিনের যাত্রা ঊর্ধ্বগামী; তার পিতা বান্ধা কামলা হলেও শেষপর্যন্ত সে নিজের মেধা ও চাতুর্য ব্যবহার করে মিয়াবাড়ির জামাতা হিসেবেই গৃহীত হয়। মফিজুদ্দিনকে বাঁচাতে, ডাকাতদের পরাজিত করার লক্ষ্যে, নিজের জীবন দান করা বেশ্যা নয়নতারার কাছ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা মফিজুদ্দিনকে আরও সাহসী করে তোলে; নয়নতারার দেখিয়ে দেয়া নিতম্বের তিনটি জড়ুলকে ১১১ মনে করে মৃত্যু সহসা কাছে ঘেঁষছে না – এমত বিশ্বাসে সে আলোড়িত হয়ে ভবিষ্যতের পথসৃষ্টিতে তৎপর হয় এবং গ্রামে এসে প্রথমেই লোকজন ও বন্ধুদের নিয়ে নয়নতারার হাট বসিয়ে দেয়। অতঃপর একমাত্র জামাতা হিসেবে শ্বশুর বাড়ির উত্তরাধিকার অর্জনের পাশাপাশি নিজের যোগ্যতা ও মেধা সহযোগে সুহাসিনী-রায়গঞ্জের নেতায় পরিণত হয়। নিজের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতাবৃদ্ধি তাকে স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিত্বরূপে প্রষ্ঠিত করে। এবং সেটিই দৃশ্যত তার সপরিবারে পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নিজের জোরের চেয়ে নিজের যোগ্যতাই মফিজুদ্দিনকে দীর্ঘকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখে এবং অপরের অযোগ্যতা তাকে মৃত্যুর আগ-মুহূর্ত পর্যন্ত অবিসংবাদী নেতা হিসেবে বহাল রাখে। মফিজুদ্দিনের ক্ষমতাকেন্দ্রে অধিষ্ঠানের পর বন্ধু করিম খাঁর পুত্র-পৌত্র যতদিনে যোগ্য প্রতিপক্ষ বা দাবিদার হয়ে গড়ে ওঠে, ততদিনে মফিজুদ্দিনের প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন থাকার মানসিকতা গড়ে

উঠেছে এবং সেক্ষেত্রে প্রথন উদীয়মান বাধা হিসেবে বন্ধুপুত্র আফজাল খাঁকে সে শাসিয়েই দমিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

একদিকে সেই খাঁ পরিবারবিত্তে ও শিক্ষায় নিজেদের যোগ্য ও ক্ষমতাবান করে তুলেছে অন্যদিকে একমাত্র আবদুল আজিজ ব্যতীত কোনো পুত্রই মফিজুদ্দিনের মতো নেতৃত্বগুণের কদর করেনি। পাশাপাশি দুলালির মৃত্যুর পর তার প্রতি একপ্রকার বাৎসল্যজাত দুর্বলতা ও স্মৃতিরক্ষার সুপ্ত বাসনা থেকে সুহাসিনীর রাস্তা নির্মাণের কাজে বাধা দেয়ায় খাঁ পরিবারের প্রয়োজন এবং গ্রামের দৃশ্যমান উন্নতির পথের বাধা হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করে ফেলে সে। কার্যত খাঁ পরিবারের সবচেয়ে নেতৃত্বগুণসম্পন্ন সন্তান ইদ্রিস খাঁয়ের কাছে এই কুক্ষিত ক্ষমতাধারী শত্রু বলেই বিবেচিত হয় এবং পিতা আফজাল খাঁকে অপমানের প্রতিশোধ নেবার মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

ইউনিয়ন উপজেলার নির্বাচন ঘনিয়ে এলে প্রত্যাশা মতো মফিজুদ্দিন শেষবারের মতোবিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়উপজেলা নির্বাচন করতে চায় এবং শেষপর্যন্ত সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী আফজাল খাঁ-ইদ্রিস খাঁ পরিবারের সাথে বৈঠকেও মিলিত হয়ে তাদেরকে নির্বাচন না করার অনুরোধও করে। নিজের বয়স বেশি এই অজুহাতে যেন ক্ষমতা না ছুটে যায় সে জন্য নিজের স্থলাভিষিক্ত করতে চায় পুত্র আবদুল আজিজকে। এই সমঝোতার মধ্যে সে ইদ্রিস খাঁকে এমপি হিসেবে নির্বাচন করার প্রতিশ্রুতিও দেয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। নিজেদের প্রতিপত্তি ও গ্রামের উন্নয়নের দোহাই দেখিয়ে খাঁ পরিবার মৌনীভাব অবলম্বন করে; এবং নির্বাচনের পূর্বেই আততায়ীর আক্রমণে সপরিবারে নিহত হয় মফিজুদ্দিন মিয়া।

এই কাহিনিকাঠামোর মধ্যেও শহীদুল জহির বিস্তার ঘটিয়েছেন মফিজুদ্দিন মিয়ার উত্তরপুরুষদের আখ্যানাংশ সংযুক্ত করে। সেক্ষেত্রে লেখক লোকছড়ার চেইন টেল বৈশিষ্ট্যের পরিচর্যায় প্রথমেই যুক্ত করেছেন রফিকুল ইসলাম ও জান্নাত আরার অপূর্ণ প্রণয়াখ্যান। রায়গঞ্জ উপজেলা নির্বাহীর কন্যা জান্নাত আরার সাথে যে সম্পর্কে জড়ায় রফিকুল ইসলাম তাকে প্রেম হয়তো বলা যায় না, কিন্তু পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে নিজের বান্ধবী শিমুলের কাছে সে যে গল্প বলে রফিকুল সম্পর্কে, তাকে প্রেমের পূর্বরাগই বলা চলে। সেই আখ্যান-ই লেখক উপন্যাসের এই পর্যায়ে যুক্ত করেন নিহত পরিবারের বিধ্বস্ত চিত্রের অনুপুঙ্খ বর্ণনার এক প্রসঙ্গে:

> "অন্য আর একটি ঘরের ভেতর থেকে তারা (গ্রামবাসী) অনেকগুলো আধপোড়া লাল মলাটের বই বের করে এবং তাদের ভেতর যারা পড়তে পারে তারা কয়েকটি বইয়ের মলাটের ওপর অক্ষত নাম

> পড়ে, পাঁচটি প্রবন্ধ, মাও সে তুঙ; সামরিক বিষয়ে ছয়টি প্রবন্ধ, মাও সে তুঙ; রাষ্ট্র ও বিপ্লব, ভ ই লেনিন।
>
> গ্রামের লোকেরা বুঝতে পারে যে, ছাই ও ধ্বংসস্তূপের ভেতর পাওয়া এই বইগুলো ধানঘড়া হাইস্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্র, মফিজুদ্দিন মিয়ার কনিষ্ঠ সন্তান রফিকুল ইসলামের ... যে তাদেরকে একসময় একটি স্বপ্নের কথা বলেছিল, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে নাই অথবা বুঝতে পারলেও সেটা তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে নাই।"[৩৮]

উল্লিখিত উদ্ধৃতির নিম্নরেখ বাক্যটি বিশ্লেষণ করলে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি-চর্চার চিত্র এবং এ বাস্তবতার পাশাপাশি এই রাজনীতির উত্থান-ব্যর্থতার কারণ মোটাদাগে ফুটে ওঠে। বস্তুত, যাদেরকে জাগিয়ে তুলে এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব বলে তাত্ত্বিক ও প্রয়োগকারীগণ সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, সেই কৃষক শ্রেণির অনুধাবন-ব্যর্থতা কিংবা অবিশ্বাসের দৃশ্য এই বাক্যে তুলে ধরে লেখক সমকালীন সমাজ-বিপ্লবের অসার-অবস্থার চিত্র অঙ্কন করেছেন।

পাশাপাশি জান্নাত আরার পরবর্তী শিক্ষাজীবনের উল্লেখ করে লেখক উপন্যাসের কাল-ব্যাপ্তি আরও বিস্তৃত করেছেন ভবিষ্যতের গর্ভে। কেননা, উপন্যাসে যখন রফিকুল মৃত্যুবরণ করে আততায়ীর হাতে সপরিবারে, তখন সে মাত্র ক্লাস টেনের ছাত্র এবং জান্নাত আরার সহপাঠী। কিন্তু লেখক জানাচ্ছেন, "তারপর, জান্নাত আরার বহুদিন এই ভাবনা হয় যে, রফিকুল ইসলাম তার কাছে কি চেয়েছিল আসলে! তার চাকুরে পিতার সঙ্গে রায়গঞ্জ ছেড়ে আসার কয়েক বছর পর সে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বান্ধবীর নিকট তার জীবনের এই রহস্যময় অধ্যায়টিকে উন্মোচিত করে বলেছিল, আমি জানি না কি চেয়েছিল সে।"[৩৯] বস্তুত মূল ঘটনায় এর কোনো ভূমিকা না থাকলেও 'কয়েক বছর পর'-এর ভাবনা তাদের সম্পর্কের স্বরূপ ব্যাখ্যায় সাহায্য করেছিল এবং সময়ের পরিবর্তনে এই পরিবর্তিত ভাবনা ব্যবহার করে লেখক মূল আখ্যানে বর্ণিত একটি সম্পর্কের বিস্তারিত জানাতে সক্ষম হয়েছেন পাঠককে। তদুপরি সময়ের এই ধারাবাহিক ঐক্য ভেঙে, তথ্যের মতো পরবর্তীকালীন সময়ের খণ্ডাংশ ব্যবহার করে লেখক প্রচলিত প্লটের সময়ের ঐক্যের ধারণাকে ভেঙেছেন; যা তাঁর কথাসাহিত্যে প্রায়শ দৃষ্ট।

একইরকম প্রাসঙ্গিকতায় যুক্ত করে তিনি মফিজুদ্দিনের অপর পুত্র নাসিরউদ্দিনের আখ্যান জুড়েছেন। বস্তুত, চন্দ্রভান যখন পুনরায় নিশিরোগে আক্রান্ত হয় এবং মফিজুদ্দিন তাকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখে রাতের বেলায়, তখন ছোটভাই রফিকুল ইসলাম মায়ের এই দুর্গতির কথা জানিয়ে নাসিরউদ্দিনকে

চিঠি লিখলে সে এসে পৌঁছোয়। দুলালির মৃত্যুর পর অল্প সময়ের জন্য এসে যে আর গ্রামে ফেরেনি দীর্ঘকাল, সেই বিদ্যুৎ বিভাগের প্রকৌশলী মোল্লা নাসিরউদ্দিন দশ দিনের ছুটি নিয়ে মায়ের কাছে এলে মা "তার চিবুক টিপে দিয়ে বলে, আমার লায়েক ব্যাটা আইসা পইড়ছে; তখন চন্দ্রভানের এই কথা শুনে এবং আদর পেয়ে মোল্লা নাসিরউদ্দিনের বিষণ্ন মুখ আরো বিষণ্ন হয়ে ওঠে, কারণ, তখন তার হয়তো শৈশবের সেই সব ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়।"[৪০] – কী সেই ঘটনা, তা বলার সুযোগ নিয়ে এই পর্যায়ে লেখক সুহাসিনী গ্রামের মানুষদের সামষ্টিক সূত্রসমর্থনে নাসিরউদ্দিনের ঘটনা পূর্বাপর বর্ণনা করে যান।

গ্রামীণ সমাজকাঠামোতে লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের কার্যকারণসূত্র পর্যবেক্ষণ করেই শহীদুল জহির বিত্তবান পরিবারের বিশ্বাসী মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে মুসলিম সমাজের শিক্ষাব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষার সমান্তরাল ভাবা হয় এমন একটি চর্চার পথ, যেখানে সন্তানকে পাঠালে তার দ্বারা আল্লাহ্‌র ইবাদত নিয়মিত পালিত হবে এবং এই পুণ্যে সন্তান তথা পিতামাতার পারলৌকিক মুক্তির পথ সহজসাধ্য হবে। এই লোকবিশ্বাসকে কারণ দেখিয়েই মফিজুদ্দিন অপরাপর বাঙালি মুসলমানের মতোই – সন্তান নাসিরউদ্দিনকে 'আল্লাহ্‌র রাস্তায়' দেবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন[৪১]। যার ফলে নাসিরউদ্দিন কিছুদিনের জন্য মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে শিক্ষালাভ করে। কিন্তু সে শিক্ষা প্রকাশ পায় তার মোরগের অণ্ডকোষ ছেদনের পারঙ্গমতার মধ্য দিয়ে। উপরন্তু, অল্পসময়ের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করলেও গ্রামীণ লোকবুলি হিসেবে বহুল প্রচলিত 'মোল্লা' উপাধি সে লাভ করে এবং পরবর্তীকালে একজন নিষ্ঠাবান প্রকৌশলী হয়েও গ্রামের লোকদের মুখ থেকে সে নিষ্কৃতি পায় না এবং 'মোল্লা নাসিরউদ্দিন'ই রয়ে যায়। মাদ্রাসা থেকে ফিরে এসে সে যখন মোরগের অণ্ডকোষ ছেদনে ব্যাপক সাফল্য দেখায় এবং গ্রামান্তরে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে তখন-ই নিজের মোরগ ছেদন করাতে নিয়ে এসে দুলালি হাজির হয় উপাখ্যানে। কিন্তু শেষপর্যন্ত মোরগের অণ্ডকোষ ছেদনের মধ্যে বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকে না।

'সুহাসিনীর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বসবাসকারী মোবারক আলির মেয়ে বালিকা দুলালি' উপনিবেশ-প্রভাবিত দৃষ্টি দিয়ে নাসিরউদ্দিনের রূপের মোহে পড়ে এবং "তুমি এমন ধলা (সাদা) ক্যা?"[৪২] – এই জিজ্ঞাসায় সে নিজের বিস্ময়াপন্ন মনোভাব প্রকাশ করে ফেলে। দুলালির এই বক্তব্য মোল্লা নাসিরউদ্দিন প্রথমত এবং প্রধানত একটি শ্যামলবরণ বালিকার বিস্ময় হিসেবেই নেয় এবং অতিসরল বোকামিমিশ্রিত সেই বিস্ময়ের সুযোগ নিয়ে কৈশোরের দুষ্টুমিপ্রবণতায় উদ্বুদ্ধ নাসিরউদ্দিন দুলালিকে ছেদনকৃত অণ্ডকোষ গিলে খাওয়ার পরামর্শ দেয়। হিতে বিপরীত হলে দুলালির বাবা-মা সেই ঘটনা

নিয়ে ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয় এবং পরবর্তীকালে ঘটনার আকস্মিকতায় দুলালিকে কাঁধে করে রৌহার খাল পার করে দেবার সময় দুলালির প্রথম ঋতুস্রাবের রক্ত নাসিরউদ্দিনকে ধর্ষণকারীর অপবাদে রঞ্জিত করে।

কিন্তু এমতো ঘটনাপরম্পরায় যে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো নাসিরউদ্দিনের প্রতি দুলালির প্রণয়ভাবের ঘনবদ্ধ মনোপরিস্থিতি। ফলত এই আবেগপ্ররোচিত বালিকা একমুখী হৃদয়োষ্ণতায় চালিত হয়ে নিরবিচ্ছিন্ন চিরকুট পাঠাতে থাকে নাসিরউদ্দিন বরাবর। কিন্তু নাসিরউদ্দিনের মৌনীভাবে তা পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে দুলালির কাছে। আত্মহনন-ই হয়ে যায় তার মুক্তির একমাত্র পথ। এই ধীরগতির হননপ্রক্রিয়াত্বরান্বিত হয় যখন মেয়ের দুরবস্থায় নিজে যাচক হয়ে এসে মোবারক আলি মফিজুদ্দিনের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়। কন্যাকে প্রতিহত করা ছাড়া উপায় থাকে না মোবারক আলির, আর আত্মহনন ব্যতীত পথ থাকে না বালিকা কন্যার সম্মুখে। নাসিরউদ্দিন থেকে যায় আমৃত্যু 'নারীবর্জিত' পুরুষ।

উপন্যাসের এই পর্যায়ে মোবারক আলি ও মফিজুদ্দিনের পারস্পরিক সংঘাতের দৃশ্যটির আয়োজন চমৎকার। মানুষের মনোপরিস্থিতির পরিবর্তনশীলতা কীভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান দ্বারা নির্ণিত হয় তার সুন্দর উদাহরণ রেখেছেন মফিজুদ্দিনের এসময়ের আচরণে। একসময়ের দিনমজুর আকালুর সন্তান, যে কিনা এই পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে নিজের চাতুর্য-সাহস ও আসগর আলি মিয়ার নির্বুদ্ধিতাকে পুঁজি করে, সেই মফিজুদ্দিন মিয়া এসময়ে অতীতবিস্মৃত এক সম্পত্তিশালী প্রবলপ্রতাপ 'ম্যাসাব'। সামজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির মানদণ্ডে জোলা মোবারক আলি তার কাছে নগণ্য। কার্যত, তার কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহের প্রস্তাবে সে নাখোশ ও অপমানিত। সমাজ ও অর্থনীতির চিরকালীন দ্বন্দ্বে নিপতিত এই যুগলপ্রাণের বিচ্ছেদ আকল্পনে শহীদুল জহিরের সাফল্য অসামান্য। মৃত্যুর আগে যে যুগলের পাশাপাশি থাকার সুযোগ হয়নি মৃত্যুর পর অবধারিতভাবে ঘটনার আকস্মিকতায় তাদের মিলন হয় পাশাপাশি কবরে শুয়ে। পুরো পরিবারের সব লাশ এক কবরে দাফন হয়ে গেলে বাদ পড়ে নাসিরউদ্দিন, আলাদা কবর হয় তার; তারও অনেকদিন পর রায়গঞ্জের রাস্তা ইদ্রিস খাঁদের সুরধ্বনি গ্রাম পর্যন্ত নেবার নকশায় দুলালির কবর পড়ে গেলে সেখান থেকে তাকে স্থানান্তর করা হয় এবং গ্রামবাসী তার স্থান ঠিক করে মুফিজুদ্দিনের পুরো পরিবার আর নাসিরউদ্দিনের কবরের মাঝাখানের জায়গাটুকুতে, তাতেই নাসিরউদ্দিন ও মফিজুদ্দিনের পুরো পরিবারের সাথে মিশে যায় সে। বিচ্ছেদ ও মিলনের মধ্যিখানের ঘটনাসমূহে জমে ওঠা নাসিরউদ্দিন-দুলালির উপাখ্যানই মূলত এই আখ্যানের স্পন্দমান অংশ।

একটি অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার সূত্র হিসেবে নিজেকে দায়ী মনে করে সেই দুর্ঘটনায় পতিত মানুষকে নিজের জীবনসঙ্গী করে বাঁচিয়ে রাখায় প্রত্যয় প্রকাশের কাহিনি এই উপন্যাসের সিদ্দিক মাস্টার-আলেকজানের উপাখ্যান গড়ে তুলেছে। আর্ট কলেজে পড়াকালীন এক সবান্ধব ভ্রমণে সিদ্দিকুর রহমান নিজ গ্রামে আসে এবং পরিপার্শ্বের খণ্ডিত-চূর্ণিত দৃশ্যসমূহ নিজেদের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে থাকে। এমনই এক পর্যায়ে সে বিস্মৃত দুলালির আবক্ষ মূর্তি গড়ার পাশাপাশি গ্রাম্য বালিকাবধূ আলেকজানের মুখচ্ছবি আঁকে। সেই ছবি জায়গা করে নেয় আলেকজানদের বসার ঘরে। অতঃপর মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার পাকবাহিনী সেই ছবিসূত্রেই খোঁজ পায় আলেকজানের এবং পণিামে সে পাকসেনার দৈহিক নির্যাতনের শিকার হয় পাকসেনা দ্বারা। স্ত্রী-অসম্মানের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে স্বামী শহিদ হলে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সকল ঘটনার পূর্বাপর শুনে নিজেকে অপরাধী মনে হয় সিদ্দিকের। কেননা তার আঁকা ছবির সূত্র ধরেই আলেকজানের জীবনে ঘটে যায় অসহায় পরিণতি। যুদ্ধের পর ফিরে এসে সিদ্দিক আলেকজানের দায়িত্ব নিতে চায়, সেজন্যে সে গড়ে তোলে নিজের স্বতন্ত্র 'মাস্টার' পরিচয়। অতঃপর মা চন্দ্রভানের মধ্যস্থতায় কন্যাসহ আলেকজানকে ঘরে তোলে সিদ্দিক। আলেকজানের প্রতি মুগ্ধতার তুলনায় কৃতকর্মের অপরাধ-ক্ষালনের চিন্তাই ধীরে ধীরে সিদ্দিককে আলেকজানের প্রতি দুর্বল করে তোলে; আলেকজানের অনন্য রূপ এবং কন্যাসহ তার নিরুপায় পরিস্থিতি সেই দুর্বলতায় জল দিয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে – মিয়া বাড়ির পুত্রবধূ ও পুত্রের মা হয়ে আমৃত্যু সসম্মানে যাপন করে জীবন।

উল্লিখিত তিনটি উপাখ্যান মূলত মফিজুদ্দিন মিয়ার সামগ্রিক আখ্যানের তিনটি বিস্তৃত প্রশাখা; যারা মফিজুদ্দিনের জীবনের বিশালত্বকে ধারণ করেছে ভিন্ন ভিন্ন মহিমায়; পিতা হিসেবে, অভিভাবক হিসেবে মফিজুদ্দিনের পরিচয় সুস্পষ্ট করেছে। সন্তানের জীবনে পিতার ব্যক্তিত্বের যে প্রচ্ছন্নপ্রকাশ ঘটে তাতে পিতার বিভিন্ন মহিমা প্রকাশিত হয়। রফিকুলের বিপ্লবচিন্তা, অন্যদেরকে প্ররোচিত করার ক্ষমতা, নাসিরউদ্দিনের প্রগলভতা এবং দুলালির প্রতি একনিষ্ঠতা, সিদ্দিকের দায়িত্বপ্রবণতা প্রভৃতির মধ্যে মফিজুদ্দিনের বিভিন্ন চারিত্র্যের বিস্তারিত প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

এই বিশাল ব্যক্তিত্বের আখ্যান বর্ণনায় শহীদুল জহির ব্যবহার করেছেন নিজস্ব ভঙ্গি। বাঙালির আবহমান বৈঠকি গল্পের মতো তোরাপ আলির মুখে মহির সরকারের উঠানে উপস্থিত জনতা শুনতে শুরু করেছে যেই গল্প, উপন্যাসের শেষে সেই বৈঠকেই ফিরে এসেছেন লেখক; ফলত এমন একটি আবহ তৈরি হয়েছে যেন একটি বৈঠকেই বলা হয়ে গেল সমস্ত গল্প। কোনো অধ্যায় বিভাজন না থাকায় গল্পটি টানা গদ্যে এগিয়ে নিয়েছেন লেখক, গল্পে কোনো বাধা উপস্থিত হয়নি, কিন্তু

প্রাসঙ্গিকভাবেই গল্পটি ডালপালা মেলেছে। যেমন ডালপালা মেলে 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে; আরব্যরজনীর সহস্র গল্পের প্রত্যেকটি যেমন শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেই একসময় শেষ হয়ে যায়। গল্প বলার এই ধ্রুপদী বৈশিষ্ট্য আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন এবং তা জহিরের একান্ত মুন্সিয়ানার সাক্ষ্য।

লক্ষ্য করলে দৃশ্যমান হয় যে, এই আখ্যান বর্ণনায় শহীদুল জহির ব্যবহার করেছেন এমন কিছু মোটিফ বা চিহ্ন এবং সেগুলোকে ঘটনার বাঁকে ও ফাঁকে এমনভাবে স্থাপন করেছেন যেন পাঠককে সহজেই একটি মূল রেখায় রেখে সেখানেই প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য উপরেখায় পরিচালনা করা যায়। এটি আকাশ থেকে দেখা কোনো বড়ো নদীর মতো, যে নদী বহু শাখা-প্রশাখা নিয়ে অভিন্ন সাগরের দিকে ছুটে চলেছে এবং সেই শাখা-প্রশাখাসমূহ কিছুসময়ের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র নদীর মতো চললেও পুনরায় মূল ধারার সঙ্গে মিশেছে। লোকবাংলার এই সামষ্টিক জীবনবেষ্টনের বহু গল্প যেভাবে স্বতন্ত্র হয়েও মূলত একই গল্পের উপাঙ্গ হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করে শেষপর্যন্ত, ঠিক তেমনি তিনপুত্র ও শত্রুদের উপকাহিনি থাকা সত্ত্বেও 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' উপন্যাসটি আগাগোড়া মফিজুদ্দিন মিয়ার-ই আখ্যান।

উপাঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন কাহিনি এর সঙ্গে প্রযুক্ত হবার পাশাপাশি প্রায় শতবর্ষব্যাপ্ত একটি অঞ্চলের উত্থান-পতনের দৃশ্যমালাও অঙ্কিত হয়েছে এই উপন্যাসে। মফিজুদ্দিনের জন্ম-পূর্ব তার পিতা আকালু ও বোবা মায়ের জীবন এবং তৎপরবর্তীকালে মফিজুদ্দিনের জন্ম, বেড়ে ওঠা, নেতৃত্ব গ্রহণ ও একাশি বছর বয়সে সপরিবারে তার পতন- সবকিছু মিলে শতবর্ষের আখ্যানবৃত্ত তৈরি হয়েছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাসূত্র অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী দশ বছরের ব্যবধানে মফিজুদ্দিনের মৃত্যুর মাধ্যমে এর মূল কাহিনিপট সমাপ্ত হয়েছে। ইদ্রিস খাঁদের পরিবারের সদস্য সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে মেজর পদে পদোন্নতি লাভের পর খাঁয়েরা শক্তিতে ছাড়িয়ে গেছে মিয়াদের – বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ইতিহাসে সেই সময়টি সামরিক শাসনের অধ্যায় বলে শনাক্ত। রায়গঞ্জের অন্তর্ভুক্ত দুটি জনপদ সুহাসিনী ও সুরধ্বনি, মফিজুদ্দিন মিয়ার শাসনবশত ক্ষমতাকেন্দ্র সুহাসিনীতে প্রোথিত এবং তার মৃত্যুর পর খাঁ বংশের উত্থানে সেটি সুরধ্বনিতে স্থানান্তরিত হয়। জনগণ কেন্দ্র ও শাসকদেরপরিবর্তন একটু দেরিতে হলেও মেনে নেয়। অতঃপর রায়গঞ্জে খাঁ যুগের সূচনা ঘটে। সমকালীন সামরিক শাসনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সামরিক শক্তি-সম্পৃক্ত খাঁ বংশ কর্তৃক মিয়া বংশ উৎখাত করে ক্ষমতার এই যে পালাবদল, এবং মফিজুদ্দিন মিয়ার সপরিবারে নিহত হবার ঘটনার সঙ্গে সমালোচকদের অনেকেই ১৯৭৫ সনে সপরিবারে স্বাধীন

বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘটনাকে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন; যদিও এক সাক্ষাৎকারে লেখক নিজেই সেই সম্ভাবনাকে নাকচ করেছেন।[৪৩]

লেখকের নাকচ সত্ত্বেও এমন মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, তিনি মূলত ওই বিশেষ সময়ের রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই ক্ষমতাকেন্দ্রের এমন রক্তাক্ত পালাবদল আঁকতে পেরেছিলেন। গত শতকের ষাটের দশক থেকে সারা বিশ্বব্যাপী যে সকল ক্ষমতাবদলের রক্তাক্ত-চিত্র পরিলক্ষিত হয়, তাতে শহীদুল জহিরের মতো লেখকের কলমে সেই চিত্র ফুটে উঠবে এমনটাই স্বাভাবিক। বস্তুত, শহীদুল জহির তাঁর লেখক জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের কোনো গল্প-উপন্যাসেই সমকালকে অস্বীকার করেননি। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুত্থান সব সময়ই তাঁর কথাকাহিনিতে প্রসঙ্গ হয়ে এসেছে। 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' উপন্যাসেও সেই মুক্তিযুদ্ধ-পর্ব উপেক্ষিত হয়নি। সুহাসিনী ও সুরধ্বনি গ্রামের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে, গ্রামগুলো আক্রান্ত হয়েছে নির্মমভাবে এবং সিদ্দিক মাস্টার তার ভাইদের নিয়ে এবং তাদের সঙ্গে ইদ্রিস খাঁ, আলেকজানের স্বামীও যুদ্ধে সওয়ার হয়েছে। স্বাধীন দেশ অর্জনে এদের সকলেরই অবদান ছিলো প্রত্যক্ষ; যদিও সর্বশেষ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরস্পর হয়ে উঠেছে প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রচ্ছন্ন ঘাতক। পরিবর্তিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশীদার হয়েই খাঁয়েরা সমালোচনাপ্রবণ হয়ে উঠেছে এবং পূর্ববর্তী শাসনকে চিহ্নিত করেছে দুঃশাসন হিসেবে। ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে মফিজুদ্দিনের অনন্য কীর্তি 'নয়নতারার হাটে'র নাম পরিবর্তন করে রেখেছে 'রসুলপুরের হাট'। সে সময়ের বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় রাজনীতির ছায়ায় যেন রায়গঞ্জে নতুন যুগের সূচনা করেছে আফজাল খাঁ- ইদ্রিস খাঁ প্রমুখ।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনৈতিক সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরলেও শহীদুল জহির হাতছাড়া করেছেন আরেকটি সুযোগ; সেটি হলো দেশ বিভাগের প্রসঙ্গ। যেহেতু প্রায় শতবছরের আখ্যান, এবং মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেই মফিজুদ্দিন মিয়া প্রতিষ্ঠিত সেহেতু জিজ্ঞাসা থেকে যায় লেখক কেন দেশভাগের প্রসঙ্গ তাঁর আখ্যানভুক্ত করেননি। সম্ভবত লেখকের দৃষ্টি ছিলো কোনো একক চরিত্র গড়ে তোলার এবং সেই মহীরূহের করুণতম পরিণতির বিয়োগাত্মক আখ্যান রচনা। ফলত তিনি মৃত্তিকালগ্ন-ভূমিপুত্র মফিজুদ্দিনের দিকে মনোযোগী হয়েছেন; তার মাধ্যমেই গড়ে তুলেছেন আবহমান বাংলার নেতৃত্বগুণসম্পন্ন বাঙালির আদর্শ কায়া। যে নিজের ধী, গায়ের শক্তি ও চাতুর্য দিয়ে সকল বাধাকে অতিক্রম করতে পেরেছে অবলীলায়; মানুষ হিসেবে নিজের যোগ্যতা নিজে বিচার করতে সক্ষম হয়েছিলো বলেই মিয়া বাড়ির কামলা হতে নারাজ হয়েছে। নিজের জীবন বেঁচেছে যার কারণে, সেই

নাম-না-জানা নারীকে স্বীকার করেছে কন্যা-জায়া-জননীর মতো; যদিও সে নারী ছিলো বেশ্যা। বেশ্যা নয়, জীবনদায়িনী মহিমা দিয়ে সে প্রতিষ্ঠা করেছে তার নামে নয়নতারার হাট। তারপর চাষ করেছে জীবনের।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, লেখক মূলত তোরাপ আলি ও অন্যান্য দর্শক বা প্রান্তিক চরিত্রের অভিজ্ঞতাসূত্র ব্যবহার করে আখ্যান বর্ণনা করেছেন এবং সেই কারণে এখানে তাদের স্মৃতির ওঠানামা পরিলক্ষিত হয়েছে প্রকটভাবে। আখ্যানের কোনো ধারাবাহিকতা এখানে রক্ষিত হয়নি, প্রসঙ্গক্রমে কোনো ঘটনার সূত্র বর্ণনা করেই আবার পুরনো ঘটনায় ফিরে গেছেন কথক, আবার নতুন প্রসঙ্গ সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে অন্য কোনো ঘটনার। কাহিনির ঐক্যের এই বিপর্যাস তৈরি করেছে এক নতুন আমেজ, গ্রামীণ গল্পকথায় যার বৈশিষ্ট্য সবসময়-ই প্রকাশিত হয়; প্রকাশিত হয় আরব্যরজনীর কাহিনি-বৈশিষ্ট্যে কিংবা বাঙালির লোকছড়া ও রূপকথায়।

প্রথম উপন্যাস 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'র আখ্যান বর্ণনা ও ভাষা নির্মাণে শহীদুল জহির ক্রমবিবর্তিত আধুনিক বাংলা গদ্যের মার্জিত রূপকে বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু চরিত্রের মানস-পরিস্থিতি অনুযায়ী আঞ্চলিক ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে এড়িয়ে যাননি। চরিত্রের মুখের ভাষায় কোনো মার্জিত খোলস পরাননি; কার্যত চরিত্রগুলো নিজেদের বাচনভঙ্গি নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে আখ্যানে। কিন্তু বর্তমান উপন্যাসে তাঁর বর্ণনার ভাষায় একধরনের মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। মার্জিত ভাষ্যরূপের সঙ্গে লৌকিক শব্দাবলি নিজেদের অপরিবর্তিত উচ্চারণ নিয়ে মিশে গেছে; শুদ্ধ ব্যাকরণের ভাষায় যাকে 'গুরুচণ্ডালি' দোষে দুষ্ট বলা যেতে পারে। তবে একটু মনোযোগ দিলেই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, লেখক মূল বর্ণনার ভাষায় বরাবরই থেকেছেন মার্জিত ভাষানুসারী[৪৪]; বরং সামষ্টিক জনতার অংশগ্রহণের আড়ম্বরে লোক-উচ্চারণ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। যেমন:

> তোরাপ আলি পুনরায় চাঁদের পূর্বের বর্ণনায় ফিরে যায়, সে বলে যে, তার কেমন যেন শারীরিক অনভূতি হয়েছিল, যখন সে মিয়াবাড়ির মাথাভাঙা আমগাছের ঠিক ওপরে মফিজুদ্দিন মিয়ার করতলের ভেতর থেকে ফসকে বেরিয়ে যাওয়া চাঁদটিকে দেখতে পায়; সে বলে, তহুনো আন্ধার হয় নাই, চাইর দিকে ভালোই দেখা যায়, এই সময় দেহি আসমানে এক বিদঘুইট্যা চান, আর নিচে, ম্যাবাড়ির সামনের পালানে ফজলের মা লাল শাক তোলে।[৪৫]

লক্ষণীয়, উদ্ধৃতাংশে নিম্নরেখ বাক্যটি ছাড়া আর সকল বাক্যই মার্জিত আধুনিক বাংলায় রচিত। বাক্যের নির্মাণে লেখক ব্যাকরণের যুক্তিও মেনেছেন সুস্পষ্টভাবে। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ উক্তি ব্যবহারে তিনি ব্যাকরণ-বিচ্যুত হননি একবারের জন্যও। তবে এই উপন্যাসেই তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর

অব্যয়পদবহুল বাক্যশৈলী– যা তিনি দ্বিতীয় পর্বের গল্পে-উপন্যাসে হামেশাই করেছেন, যে বাক্য একটি নির্দিষ্ট বক্তব্যকে বিভিন্ন পরিণতি-সম্ভাবনায় দোদুল্যমান করে তোলে। পাশাপাশি বাক্যে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহার করে নিশ্চয়তাজ্ঞাপক বর্ণনা তৈরি করেছেন লেখক এই উপন্যাসেও। যেমন:

> নাসিরউদ্দিন এবার সাতদিন সুহাসিনীতে থাকে, ছয়দিন দুলালি তাকে ছটি চিরকুট দেয়, তাতে একটি বাক্যই সে ক্রমাগতভাবে লিখে যায়, তুমি কেমন আছ, কেমন আছ তুমি, আছ কেমন তুমি ! সপ্তম দিন সকালে পাঁচজন কৃষক তাদের মোরগ নিয়ে ফিরে যাওয়ার পর... নাসিরউদ্দিন পুনরায় আরো এক বছরবাড়ি ফেরে না ... (পরবর্তীকালে) সে দেড়মাস গ্রামে থাকে ... নাসিরউদ্দিনকে গ্রামে ফেরার পর সতেরো দিন অপেক্ষা করতে হয়, অষ্টাদশতম দিনে সে একটি পায়ের আওয়াজ পায় এবং বুঝতে পারে, এটা দুলালি;[৪৬]

বস্তুত, আখ্যান বয়ানে বাক্যে সংখ্যা ব্যবহারের এই প্রবণতা শহীদুল জহিরের নতুন নয় বরং দ্বিতীয়পর্বের ছোটগল্পের একটি ব্যবহৃত ধারারই ঔপন্যাসিক রূপায়ণ। এছাড়া পুনরাবৃত্তির পরম্পরা ব্যবহার করে তিনি এই আখ্যানে তৈরি করেছেন একটি কথনবৃত্তের ঘোর; বারংবার পূর্ণিমা ও চাঁদের প্রসঙ্গ এনে তিনি এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। লক্ষ করলে দৃশ্যমান হবে যে তিনি এই আখ্যানের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে পরিপূরক আবহ হিসেবে পূর্ণিমা বা চাঁদের আলোর প্রসঙ্গ টেনেছেন। মফিজুদ্দিনের জন্ম, চন্দ্রভানের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ, নয়নতারার সঙ্গে আলাপ এবং মৃত্যু তদুপরি নাসিরউদ্দিন-দুলালির আখ্যানাংশ বর্ণনায় তিনি ব্যবহার করেছেন চন্দ্রালোকাচ্ছন্ন পরিবেশ। একদিক থেকে এই চন্দ্রালোক যেমন সবগুলো আখ্যানাংশকে অভিন্ন বৃত্তে আবদ্ধ করেছে, তেমনি তৈরি করেছে এক ধরনের ঘোর; যে ঘোরে নিপতিত হয়ে সুহাসিনীর লোকেরা মফিজুদ্দিনের পূর্বাপর আখ্যান স্মরণ করে। চন্দ্রালোকিত নিসর্গের আবেষ্টনে বাঙালির হৃদয় উন্মুক্ত হয়ে যাবার যে অতিপ্রাচীন প্রবণতা, সেই মনস্তত্ত্ব শহীদুল জহির স্পর্শ করতে চেয়েছেন এবং সফল হয়েছেন। তাঁর এই চন্দ্রালোক বাংলাসাহিত্যে অভিনব সংযোজন। তবে চন্দ্রালোক যে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন তা কিন্তু নয়; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের শুরুর দৃশ্য এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। পাশাপাশি বিশ্লেষণযোগ্য এ-দু'য়ের স্বাতন্ত্র্যটুকুও। চন্দ্রালোকিত রাতে প্রস্রাব করতে গিয়ে যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর থমকে গিয়ে একটি অপরাধের সাক্ষী হয়ে যাওয়া আর একই কর্মে আহূত হয়ে তোরাপ আলির ঘরের বাইরে এসে চন্দ্রালোকে স্মৃতিমথিত হয়ে যাবার মধ্যে বিস্তর ফারাক। এই ফারাক তৈরি করতে পারাটাই শহীদুল জহিরের শক্তি; স্বতন্ত্র আখ্যানের লেখন-ক্ষমতা।

মুখের দিকে দেখি

শহীদুল জহিরের সর্বশেষ উপন্যাস 'মুখের দিকে দেখি'। 'আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু' ব্যতিরেকে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের প্রায় সকল কথাকাহিনিতে সমকাল ও কাল-নিরূপিত মানুষের জীবন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাসমেত তিনি যেমন নিবিড়ভাবে অঙ্কন করেছেন, কিছুটা দ্রুততাক্রান্ত[৪৭] হলেও 'মুখের দিকে দেখি' উপন্যাসেও লেখক তেমনভাবেই সেই সামষ্টিক মানুষের সমূহবাস্তবতা-নিরীক্ষিত জীবনের দৃশ্যসমূহ তুলে ধরেছেন। মূলত গত শতকের ষাটের দশকের শেষ থেকে সত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী চার দশকব্যাপী বাংলাদেশের রাজধানী তথা কেন্দ্রের জীবনধারায় ক্ষমতা ও দুর্নীতির পিঠাপিঠি অবস্থান এবং সেই সুযোগে বিদেশি বণিক শ্রেণির নিয়ন্ত্রণপ্রতিষ্ঠা-পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ এবং এই জাতীয়-আন্তর্জাতিক অভিঘাতসমূহে এদেশীয় সংখ্যালঘু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের উন্মূল হয়ে যাবার বাস্তব আখ্যান এই 'মুখের দিকে দেখি' উপন্যাসটি।

লক্ষ করলে প্রতীয়মান হবে যে, শহীদুল জহির সর্বদাই একটি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনের স্বরূপ অন্বেষণ করেন। ষাট ও সত্তরের দশকের বাস্তবতা যেমন তাঁর 'পারাপার' গ্রন্থের গল্পের শরীরে দৃশ্যমান তেমনি পরবর্তী গল্পকথায় মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তী আশির দশকের গ্রাম-শহর নির্বিশেষে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের একান্ত ও সামষ্টিক আনন্দ-বেদনার আখ্যান রচিত হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় শহীদুল জহির নব্বইয়ের শেষার্ধ ও একুশ শতকের প্রথম দশকের সামষ্টিক জীবনের বিবিধ জিজ্ঞাসা ও বস্তুরূপ তুলে ধরেছেন তাঁর 'মুখের দিকে দেখি' উপন্যাসে। অর্থাৎ দুটি শতকের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা একটি সময়কে তিনি বর্তমান উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। বস্তুত এই সময়ব্যাপ্ত নাগরিক বাস্তবতায় মাঙ্কিবয় চান মিয়া ও ধূর্ত মামুনের বর্তুলসদৃশ অপরিপূর্ণ বিকাশ ও পরিণতি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে তিনি সেই সময়ের ঊষর-পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন।

'মুখের দিকে দেখি' উপন্যাসের আখ্যান পরিকল্পনায় লেখক পুরান ঢাকার প্রাতিবেশিক-পরিস্থিতিতে তিনটি পরিবারকে তিনটি বিন্দু হিসেবে কল্পনা করেছেন। এদের প্রথম বিন্দুটিতে খৈমন ও তার পুত্র চানমিয়া, দ্বিতীয়টিতে মেরি জে ক্লার্ক ও তার কন্যা জুলি ফ্লোরেন্স এবং তৃতীয়টিতে মিসেস জোবেদা রহমান ও তার ছেলে মামুন ক্রিয়শীল। এদের প্রত্যেকেই অভিন্ন ভৌগোলিক সীমার বাসিন্দা; ফলত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবেশও অভিন্ন। এই অভিন্ন প্রতিবেশে দুই প্রজন্ম, তাদের হয়ে ওঠা এবং সেই হয়ে ওঠার বিরুদ্ধ প্রতিবেশে সংগ্রামশীল জীবন ও পরাজয়ের ইতিবৃত্ত এই উপন্যাস। পারস্পরিক পরিচিতির ভিত্তিতে একই আর্থ-সামাজিক বৃত্তে বসবাসরত এই তিনটি পরিবার পরস্পর সংলগ্ন। তবে এর বাইরেও তিনি মামুন পরিচয়ের আরেকটি চরিত্রকে উপন্যাসে এনেছেন সমান গুরুত্ব

সহকারে; শেকড়হীন একটি নিরুপায় বালক প্রাতিবেশিক বাস্তবতায় কেমন নৃশংস হয়ে গড়ে ওঠে খরকোস মামুন তার পরিচয়।

বস্তুত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম প্রজন্মের অংশীদার, পুরান ঢাকার কতিপয় তরুণ, তাদের মহল্লা-জীবন, পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা, অর্থনৈতিক-সামাজিক নিক্তিতে পরিমাপকৃত সম্পর্কের স্বরূপ ও বাস্তবতার মুখের দিকে তাকিয়েছেন লেখক এই উপন্যাসে। উল্লিখিত চারটি স্রোতের প্রত্যেকটি স্রোত যেখানে এসে মিলে যায় তা হলো ঢাকার নাগরিক জটের মোহনা। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী একটি প্রজন্মের উত্তরাধিকার স্বাধীনতা পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে সার্বিক বাস্তবতায় কী পরিণাম লাভ করে– লেখকের দৃষ্টি সেদিকে। স্বাধীনতাপূর্ব ও পরবর্তী দুটি প্রজন্মের পরম্পরা গ্রন্থন করে লেখক সার্বিক বাস্তবতায় একটি স্বাধীন দেশে তাদের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম, সাহস ও অনেকটা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা-নিকষিত যে নিয়তি, তার নির্ধারিত পরিণামের বৃত্তে চরিত্রগুলোকে অঙ্কন করেছেন ।

উপন্যাসের প্রথম প্রজন্ম হিসেবে খৈমন, মিসেস জোবেদা বেগম, নুরানি বিলকিস উপমা এবং মেরি জয়েস– এই চারজন নারীকে উপস্থিত করেছেন লেখক। পুরান ঢাকার ভূতের গলি ও তৎপার্শ্ববর্তী মহল্লায় লাগোয়া দূরত্বে বসবাসরত এই চরিত্রসমূহ বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। চারজন নারীর মধ্যে চারটি কোণ কল্পনা সহজ হলেও শহীদুল জহির আখ্যানকে চৌকোণা করেননি। মূল আলো কেড়ে নিয়ে খৈমন এদের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে, মেরি জয়েস নিজের আসন স্বতন্ত্র করতে পেরেছে নিজের ইন্টেলেকচুয়াল সামাজিক যোগ্যতায়। পরবর্তী প্রজন্মের উত্তরাধিকারদের মধ্যেও আলোক বিম্বিত হয়েছে খৈমন-পুত্র চানমিঞা এবং মেরির কন্যা জুলিকে ঘিরে। আখ্যানের অপর যে রেখাটি লেখক ঢাকার বৃত্তের বাইরে গিয়ে অঙ্কন করেছেন সেখানে থেকে নিজেদের যোগ্যতাবলেই মামুন ওরফে খরকোস ওরফে আইবেক এবং আসমানতারা হুরে জান্নাত হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ।

তবে আখ্যানের প্রথম আবর্তনে শহীদুল জহির বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন মেরি জয়েস ও তার পূর্ব ও উত্তর প্রজন্মের কাহিনি বয়নে। বঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের আগমন এবং স্থায়ী বসবাস ও স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলাদেশে তাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত হবার ধারাবাহিক এক ইতিহাস বর্ণনা করেছেন মেরি জয়েসের গল্প উত্থাপন-সূত্রে। এক দেশত্যাগী পর্তুগিজ ক্যাথলিক খ্রিস্টান আলবার্ট ডি সুজা প্রথমে ভারতের গোয়া রাজ্যে এবং পরবর্তীকালে মিশনের কাজে বাংলাদেশের ঝিকরগাছায় এলে এদেশীয় প্রটেস্টেন্ট খ্রিস্টান বিধুভূষণ দাসের পরিবারের সাথে ঘনিষ্ট হয়। যদিও ধর্ম প্রচারই ছিল তার উদ্দেশ্য তবু 'তার বয়স ছিল কম এবং দেশ ত্যাগ করে আসায় তার মন ছিল বিষণ্ন এবং উদাস', তাই এই পরিবারের দুই কন্যা লাবণ্যপ্রভা ও বিদ্যুন্মালার ব্যবহার তার ভালো লেগে যায় এবং

পরিণতিতে লাবণ্যপ্রভা তার প্রেমে নিমজ্জিত হয় কিন্তু সে মুখ ফুটে বলার আগেই ছোট বোন বিদ্যুন্মালা তাকে অধিকার করে। ছোট বোনকে সুখী করার জন্য লাবণ্যপ্রভা আলবার্ট-প্রাপ্তির বাসনা ত্যাগ করে, এবং আলবার্টের কাছেই দীক্ষিত হয়ে নান হিসেবে চলে যায় চার্চের সেবায়। এই প্রেম ও পাবার বাসনা ত্যাগ করে নান হয়ে যাবার গল্প গভীরভাবে দাগ কাটে উত্তরপ্রজন্ম জুলির মনে। চানমিঞার সাথে প্রেম হবার পরও যখন সার্বিক বাস্তবতায় তাকে পাবার পথ রুদ্ধপ্রায়, তখন সেও তার ঠাকুরমার মতো নান হবার বাসনা ব্যক্ত করে। তবে শহীদুল জহির লাবণ্যপ্রভার নান হবার মাধ্যমেই কাহিনি শেষ করে দেন না, তিনি আলবার্টকে বাঙালিতে রূপান্তর করেছেন এবং তার উত্তরপুরুষগণ কীভাবে এই দেশকে ভালোবেসে বাঙালি হয়ে গেছে এবং স্বাধীনতার পর হয়ে গেছে ক্রমশ নির্মূল, সে আখ্যানও প্রকাশ করেছেন কাহিনির এই আবর্তনে। "আলবার্ট ডিসুজার জীবনের পথ বাংলাদেশে এসে বেঁকা হয়া যায়, বিদ্যুন্মালাকে বিয়া করে সে সন্ন্যাসী থেকে গৃহী হয়, প্যান্ট এবং ক্যাসক খুলে ফালায়া ধুতি-ফতুয়া ধরে, গায়ে ভাল করে খাঁটি সরিষার তেল মেখে স্ত্রীর বড় ভাই মিহির কান্তি দাসের সঙ্গে যায় কপোতাক্ষ নদীতে গোসল করতে।"[৪৮] লেখক এরপর টানা বর্ণনায় এই বাঙালিয়ানায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া ডি সুজার উত্তরপুরুষদের পরিণতি ব্যাখ্যা করেন, তবে এই বাংলা ভূ-খণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাসের সাথে সেই পরিণতিসমূহ যে কীভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়, লেখক সেই ইঙ্গিতও প্রকাশ করেন সংক্ষিপ্ত বাক্যবয়নে: ডি সুজা সপরিবারে "অবশেষে ঢাকার তেজকুনি পাড়ায় এসে স্থিত হয়, বেগুনবাড়িতে একটা বেকারি খুলে বসে।... কোথাকার লিসবনের এক ডিসুজা ঢাকার হাতিরঝিলের পাশে খাস্তা আর বেলা বিস্কুট বানায় জীবন কাটাইতে থাকে; পাকিস্তান হওয়ার পর যশোরে মেরি জয়েসের ঠাকুমার পরিবার পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর চলে যায়... পকিস্তানের অনেক রোমান ক্যাথলিক কৃষ্ণনগরের কাছের পল্লিতে জমি কিনে বসতি স্থাপন করে, তখন তেজকুনি পাড়া থেকে বুড়া ডিসুজার ৫ ছেলের মধ্যে চারজনই চলে যায়, কিন্তু মেরির বাপ, বুড়া ডিসুজার ৫নম্বর ছেলে জন ডিসুজা গেল না, সে বললো, না ওইখানে যায়া কি করব? ফলে মেরিরা ফাইসা যায় বাংলাদেশে।"[৪৯]

এই উপন্যাসে শহীদুল জহির মেরি জয়েস, তার পুত্র যোসেফ ও কন্যা জুলির ইতিবৃত্ত একটু ব্যাপ্ত পরিসরেই বয়ন করেছেন। তন্মধ্যে মেরি জয়েসের সংসারযুদ্ধ, সন্তানদের বড়ো করতে নিজের নিরলস পরিশ্রম এবং শিক্ষকতা, পুত্র যোসেফের বিজি প্রেসের চাকরিজীবন এবং সহকর্মী শাকিলার সাথে প্রেম এবং প্রবাসে করুণ মৃত্যু, তার কন্যা জুলির চানমিঞার প্রতি আকর্ষণ এবং চানমিঞার কাছে নিজেকে সমর্পণের কাহিনিখণ্ডও আপন অভিনবত্ব নিয়ে স্থান লাভ করেছে।

বঙ্গে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের আগমন ও ক্রমবিলোপনের আখ্যান রচনায় শহীদুল জহির পুরোপুরি কল্পনাকে আশ্রয় করে অগ্রসর হন নি, তৎপ্রাসঙ্গিক ইতিহাসের সূত্র ব্যবহার কওে কল্পনার গতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। 'মুখের দিকে দেখি' উপন্যাসের ভূমিকাস্বরূপ উপস্থাপনায় তিনি জানিয়েছেন সেই সূত্রাবলির সন্ধান:

> প্রথমত এই উপন্যাসে ব্যবহৃত বাংলাদেশে খ্রিষ্ট ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু ব্যক্তি ও স্থানের নাম, এবং কিছু তথ্য বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক 'বাংলাপিডিয়া', কলকাতার প্রভু যীশু গীর্জা কর্তৃক প্রকাশিত এবং লুইস প্রভাত সরকার কর্তৃক রচিত 'বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় (প্রথম খণ্ড)' এবং ঢাকা থেকে প্রতিবেশী প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত 'ভক্তি-পুষ্প' নামক গ্রন্থসমূহ থেকে নেয়া; তবে, ব্যক্তির নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সময়ক্রম অনুসৃত হয় নাই।[৫০]

ইতিহাসের উপাদান গ্রহণ করলেও লেখক একটি গল্পই সাজিয়েছেন শেষপর্যন্ত। বঙ্গে একটি সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক পরিণতি প্রদর্শনের রূপরেখা নির্দেশ করার জন্যএই গল্প বাংলা কথাসাহিত্যে বিশিষ্টতায় ভাস্বর হয়ে থাকবে চিরকাল। একটি ভীনদেশি খ্রিস্টানের ভারত থেকে বাংলায় এসে পরিবার গঠন, বসবাস এবং বাঙালি রক্তের সঙ্গে মিশে যাবার আখ্যান যেমন শহীদুল জহির রচনা করেছেন তেমনি সেই পরিবারের সর্বশেষ উত্তরাধিকার মেরি জয়েসের আমৃত্যু বাঙালি থেকে যাবার আকাঙ্ক্ষার গল্পও বর্ণনা করেছেন। এইখানে শুধু ব্যক্তি বদলে যায়, কিন্তু গল্পের ছক অভিন্ন থাকে। মেরি জয়েসের ঠাকুরমার প্রেমে পড়ে সহায় সম্বলহীন পর্তুগিজ নন্দন যেমন থেকে গিয়েছিলেন বাংলায়, তেমনি সমূহসংকটকালে মায়ের অনুরোধ ও উপযুক্ত পাত্রসম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও জুলি – পর্তুগিজ উত্তরাধিকার – খৈমন-পুত্র মাঙ্কিম্যান চান মিঞাকে ভালোবেসে এই বাংলায় থেকে যাবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে। এই ইতিবৃত্ত শুধু এক নারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে বর্ণনা করে না, প্রমাণ করে ভিনদেশি উত্তরাধিকারদের সপ্রাণে বাঙালি হয়ে যাবার ইতিহাসও।

চতুর্ভুজ এই আখ্যান অনন্যতা অর্জন করেছে পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, যেন চারটি বাহু পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে বিচিত্র এক কাহিনিকাঠামো গঠন করেছে। তন্মধ্যে মামুন মিঞা ওরফে খরকোস প্রথম দিকে স্বতন্ত্র থাকলেও উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে বাকি তিনটি বাহুর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়েছে। লেখক এই আখ্যানাংশ তৈরিতে ব্যবহার করেছেন নগর জীবনে বহুল পরিচিত 'গুম' হয়ে যাবার সূত্র। সাধারণ সাংসারিক প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে একজন মানুষ যেমন গুম হয়ে যেতে পারে। তেমনি নিতান্ত আন্দাজের বসে দেয়া যে কোনো পরিচয়ে হারিয়ে যেতে পারে মানুষের

আসল পরিচয়। বহু নামে পরিচিতি পাওয়া কিন্তু আসল পরিচয় হারিয়ে ফেলা দুর্ভাগ্যবান একটি চরিত্র এই উপন্যাসের খরকোস।

খরকোসের গল্প বর্ণনা করতে গিয়ে শহীদুল জহির ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া পর্যন্ত কাহিনির বিস্তার ঘটিয়েছেন। সেইসঙ্গে তুলে ধরেছেন সমুদ্রবর্তী মানুষের, বিশেষত আখ্যানে উল্লিখিত চৌধুরীদের মতো অপরাধমূলক বাণিজ্যে জড়িত, তাদের জীবনের প্রকৃতিকে। অর্ধশিক্ষিত, কিন্তু সমাজ-রাষ্ট্রের ক্ষমতার জাল এই পরিবার নিজেদের অর্থ দিয়েই নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। এই 'চৌধুরী গং' দেশের রাজধানী ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে মায়ানমারের সীমান্ত পর্যন্ত বিবিধ ব্যবসায় নিয়োজিত। যেহেতু নৈতিকতা-বর্জিত এবং খুন-গুম-মানুষের লাশ পাচার তাদের ব্যবসার অন্তরালে চলমান নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার প্রায়, সেহেতু তাদের ঢাকাস্থ করাতকলে কাঠের ভুসি কিনতে আসা কোনো মানুষ হঠাৎ ভুসির সাথে বস্তাবন্দি হয়ে গেলে তাদের কাছে বড় কোনো দোষ বলে প্রতিভাত হয় না। এই উপন্যাসের এই বিশেষ বংশটির সাথে নাম না-জানা কোনো ঢাকাইয়া বালককে লেখক যুক্ত করেছেন এই পাচারের তথ্য উপস্থাপনসূত্রে।

সাধারণ ধারণা থেকে উদ্ভূত বিশ্বাস কীভাবে তথ্য-বিভ্রান্তি ঘটিয়ে আখ্যানের রহস্য তৈরি করে এবং ভুল পরিচয়ে গড়ে তোলে আরেকটি সমান্তরাল জীবন এবং সেই সমান্তরাল জীবনের কাঠামো তার প্রতিপালকদের অন্তস্থ নির্যাস গ্রহণ করে কীভাবে দ্বিধাযুক্ত এক জটিল উপনিবেশী চারিত্র্য গড়ে তোলে 'খরকোস' তার চূড়ান্ত উদাহরণ। বলা যেতে পারে এই উপন্যাসে শহীদুল জহিরের সমকালীন প্রতিবেশ-শাসিত মানুষের জীবনের অনিবার্য আকস্মিকতা তুলে ধরার যে প্রয়াস, তা চৌধুরী গং ও খরকোস প্রসঙ্গে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। ভূতের গলির মিসেস জোবেদা রহমানের ছেলে নিয়মিত 'দি নিউ চন্দ্রঘোনা স মিল এন্ড টিম্বার ডিপোট'-এ কাঠের ভুসি আনতে যায়, সে সেখানকার সুপরিচিত মুখ মিলের শ্রমিকদের পরিচিত। একদিন ভুসি নিতে এলে শ্রমিকেরা তাকে দেখে এবং ভাবে এই ছেলেকে তো তারা অনেক আগেই পাচার করে দিয়েছে চট্টগ্রামে। এখানে লেখক বিভ্রান্তি তৈরি করেন শ্রমিকদের স্বল্পক্ষম স্মৃতিসূত্রের ব্যবহার করে। সহজ যুক্তির প্রয়োগে বলা যায় যে, মামুন ব্যতীত অন্যান্য সকল খদ্দের অনিয়মিত থাকতো বিধায় শ্রমিকদের স্মৃতিপটে কিশোর ক্রেতা মানেই মামুনের অবয়ব ভেসে ওঠে এবং সে বয়সের কোনো নাম না জানা বালক পাচার হয়ে গেলেও তাদের মনে হয় মামুনকেই তারা পাচার করেছে। ফলে তাদের সন্দেহ কাটাতে তারা মামুনদের বাড়িতে গিয়ে মামুনকে দেখলেও বিশ্বাস থেকে নড়ে না এবং নাম না-জানা সেই অজ্ঞাত বালক মামুন মিঞার পরিচয়ের কাঠামো নিয়েই সাতকানিয়ায় আসমান তারা হুরে জান্নাতের খাঁচাবন্দী পশু হয়ে বেঁচে থাকে

– যৌবনের প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত। ঔপন্যাসিক একটি ধাঁধার রহস্যময়তায় সমান্তরালভাবে দুইজন মামুনকে উপন্যাসে লালন করেন। ফলে গল্পটি আপাতদৃষ্টিতে ব্যাখ্যাযোগ্য মনে হয় না; যুক্তি তালগোল পাকিয়ে যায়। এই তালগোল পাকানো সত্ত্বেও গল্পটি সাবলীলভাবে এগিয়ে নিয়ে যান তিনি। তাঁর এই সাবলীলতার অন্য নাম গল্প বলার ক্ষমতা এবং সেই অবিশ্বাস-জাগানিয়া কৌশলটির নাম-ই জাদু-বাস্তবতা।

এই কলাকৌশলে প্রায় পশু থেকে নিজের যোগ্যতায় ও বুদ্ধিবলে সাতকানিয়ার চৌধুরী গংদের উত্তরাধিকার বনে যায় খরকোস ওরফে মামুন মিয়া, তারপর তাদের কন্যা আসমানতারা হুরে জান্নাতকে সঙ্গী করে সেই বংশের গতি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করে; কালোবাজারির সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজের আত্মপরিচয় খুঁজতে এসে অস্তিত্ব খুঁজে পায় না। তবুও আশা ছাড়ে না সে– যেমন করে হুরে জান্নাতকে পাবার আশা জিইয়ে রেখেছিলো সে, তেমনি আশা নিয়ে করাত কলের শ্রমিকদের তৈরি করা ঢাকার সেই মিসেস জোবেদা রহমানের কাছে সন্তানের দাবি নিয়ে উপস্থিত হয় কিন্তু বিভ্রান্তিতে পড়ে সে উপন্যাসের চলমান মূল-আখ্যান চান মিঞা- জুলির কাহিনিবৃত্তে প্রবেশ করে। ঢাকার আসল মামুন মিঞা যেহেতু চান মিঞা – জুলির কাহিনিতে তৃতীয় পক্ষ, সেহেতু সে কিছুতেই নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। উপরন্তু চান মিঞার চুরির কবলে পড়ে তার গাড়ি। সেয়ানা সেই চোরকে ধরতেই সে ফাঁদ পাতে আরেকটি গাড়ি দিয়ে এবং অপেক্ষায় থাকে,কিন্তু উপায় কিছু হয় না। উল্টো রাগে-ক্ষোভে সাতকানিয়া থেকে অস্ত্র আনানোর পথে আসমানতারা হুরে জান্নাত র‍্যাবের কাছে ধরা পড়লে অবস্থা অস্বাভাবিক হয়ে যায়। অবশেষে চান মিঞাকে ধরার এবং নিজের পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টায় সে ক্ষান্ত হয় এবং সাতকানিয়ায় ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে।

এই সংকটকালে সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় এসে অস্ত্রসহ ধরা পড়ার পরও থানা, পুলিশ, আদালত-পরিক্রমায় আসমানতারার যে দৃঢ়তর উপস্থিতি তাতে সংক্ষেপে হলেও চৌধুরী গংদের স্নায়ুর উত্তরাধিকার হিসেবে তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে; খরকোসকে ধরতে আসমানতারাকে ব্যবহার করে পুলিশ যখন নাগাল পায় না তার, তখন র‍্যাব-পুলিশের সামনেই সে খরকোসকে পালিয়ে থাকতে বলে–

> "খরকোস তাকে জিগাস করে, তুঁই কেন আছ?
>
> আসমানতারা বলে, আঁই গম আছি, চিন্তা হইরগো, তুঁই খডে?
>
> : কইর ন ফারি খডে!
>
> : ভাগি যঅও গৈ!"[৫১]

অন্যত্র লেখক বর্ণনা করেন তার চিত্তদৃঢ়তার চিত্র: "খরকোসকে ধরতে না পেরে র‍্যাব-২ এর মেজর শহিদ খুবই চেতে যায়, সে আসমানতারাকে ছাড়ে না, রমনা থানার মাধ্যমে কোর্টে হাজির করে আবার রিমান্ডে নিয়া আসে, আসমানতারার মধ্যে কোন ভয় কিংবা অন্য কোনো বিকার দেখা যায় না, সে র‍্যাবের মেজর শহিদ কিংবা ক্যাপ্টেন আনিস যা বলে তাই করে;"[৫২]

অতঃপর পলাতক খরকোস ওরফে মামুন ওরফে কুতুবউদ্দিন আইবেককে সঙ্গে নিয়ে আগন্তুকের মতো মূল আখ্যানে ঢুকে পড়া আসমানতারা হুরে জান্নাত পুনরায় সাতকানিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়, তবে যেই খরকোসকে সে আবাল্য খাঁচাবন্দী দেখে বড়ো হয়েছে; মুক্তি পেয়ে যে পরিণত হয়েছে কুতুবউদ্দিন আইবেকে, যে চলে গেছে তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে প্রায় – পোষা প্রাণির মতো যাকে সে আগলে রাখতে চায় সর্বক্ষণ, ভালোবাসে যাকে সে, মতান্তরে যাকে সে একমাত্র বাঁচার অবলম্বন ভাবে, ভাবে সমস্ত শক্তির কেন্দ্রবিন্দু– সেই খরকোসকে সে পুনরায় খাঁচাবন্দী করে নিয়ে যায় সঙ্গে।

স্বল্প-উপস্থিতি সত্ত্বেও আসমানতারার এই আবির্ভাব শক্তিমত্তায় ও জীবনের সংঘাতময়তায় মিসেস মেরি জয়েস ক্লার্ক, খৈমন এবং জুলি ক্লার্কপ্রভৃতি চরিত্রের সঙ্গে তুলনায় উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। পক্ষান্তরে বাপহীন 'বান্দরপুত্র' চানমিঞার সমস্ত প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতা পরিচয়হীন খরকোসের তুলনায় একটি আকার লাভ করে এই উপন্যাসে। বাংলা উপন্যাসে চিত্রিত সমস্ত মাতৃপ্রতিমাকে আলাদা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেয় খৈমন। পাড়ার অন্যান্য মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিবাহ-পূর্ব জীবনের বিচিত্রসম্ভার এবং বাংলাদেশে মহান মুক্তিযুদ্ধে মাতৃত্ব রক্ষার যে যুদ্ধ সে করে, তাতে বাংলা উপন্যাসে সে অর্জন করেছে অনাস্বাদিত–অশ্রুতপূর্ব চারিত্র্যকাঠামো; বস্তুত একটি নবজন্মকামী, যুদ্ধদীপ্ত জাতিরাষ্ট্রের সংগ্রামমুখর পরিস্থিতিতে নিজের হবু সন্তানকে সে যেভাবে রক্ষা করে পাড়ার রাজাকারদের কবল থেকে, তাতে একটি দ্বিস্তরের গল্প গড়ে ওঠে খৈমনকে ঘিরে। খৈমন একাধারে ব্যক্তি খৈমন এবং বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের প্রতীক। অন্যদিকে চানমিঞা স্বাধীনতার আরেক নাম; বহু শত্রুর চোখ পালিয়ে গোপনে হলেও যাকে রক্ষা করেছে খৈমন, ভাষান্তরে অর্জন করেছে নিজের ভালোবাসা ও ত্যাগের বিনিময়ে। বহুকষ্টে অর্জিত স্বাধীনতার মূল্য দেশ-নেতৃত্ব যেমন সঠিক নির্দেশনা দিয়ে অনন্যতা অর্জনের পথে পরিচালিত করতে পারেনি, তেমনি খৈমনও ব্যর্থ হয়েছে স্কুলের 'ব্রাইট বালক' চানমিঞাকে সুন্দর ভবিষ্যতের পথে পরিচালিত করতে।

প্রচলিত নারীবাদী ভাবনাকাঠামোয় নারীকে কী করতে হবে বা তাকে কোথায় সুযোগ দিতে হবে অথবা কেমন হবে তার জীবনচিত্র – সেসবের আদর্শায়ন না করে একেবারে জৈবিককাঠামোর দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন লেখক– তাঁর খৈমন স্বতঃস্ফূর্ত। নিজের যৌবনে সে যেমন চপলা, স্বামী নির্বাচনে

সচকিত, যুদ্ধকালীন সংকটে এবং পুত্রপালনে ও জীবনযুদ্ধে অজেয়। পুরান ঢাকার আর্থসামাজিক ও ভৌগোলিক সংস্কৃতির 'অনমনেয় রূপ' তার চারিত্র্যে সুস্পষ্ট। অন্যদিকে ভিনদেশি রক্তের ক্রমসঙ্করায়ণে বাঙালি হয়ে ওঠার চারিত্র্য দিয়ে লেখক জুলিকে তৈরি করেছেন। মেরি জয়েস যতোটা বিমিশ্রসত্তার উত্তরাধিকার হিসেবে এদেশকে ভালোবেসেছে, জুলির ভালোবাসা তার তুলনায় হয়েছে আরো ঘনবদ্ধ ও একাগ্র।

খৈমন-জুলি ও আসমানতারা হুরে জান্নাতের বাইরেও শহীদুল জহির উক্ত সাংস্কৃতিক-বলয়ের নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন, যেমন নুরানি বিলকিস উপমা কিংবা মিসেস জোবেদা রহমান, কিন্তু তাদের জীবন সঙ্কটের ছায়ামুক্ত, নাগরিক প্রমোদছকে গল্পপটিয়সী এবং বাগাড়ম্বরসর্বস্ব। তাদের এই স্বভাববৈশিষ্ট্যকে সূত্র ধরেই উত্তরাধুনিককালের কথক শহীদুল জহির গল্পের সূত্রপাত করেছেন। পার্শ্বচরিত্রের চিরায়ত 'আখ্যান সহযোগী ভূমিকা' এ-সূত্রে বিশেষত্ব লাভ করেছে এবং আখ্যানকল্প অর্জন করেছে বিশিষ্ট বর্ণনভঙ্গি। লেখক যেন বা সেই পার্শ্বচরিত্রের সূত্র ধরেই মূল গল্পে প্রবেশ করতে চান:

> ভূতের গল্পির চানমিঞা হয়তো বান্দরের দুধ খাওয়া পোলা, কারণ যারা এই ঘটনার সাক্ষী, যেমন মামুন/মাহমুদের মা মিসেস জোবেদা রহমান, তাদের ২৫নম্বর বাড়িতে বেড়াতে গেলে এবং কথার প্রসঙ্গ চানমিঞার দিকে মোড় নিলে সে এই কথাটা জানাতে ভুলবেই না যে, ওতো বান্দরের দুধ খাইছিল, এবং এ বিষয়ে সন্দেহ করলে সে অবশ্যই তর্ক করবে এবং প্রয়োজনে ঝগড়া।[৫৩]

শুরুর বাক্যটিতেই লেখক মিসেস জোবেদা রহমানের পরিচয় দেবার পাশাপাশি জনৈক চানমিঞার সংবাদ দেন, যে 'বান্দরের দুধ' পান করে বড় হয়েছে। এই প্রমাণসাপেক্ষ বিষয়টি মিসেস জোবেদার বিশ্বাসে এতোটাই দৃঢ়মূল যে, প্রয়োজনে সে ঝগড়া পর্যন্ত করে এবং তার গল্পে অবিশ্বাসী শ্রোতাদের "তুই কিছুই জানস না!" –বলে নিজের বিশ্বাসে স্থির থাকে। তাতে পাঠক বা শ্রোতার মন উদগ্রীব হয় সেই চানমিঞা সম্পর্কে শুনতে, সেই সুযোগে লেখক তাঁর আখ্যান সামনে এগিয়ে নিয়ে চলেন। কাহিনি-প্রবন্ধনের এই সূত্র ধরেই গল্প এগিয়ে চলে; তবে শহীদুল জহির এখানে তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতেই সুতো জড়িয়ে দেন একটির সাথে আরেকটি। একই ভূগোলের পরিসীমায় অবস্থিত বলে খৈমন ও চানমিঞার কাহিনি মিসেস জোবেদার বয়নের সঙ্গে সঙ্গেই বিবৃত হবার সুযোগ পায় এবং জোবেদা-খৈমন দুজনেরই সন্তানের স্কুলসূত্রে তাদের জীবনাখ্যানের সঙ্গে যুক্ত হয় স্কুল শিক্ষিকা মেরি জয়েস ও তার কন্যা জুলি ক্লার্কের আখ্যানাংশ। তবে লেখক হেলায় সুযোগ নষ্ট করেন না, ফুরসৎ পাওয়া মাত্র সকলের ইতিহাস যুক্ত করেন যৌক্তিক প্রাসঙ্গিকতায়। সমকালীন বাণিজ্য ও ক্ষমতার

ঔরসে বেড়ে-ওঠা কুতুবউদ্দিন আইবেক ওরফে খরকোসকেও তিনি এদের সঙ্গে যুক্ত করেন বানানো পরিচয়ের সূত্রে।

চরিত্রসমূহের পূর্বাপর ইতিহাস বর্ণনাসূত্রে শহীদুল জহির এই বঙ্গে খ্রিস্টান-ধর্মাবলম্বীদের আগমন ও ক্রমক্ষয়িষ্ণুতার অবশেষ যেমন দৃষ্টির গোচরে নিয়ে আসেন তেমনি খৈমন-চানমিঞা-জোবেদা খণ্ডে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব-মধ্য-উত্তরকালে তাদের জীবনের সমূহসংকটের বৃত্তান্ত তুলে ধরেন। এই বৃত্তান্ত তার বাস্তববাদী ভঙ্গিমাগুণে শুধু তাদের দিনপঞ্জি হিসেবে চিহ্নিত হয় না, হয়ে ওঠে পুরো বাংলাদেশের সংকটকালীন জীবনচিত্র; আর খৈমন প্রতিনিধিত্ব করে সমস্ত বাংলাদেশের। শহীদুল জহির খৈমনকে কেন্দ্রে স্থাপন করে বাংলাদেশের জন্মের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছেন। জরিমন আর আবদুল জলিলের সাধারণ জীবনে দায় হয়ে ওঠা কন্যা খৈমন শেষপর্যন্ত নিজের পছন্দ অনুযায়ী ময়না মিঞাকেই বিয়ে করে। অতি চালাক ময়না মিঞাকে শাসনে ও প্রেমে আবদ্ধ রেখে যুদ্ধের ভয়াবহতায় নিপতিত হয় সে; কিন্তু গর্ভে বেড়ে ওঠতে থাকে চানমিঞা। মুক্তিযুদ্ধকালীন খৈমনের একাকী লড়াই সেই অনাগত সন্তানকে বিরুদ্ধ প্রতিবেশে অক্ষত রাখাকে কেন্দ্র করে। চারপাশের মানুষ যখন পলাতক অথবা মুক্তিযুদ্ধে জড়িত তখনও অরক্ষিত ব্যূহে নিজের মা ও অনাগত সন্তানকে নিয়ে খৈমনের প্রতিরোধ এবং উঠানে দাঁড়ানো শত্রুদের বিরুদ্ধে অনমনীয়তায় সে উজ্জ্বল। তার আঁচল ওড়ানোতে শত্রুরা স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ানোর ইঙ্গিত পায়। প্রকৃত-অর্থে বীরাঙ্গনা-কায়ার স্বরূপ যেন লেখক বারংবার অঙ্কন করেন রাজাকার আবদুল গনির সামনে উদ্ধত মাতৃমূর্তি খৈমনকে দাঁড় করিয়ে:

> "তখন খৈমন পুনরায় বারান্দায় এসে খাড়াইলে সে(রাজাকার আবদুল গনি) বলে, কিসের ফেলাগ উড়ান আপনে, বলেন কিসের ফেলাগ উড়ান, ফাইজলামি পাইছেন, রেজাকারগো লগে ফাইজলামি মারেন? তখন জরিমন ভয় পাইলেও কৈমনেরতো মাথা তাওয়ার মত গরম, সে আব্দুল গনির কথা শুনে ক্ষেপে, এক কথা বারে বারে ক্যালা জিগান?
>
> : উত্তর তো দেন না, কিসের পতাকা উড়ান – স্বাধীন বাংলার?
>
> খৈমন চুপ করে থাকে।
>
> : পাকিস্তানের?
>
> : পাকিস্তানের পতাকা উড়াই না আমরা।"[৫৪]

চাতুর্য ও সাহসিকতার বিরল সম্মিলনে শহীদুল জহির খৈমনকে তার সকল বিরুদ্ধ-বাস্তবতায় প্রতিবাদের প্রতীকে পরিণত করেন। যুদ্ধাবস্থায় শত্রুকে যুদ্ধের খেলায় পরাজিত করে খৈমন সমগ্র মুক্তির স্বভাব-চারিত্র্য তুলে ধরেন। পিতা, ভাই, স্বামীকে হারিয়ে স্বাধীনতা যে সবসময় যোদ্ধাকে প্রাপ্তিতে ভরিয়ে তোলে না, সত্যের সেই রূঢ়তা সম্পর্কে বাস্তব-যুক্তি-চালিত লেখক শহীদুল জহির ভোলেন না। ফলে খৈমন যুদ্ধ-শেষের ব্যক্তিগত বঞ্চনার রূপটিও প্রত্যক্ষ করে। পিতৃভিটের একটি অংশ হারিয়ে ফেলে জবর-দখলকারীদের কাছে:

> দেশ স্বাধীন হওয়ার পর খৈমনের যুদ্ধ জারি থাকে, মিসেস জোবেদা রহমানের স্বামী গোলাম রহমান বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মহল্লায় ফিরা আসে, কিন্তু খৈমনের কেউ ফেরে না, বরং তার বাপের বাড়েটার অর্ধেক স্বাধীনতার একমাসের মধ্যে বেদখল হয়া যায়, দক্ষিণমৈশুন্দি থেকে লম্বা চুলঅলা দুইজন লোক আসে এবং বলে যে, বাড়িটার অর্ধেক তাদের, ময়না মিঞার কাছ থেকে তারা এই বাড়ি কিনেছে, খৈমন বোঝে যে, হয়তো ময়না মিঞা বাড়ি লিখে দেওয়ার ব্যাপারে কাউকে কিছু বলেছিল, কিন্তু সে নিশ্চয়ই এই লোকদের কাছে বাড়ি বেচে নাই, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে খৈমনের কিচ্ছু করার থাকে না, এই পোলাপান দয়া করে বাড়ির অর্ধেকটা দখল করে, বাকি অর্ধেকটা খৈমন এবং জরিমনকে ছেড়ে দেয়:[৫৫]

উদ্ধৃতিটির নিম্নরেখ অংশটুকু পড়লেই মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের অবিন্যস্ত–নীতিচ্যুত একটি কালখণ্ডের দৃশ্য ভেসে ওঠে, নয় মাস যুদ্ধ করে শত্রুর কাছে অপরাজিত থেকেও নিজভূমে পরবাসের স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে কতো বাঙালি। মূলত বঞ্চনার এই ঐতিহাসিক সত্য-সূত্র অনুসরণ করেই লেখক পরবর্তী যুদ্ধের প্লট সাজান; যে স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে খৈমন সব হারিয়েও হয়ে উঠেছে আশাবাদী, স্বাধীনতার প্রতীকে লেখক খৈমনপুত্র চানমিঞার প্রতি ইঙ্গিত দেন এখানে, সেই স্বাধীনতারূপী পুত্রকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে খৈমনকে যুদ্ধ করতে হয়। এবার শত্রু তার বিরুদ্ধ-প্রতিবেশ ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা। ফলত খৈমনকে পুনরায় গাত্রশক্তি ও মেধাশক্তির পরিচয় রেখে চতুর হতে হয়। মিসেস জোবেদা রহমান বস্তুত খৈমনের এই চাতুর্যের জন্যই তাকে ঈর্ষার চোখে দেখে এবং তির্যক ভঙ্গিমায় তার বিষয়ে বর্ণনা করে: আবার নুরানি বিলকিস উপমা খৈমনের চাতুর্যে সর্বদা ডুবে থাকে এবং তাকে ভালোবাসে। চরিত্রের বিমিশ্র কৌণিকতায় উজ্জ্বল এই নারীই যুদ্ধকালে সদ্যোজাত পুত্রকে চতুরতার আশ্রয় নিয়ে শত্রুর আড়ালে রাখে, আবার সেই পুত্রের সকল দাবি মেটাবার উপায় হিসাবে বিভিন্ন মানুষের কাছে বিচিত্র গল্পের ফাঁদ পাতে। তন্মোধ্যে একটি গল্প হচ্ছে তার পুত্র চানমিঞা ও মহল্লার বান্দরদের সঙ্গে সম্পর্ক: যা শুনে "নুরানি বিলকিস কেমন আগ্রহ নিয়া তার দিকে তাকায়া থাকে, তার মুখে আবছা হাসি ছড়ায়া যায়, চোখে ঘোলা আলো জেগে ওঠে, সে খৈমনের

কথা গেলে, খায়, হয়তো কখনো বলে, গপ মারোচ? তখন খৈমন আকাশ থেকে পড়ে, তার মুখটা নির্লিপ্ত করে রেখে বলে, জীবনে না– গপ মারুম ক্যালা, হাচা কই: এবং তার মনে হয় যে, কিছু খসানোর এটাই উপযুক্ত সময় এবং সে যখন বলে, আফা পান নাই আপনের ঘরে? নুরানি বিলকিস উঠে যায়া পান নিয়া আসে, পানের বোঁটায় করে চুন আনে– নুরানি বিলকিসের এই গল্প পছন্দ হয়, বান্দরের সঙ্গে মানুষের আশ্চর্য ভালবাসার কথা সে শুনতে চায়!"[৫৬]

কাগজের ঠোঙ্গা বানিয়ে আর শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে চেয়েচিন্তে বেঁচে থাকার পরও খৈমন বড়ো স্বপ্ন দেখা ছাড়ে না। পুত্রকে শিক্ষিত করে এক সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করতে চায়। কিন্তু স্বাধীনতার যে শক্তি দুর্বল প্রতিবেশে প্রতিপালিত হয় তার নিগড় ভেঙে সেই শক্তি নিজেকে নিজের মতো করে বিকশিত করে, কিন্তু সেটি হয় ঈষৎ অপরিমার্জিত। ফলত চানমিঞাকে দুর্বল মাতৃশক্তি আর অপমানসূচক স্কুলের পরিবেশ ধরে রাখতে পারে না। নিজের মেধা দিয়ে সে বিকশিত হয় গাড়িচোর হিসেবে। ভিন্নভাষায় বলা যায়, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বুর্জোয়া অর্থনীতি ও সমাজনীতির বেড়াজালে আটকা পড়ে বঞ্চিত শ্রেণির উত্তরাধিকার চানমিঞা কোনো আশার পথ দেখতে পায় না। বিকৃত বিকাশের দিকে এগিয়ে যায় সে। পুরাণ ঢাকার ঐতিহ্যবাহী এবং বিলুপ্তপ্রায় প্রাণির সঙ্গে এদের কোনো শ্রেণিগত পার্থক্য থাকে না বিধায় 'বান্দরশ্রেণি'ই আপন হয়ে ওঠে চানমিঞা আর খৈমনের।

মুক্তিযুদ্ধকালে সকল শকুনির চোখ ফাঁকি দিয়ে কর্ণের মতো লুকোনো পাত্রে, কার্তিকের মতো কৃতিত্তকারূপী কাপড়ের পোঁটলায় যার জন্ম, স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে যার মহিমাবর্ণিল আবির্ভাব, উত্তরকালে বীরের মতোই যার সমুন্নতি, জাতীয়-আন্তর্জাতিক শত্রুবেষ্টিত উত্তরকালীন বাংলাদেশে তার বিকাশ প্রতিনায়কের খোলসে। ফলে ভদ্রস্থ কোনো মানবের তুলনায় মহল্লার 'বান্দর'গুলাই তার বেশি আপন হয়ে ওঠে:

> ভূতের গল্পির বান্দরগুলা চানমিঞার দিকে নজর দিয়াই রাখে, ঢাকা শহরের এই বান্দরগুলার সংবেদনশীলতা হয়তো মানুষের মতো হয়া ওঠে, হয়তো ঠিক মানুষের মত না– কারণ, মানুষের সংবেদনশীলতার বিষয়টাই হয়তো একটা মিথ– তথাপি এই বান্দরেরা হয়তো বুঝতে পারে যে, পোলাটার কেউ নাই, বাপ/ভাই নাই, মামা/চাচা নাই, নানা/নানি, দাদা/দাদি, কিচ্ছু নাই, ফলে ধূসর বান্দরনিটার বাচ্চার সঙ্গে সে খেলা করে বড় হয়– মানুষের একটা বাচ্চা, বান্দরের একটা বাচ্চার সঙ্গে খেলাধূলা করে বড় হয়া উঠতেই পারে।[৫৭]

বানর আর মানুষের এই যে জীবন-পরিকল্পনা লেখক ভাবলেন বা বর্ণনা করলেন, তাতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো ক্ষমতাকাঠামোর কেন্দ্র থেকে তারা কত দূরে অবস্থান করছে এবং বান্দরবাহিনীর প্রধান হয়ে উঠার ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা চানমিঞার পক্ষে কতোটা সম্ভব; এবং চানমিঞা তা-ই হয়:

> "চানমিঞার বান্দর বন্ধুরা তার পিছনে লেগে থাকে, তার প্রথম বান্দর বন্ধু তার কাচ্চাবাচ্চা এবং স্ত্রীদের নিয়া যখনতখন আসে, এবং খৈমন যখন ঘরে থাকে না তখন এই বান্দর বান্দরনিরা এবং তাদের পোলাপান তার ঘর ভরে ফেলে গ্যাঞ্জাম করে, চানমিঞা তার বান্দর মেহমানদের সঙ্গে হৈহৈরৈরৈ করে কাটায়; খৈমন হয়তো পোলাকে বকে, বান্দরের লগে থাইকা বান্দর হয়া গেতাছচ... হয়তো চানমিঞাকে মাইর লাগানোরও হুমকি দেয়, বলে, ঘরের ভিতরে বান্দর লয়া ফালাফালি করলে মাইরা তরে ফাটামু, কিন্তু বান্দরেরাই চানমিঞার বড় বন্ধু হয়া খাড়ায়, মাইরা ফাটানোর কথা বলায় বুড়া হুলাটা এসে খৈমনকে ভেংচি দিয়া ভয় দেখায়; তিন/চাইর/পাঁচ কিংবা দশ প্রজন্মের পঞ্চাইশটা বান্দর তার খেলার সাথী হয়া পড়ে এবং এই সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ে।"[৫৮]

গাড়ির গ্যারেজে কাজ করতে গিয়ে সে প্রেমে পড়ে যায় গাড়ি চালানোর, বিনা নোটিশে যে কোনো গাড়ি চালানো তার পক্ষে আনন্দের কাজ বলে প্রতিভাত হয়। এবং একদিন অনভিপ্রেতভাবে পুলিশ সার্জেন্ট রফিকের কাছে ধরা পড়লে রফিকই তাকে দিয়ে গাড়িটি চোরাই মাল হিসেবে বিক্রি করায়। স্বাধীনতা-পরবর্তী নৈতিক অবক্ষয়ের স্রোত আইনের সেবকদের দ্বারা কী রকম প্ররোচনা পেয়েছে, শহীদুল জহির সেদিকেই দৃষ্টি দেন চানমিঞার বিপথগামিতার এই কাহিনিখণ্ডে:

> সার্জেন্ট (রফিক) ধুরন্ধর প্রাণী, চানমিঞার সঙ্গে কথা বলে সে অবাক হয়, এইটা কোনখানকার চিড়িয়া, সে ভাবে এবং বলে, এই কাম যখন করই গাড়ি ফালায়া দিয়া যাও কেন? অরা খাইলেতো বাঁচবা না– তুমিতো ধরা পড়ছো, এখনতো জেলে যাইবা– অফেন্স এহেনস্ট প্রপার্টি, থেফ্‌ট, পেনাল কোডের ধারা ৩৭৮; ... তখন সার্জেন্ট রফিকের এই পোলাটার জন্য মায়া হয়, সে তার কান্ধের উপরে একটা হাত রাখে এবং চানমিঞা টয়োটা মার্ক টু গাড়িটার দরজা পুনরায় লোহার তার ঢুকায়া খুলে লম্বা ট্রিপ মেরে টঙ্গি যায়, গাজিপুর চৌরাস্তার পিছনে 'বসুমতি মোটর গেরেজ'-এর মালিক আরফান আলির কাছে গাড়ি এবং সার্জেন্টের লেখা একটা চিরকুট পৌঁছায়া দিলে, আরফান আলি তাকে বলে, বিক্রি হইলে তুমি পঞ্চাশ পাইবা।'
>
> : পঞ্চাশ কি?
>
> : হাজার।
>
> চানমিঞা গাড়ি চোরে পরিণত হয়[৫৯]

চোরে পরিণত হলেও তার নায়কত্বের অভিনবত্বে ভাঁটা পড়ে না। জুলির প্রেমের প্রকাশ ঘটে তার প্রতি। কিন্তু চানমিঞার অনুভবের মুখ খোলে না তাতে। এক্ষেত্রে শহীদুল জহির ভিন্ন একটি পদ্ধতির আশ্রয় নেন। সমান্তরালভাবে দুটি গল্পের প্রয়োগে জুলি-চানমিঞার ইতিবৃত্ত পূর্ণ করেন। জুলির পূর্বপুরুষ ডি সুজা এবং বিদ্যুন্মালার প্রেমকাহিনি এবং লাতিন লেখক গ্যাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের 'ইন্নোসেন্ট ইরিন্দিরা এন্ড আদার স্টোরিজ' গল্পগ্রন্থের 'ডেথ কন্সটান্ট বিয়ন্ড লাভ' নামক গল্পের প্রেম-প্রতীক্ষার বৃত্তান্ত যুক্ত করে জহির জুলি ও চানমিঞার প্রেমের আখ্যান তৈরি করেন। ফলত জুলি ক্লার্ক মার্কেজের গল্পের মতো চান মিঞার জন্য নিজেকে রক্ষা করতে চায়, কস্তার সঙ্গে বিবাহ পাকা হলেও সে চানমিঞার সঙ্গে বাইরে থেকে আসে দুইদিন এবং চেস্টিটি বেল্ট পরে চাবি রেখে আসে চানমিঞার কাছে। মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও সে চানমিঞার দেয়া চাম্পা কলা ভক্ষণ করে এবং চানামিঞাকে কোনোভাবে লাভ করতে না পারলে ঠাকুরমা লাবণ্যপ্রভার নিজের নানারি জীবনের প্রতি ইঙ্গি দেয়। এতে জীবনসংগ্রামী মেরি জয়েস দুঃখ পায় কিন্তু কিছুই করার থাকে না তার:

> সে (জুলি) এসে বিছানার পাশে বসে এবং বলে, আমার কিছু করার নাই মা, আই ক্যানট ম্যারি কস্তা।
>
> : বাট হোয়াই? হোয়াই আর ইউ ডুয়িং দিস !
>
> জুলি তার মায়ের একটা হাত টেনে নিয়া তার কোমরে স্থাপন করে, মিসেস মেরি জয়েস জুলির লং স্কার্টের উপর দিয়া একটা মাঝারি আকারের প্যাড লকের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে, তার আতঙ্ক দেখা দেয়, কি এটা?
>
> : চেস্টিটি বেল্ট!
>
> : হোয়াট ডু ইউ সে?
>
> জুলি বলে, আমি এই অবস্থায় কস্তাকে বিয়া করতে পারি না, আই ওয়ান্ট টু বিকাম এ নান মম!
>
> : লকের চাবি কোথায়?
>
> : চানমিঞার কাছে!
>
> তখন মিসেস ক্লার্ক কান্দে – ও মাই গড, ইউ আর ওনলি পানিশিং মি, ঠিক আছে চানমিঞা আসুক – তার বুড়া ক্লান্ত গালের উপর দিয়া তপ্ত অশ্রু গড়ায়া পড়ে[৬০]

অথচ আবাল্য জুলির প্রেমে মশগুল থেকে মামুন আশায় পথ চেয়ে রয়, একটু ছুঁতে চায় জুলিকে; কিন্তু জুলি তন্ময় হয়ে থাকে 'মাঙ্কিবয়' চানমিঞাতে। স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম প্রজন্মের এই গল্প লেখক শুধু প্রেমাখ্যান রচনার জন্য বাছাই করেননি; জীবন যাত্রার বিবিধ রূপ উদ্ঘাটনে তিনি এদের জীবনের বিস্তারকে তাড়া করে ফিরেছেন। তাদের জীবনের মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতা গভীরভাবে

ক্রিয়মাণ। পিতা হারিয়ে, মায়ের স্বল্প উপার্জনে জীবনের নানাবিধ চাহিদা-পূরণসাপেক্ষে বিয়ে করে দেশান্তরী হয়ে যাওয়া যেমন জুলির সামনে একমাত্র বাস্তবতা, তেমনি পরিবারের সকল সুবিধাভোগী মামুনের ব্যাংকার হওয়াটাও তৎকালীন বাংলাদেশের জীবনবাস্তবতার প্রমাণ; অন্যদিকে সামগ্রিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত মাঙ্কিবয়' চানমিঞার পক্ষে মায়ের স্বপ্ন পূরণ করে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার স্বপ্ন দেখাটা যেমন দুঃসাধ্য তেমনি পরিচয় হারিয়ে অন্যের পারিচয়ে বড় হওয়া খরকোসের পক্ষেও অসম্ভব একটি মিথ্যা পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা, যদিও সাহস, অর্থ ও চাতুর্যের মানদণ্ডে তার যোগ্যতা কোনো অংশেই কম নয়।

স্বাধীনতা-পরবর্তী তিন দশকে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বৈদেশিক আগ্রাসনের যে কালো ছাপ পড়েছে, নব্বইয়ের পর থেকে যেটা খেলায় পরিণত হয়েছে, লেখক সেই অবক্ষয়ের পটভূমিকায় তাঁর উপন্যাসের কাহিনি শেষ করেছেন। যেখানে দেশের মানুষ নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে চুরির মতো অপরাধে জড়িয়ে যায় এবং সেই চুরিতে বিদেশিদের গাড়ি জড়িয়ে পড়লে দেশের মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়:

> "রমনা থানা থেকে দ্রুত পুলিশ এসে হাজির হয়, সিআইপি কাম ফরেন ইনভেস্টারের কেস, দেশের ভাবমূর্তির প্রশ্ন, এদের সিকিউরিটি দিতে না পারলে বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ আসবে না, চীন কিংবা ভিয়েতনামে চলে যাবে, সাংঘাতিক ব্যাপার, ফলে কোনো উপায় নাই, গাফিলতি হলে হয়তো হোম মিনিস্টার স্বয়ং গোয়া দিয়া বাম্বু ঢুকায়া দেবে"[৬১]

প্রতীকী আয়োজনে শহীদুল জহির গান্ডিব বহতা এবং ঘাসির নামে দুইজন বিদেশি চরিত্র নিয়ে আসেন, যারা বাঙালিকে বিভিন্ন ব্যবসার ফাঁদে ফেলে নিজেদের স্বার্থ কায়েম করতে চায়। এক ভুলে যাওয়া উপনিবেশকারীর পুরনো কণ্ঠ তাদের বাক্যমালায় বেজে ওঠে:

> তখন গান্ডিব বহতাকে হয়তো ঘাসির বিন আহরাম তার সাদা বিএমডাব্লু-তে করে লিফট দেয়– আসো চানস যখন পাওয়া গেছে, পৌঁছায়া দেই – এবং ঘাসিরের খুব মজা লাগে, সে বলে, সো নট অনলি চিপ লেবার বাট দে অলসো হ্যাভ কার থিভস!
>
> : ইয়েস, একচুয়েলি উই ফরগট এবাইট ওয়ান ক্লাস, হু উড প্রবাবলি নট বি টোটালি আন্ডার আওয়ার কন্ট্রোল!
>
> : হু, কার থিভস?
>
> : ইযেস, উই আর ফরেন ইনভেসআরস, হাউ ডেয়ার দে স্টিল আওয়ার প্রপার্টি?[৬২]

বরং তারাই নতুন ব্যবসার নামে, বিনিয়োগের নামে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংরাদেশের সংস্কৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি, কায়িক-মানসিক শ্রম ও বাঙালি নারীদের সৌন্দর্য লুটে নেবার উদ্দেশ্যে উত্তর-উপনিবেশের ফাঁদ তৈরি করে:

:এই দেশের লোকেরা বলে যে, দে হ্যাভ দা চিপেস্ট লেবার ইন দা ওয়ার্ল্ড!

: প্রোবাবলি, নো প্রবলেম, উই উইল ইউজ দেম, এন্ড দে উইল মেক মানি।

: দে আর দা চিপেস্ট, ইয়েস, উই উইল গিভ দেম ওয়ার্ক, এন্ড দে উইল সিং টু আস!

: দেয়ার উইমেন উইল !

তখন টেলিভিশনে গান্ডিব বহতার 'মুরগি তোমার আন্ডার খোঁজে' প্রোগ্রামের কথা তাদের মনে পড়ে ...

তখন এন্ড্রু এল বাউটপের মনে হয় যে, এই দেশে গভার্নেন্স একটা সমস্যা, গুড গভার্নেন্সের খুব অভাব, সে বলে যে, এইটা নিয়ো কিছু করা যায় না?

: যাবে না কেন? আমরা বলতে পারি যে, তোমরা নেজামত চালাও, আমাদের দেওয়ানিটা দিয়া দেও, আমরা চালাই, টাটা আসতেছে, ধাবি গ্রুপ আসতেছে, ভাই এটা ফ্রি মার্কেট ইকোনমি![৬৩]

উদার মানবতাবাদের যুগে উদার অর্থনীতির উছিলায় নবযুগের উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার প্রকৃত স্বরূপটি শহীদুল জহির এই অনুপ্রবেশকারী চরিত্রগুলোর চিন্তা-কর্মের প্রকৃতির মাধ্যমে তুলে ধরে সমকালের শেষপ্রান্তটি ছুঁয়েছেন। আখ্যানের কাল-ক্যানভাসের বিস্তৃতি এভাবেই ঘটেছে এই উপন্যাসে এবং লেখক সেখানে সফল হয়েছেন বলে মন্তব্য করা যায়।

তবে শহীদুল জহিরের যে বিষয়টি অন্তত এই উপন্যাসে প্রকটদৃষ্ট, তা হচ্ছে এর ভাষাবৈশিষ্ট্য। প্রমিত বাংলা থেকে দূরবর্তী এর বর্ণনভাষা। চরিত্রের ভৌগোলিক অভিজ্ঞান হিসেবে, কালগত দূরত্বের স্বাক্ষর হিসেবে চরিত্রের মুখের ভাষা লেখক বিশ্বাসযোগ্য করে গড়েছেন, কিন্তু বর্ণনার মূলভাষ্যে প্রমিত বন্ধনে আটকে থাকেননি। 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাস থেকে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হওয়া এই লেখকের বর্ণনার ভাষা ধীরে ধীরে প্রমিতের বন্ধন ছিন্ন করে, যোগাযোগ-সক্ষম মুখের ভাষার একটি বর্ণনসূত্র তৈরি করেছে, যা বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বিরলদৃষ্ট। হুতোমী বাংলার ঐতিহ্য আর বাংলাদেশের অন্যান্য গুণী সাহিত্যিকদের উদাহরণ মনে রেখেও বলা যায় শহীদুল জহিরের এই প্রচেষ্টা ব্যতিক্রমিতায় উৎকীর্ণ। ভাষায় অংশগ্রহণের সুবিধা নিয়েই জহির বর্ণনভাষ্যে অভিনবত্ব

আনতে সচেষ্ট ছিলেন[৬৪]; তিনি জানতেন ভাষার প্রবহমানতাসূত্রে ভাষা পরিবর্তনশীল, তিনি সমকালের সবচেয়ে উত্তম যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষার যে রূপটি প্রচলিত দেখেছেন সেটিকেই গ্রহণ করেছেন।

ফলত, কথ্যমিশ্রিত টানা গদ্যে তিনি গল্প বয়ান করেছেন, কোনোরকম রাখঢাক ছাড়াই। অন্তত, 'মুখের দিকে দেখি' উপন্যাসের গদ্য সেটিই প্রমাণ করে:

> "তখন আসল অথবা নকল মামুনকে খুঁজে বের করা জরুরি হয়া পড়ে; তারা টিপু সূলতান রোডের মাথায় খ্রিষ্টানদের করস্থানের কাছে পোলাপানদের পায়, এই বালকেরা ভাঙ্গা খাপড়া এবং টেনিস বল দিয়া 'সাতখাপরা' খেলায় ব্যস্ত ছিল, গায়ে ছুঁড়ে দেওয়া বল লাগার ভয়ে মামুন হয়তো লুকায়া ছিল কাছেই, সহসা সে বের হয়া আসে এবং তার বাপের কবলে পড়ে।"[৬৫]

উদ্ধৃতাংশের রেখা-চিহ্নিত ক্রিয়াপদগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোধগম্য হয় যে, প্রমিত শোভনতা থেকে রূপগতভাবে এ-ভাষা কতোখানি সরে এসেছে মূল থেকে। উপরন্তু এই ভঙ্গিমায় লেখক স্বাধীন-গতি তৈরি করেন বর্ণনাকালে, ভাষার বন্ধনের কোনো বালাই না থাকলে গল্পের বর্ণনগতি বৃদ্ধি পায়। ভাষার এই স্বাধীন ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি গল্পের ভিন্ন ভিন্ন সম্ভাবনা তৈরি করেন। স্বাধীন ক্রিয়ারূপের মতো তিনি প্রয়োজনে প্রচুর সংযোজক-বিয়োজক অব্যয় পদ ব্যবহার করে বাক্য গঠন করেন। ফলে বাক্যে নির্দিষ্ট কোনো কর্তা বা ক্রিয়া পাওয়া যায় না। অনির্দিষ্টতার সুযোগে লেখক একই বাক্যে আখ্যানের স্থান-কাল ও চরিত্রের ঐক্য ভেঙে দেন, বস্তুত এই পদ্ধতিতে তিনি সময়ের স্তর অতিক্রম করে একই সঙ্গে দুই বা ততোধিক কালসীমাকে এগিয়ে নিয়ে চলেন এবং একই সঙ্গে দুইটি ঘটনার পাত্র-পাত্রীদের হালহকিকত জানান।[৬৬] সমান গতিতে পাঠক অতীত-বর্তমান ভবিষ্যৎকে অবলোকন করেন এবং চরিত্রসমূহের গতিপ্রকৃতির আদ্যোপান্ত অবগত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

তথ্যনির্দেশ:

১. জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা : শহীদুল জহির নির্বাচিত উপন্যাস, সমাবেশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭; পৃষ্ঠা – ১১

২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১২

৩. প্রাগুক্ত

৪. সালাহউদ্দিন আহমেদ; সূত্র: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (সম্পাদিত) শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ২২৭ ।

৫. জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা : প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১২

৬. প্রাগুক্ত

৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১৫

৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১৬

৯. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫১

১০. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫১-৫২

১১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫২

১২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৩৯

১৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১৮

১৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১২

১৫. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৩০

১৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ২৫ ও ৪১

১৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৩৫

১৮. "একটি ব্যর্থ প্রণয়ের বিষণ্নতা এবং যৌবনে লালিত রাজনৈতিক আদর্শ অর্জনের পথ থেকে সরে আসার গ্লানিবোধ তার ছিল।" –আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯; পৃষ্ঠা – ১৫

১৯. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১৬

২০. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১৫

২১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ২২

২২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৪২

২৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৪২-৪৩

২৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৪৩

২৫. প্রাগুক্ত

২৬. প্রাগুক্ত

২৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫৪

২৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫৩

২৯. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১৬

৩০. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫২

৩১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫৬

৩২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৬৩

৩৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১২

৩৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫০

৩৫. সে রাতে পূর্ণিমা ছিল : শহীদুল জহির নির্বাচিত উপন্যাস, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭; পৃষ্ঠা – ৫৩

৩৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫৪

৩৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫৫

৩৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৮৩

৩৯. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৮৪

৪০. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১১৬

৪১. সুহাসিনীর লোকেরা বলে যে, মফিজুদ্দিন মিয়ার এরকম ইচ্ছা ছিল যে, তার ছেলেদের ভেতর একজনকে সে মাদ্রাসায় পড়াবে, যাতে করে একটি ছেলে পরিবারে ধর্মকর্ম চালু রাখতে পারে, এজন্য নাসিরউদ্দিনকে সে শিশুকাল থেকে নির্বাচিত করে রাখে এবং সুহাসিনীর লোকদের এই কথাটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে একাধিকবার অবহিত করে বলে, নাসিরউদ্দিনকে আমি আল্লাহ্‌র নামে মাদ্রাসায় দিমু; প্রাগুক্ত।

৪২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১১৮

৪৩. উপন্যাসটির মূল চরিত্র মফিজুদ্দিন-এ কেউ শেখ মুজিবের ছায়ারূপ লক্ষ করতে চান। চাইলে ভুল করবে। – শহীদুল জহির, কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার। সূত্র: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (সম্পাদিত) শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫৭৭ ।

৪৪. প্রাসঙ্গিকভাবে মন্তব্য করা যায় যে, ভাষার খেলায় শহীদুল জহির সর্বশেষ 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' তেই হাত পাকানো শুরু করেছিলেন, যার খোলামুখ যাত্রাপ্রবাহ সুস্পষ্টতা লাভ করে তাঁর শেষ উপন্যাস 'মুখের দিকে দেখি' এবং গল্পগ্রন্থ 'ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প'-এর গল্পসমূহে।

৪৫. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫৭

৪৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১২৯

৪৭. উপন্যাসটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঔপন্যাসিক ধরতে চেয়েছিলেন সংখ্যালঘুদের সমস্যা, দেশ ত্যাগের কষ্ট, কিন্তু... তার প্রয়োজন ছিল আরো ব্যাপ্তি, কাহিনীর আরো প্রসারণ, ঘটনার আরো ধীর লয়। – সালমা বাণী। সূত্র: মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (সম্পাদিত) শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৩৩৮ ।

৪৮. মুখের দিকে দেখি: মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬। পৃষ্ঠা – ৭২

৪৯. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৭২-৭৩

৫০. মুখবন্ধ: মুখের দিকে দেখি; প্রাগুক্ত

৫১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১৩৯

৫২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১৪১

৫৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৯

৫৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৬১

৫৫. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৭৪

৫৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৭৫

৫৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৭৫-৭৬

৫৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৭৭

৫৯. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৯৪

৬০. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১৪১

৬১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১৩৫

৬২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১৩৫

৬৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ১২৯-১৩০

৬৪. আমি আগেই বলেছি, প্রয়োজন মনে করলে ভাষায় অংশগ্রহণের অধিকার আমার আছে। এটাকে আমি বলতে চাই, রাইট টু পার্টিসিপেট। এটা প্রপাগান্ডার বিষয় না, এটা প্রয়োজনীয়তার বিষয়। এখন কথা জচ্ছে এই রাইট টু পার্টিসিপেশনের কারণে ভাষা বদলায়া যাইতে থাকলে কী হবে? ভাষা পরিবর্তন হওয়া দরকার, নাকি দরকার নাই? ঋাষা তো নিশচয়ই চিরস্থায়ী আসমানি কোন ব্যাপার না, আমার জীবনের অভিজ্ঞতা, জীবনযাপন পদ্ধতি, আচরণ, কাজ এবং অকাজ, সংস্কার এবং কুসংস্কার, আমার বুলি এবং গালি আমার ভাষায় আসবে না? গল্প লিখিয়ে হিসাবে আমার মনে হয়েছে আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ভাষা রক্তাপ্লতায় আক্রান্ত এবং জীর্ণ হয়া গেছে। ভাষার এই প্রবাহে নতুন পরিসঞ্চালন লাগবে। আমি কথাসাহিত্যের শুধু সংলাপ না, টেক্সটের ক্ষেত্রেও নতুন বাক্য বিন্যাস এবং ভাষা প্রয়োগ করতে চাচ্ছি। – শহীদুল জহির, কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার। সূত্রঃ মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (সম্পাদিত) শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫৭২ ।

৬৫. মুখের দিকে দেখি; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৪৬

৬৬. আমি একটা সিঙ্গেল পিকচার প্রেজেন্ট করতে চাই না। এই যে বারবার একই ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়, এতে কিন্তু ঘটনাটি একটু একটু করে ডেভেলপ করে। মানে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলেও প্রতিবারই ঘটনার খানিকটা অগ্রগতি ঘটে। আমি একেবারে পুরোটা না বলে দিয়ে বারবার বলি, একই ফ্রেমে না বলে একাধিক ফ্রেমে বলি। এতে... পাঠকের ওপর কিছুটা প্রেশার ক্রিয়েট করা হয়।... আমার মনে হয় এই পদ্ধতির এই এক সুবিধা – টাইম ফ্রেমকে ভেঙে দেয়া যায়। –শহীদুল জহিরঃ আহমাদ মোস্তাফা কামাল কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার। সূত্রঃ মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (সম্পাদিত) শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ; প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা – ৫৯৬ ।

উপসংহার

প্রায় আড়াই দশকের সাহিত্যিকজীবনে (১৯৮৫-২০০৮) শহীদুল জহির নিজের শিল্পীসত্তার বিবর্তনের মাধ্যমে একটি পরিভ্রমণ সমাপ্ত করেছেন; আকস্মিক মৃত্যু তাঁর সেই যাত্রাকে হঠাৎ থামিয়ে দিয়েছে বটে, তবে মৃত্যুপূর্বেই বিকাশের যে ভবিষ্যৎপথ নির্দেশ করেছিলেন নিজের তাতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো তিনটি বিষয়:

ক) মহান মুক্তিযুদ্ধ: প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি

খ) প্রান্তিক মানুষের জীবন

গ) বর্ণনার ভাষাগত বিবর্তন ও নতুন ভাষ্যরূপের সন্ধান ।

বাঙালি জাতির জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং অর্জিত স্বাধীনতা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকায় শহীদুল জহির অত্যন্ত বিশ্বসযোগ্য বয়ানে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা সম্পৃক্ত করেছেন তাঁর বিভিন্ন গল্পে ও উপন্যাসে; তবে শুধুই সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য তিনি যুদ্ধের কাহিনি-সম্পৃক্ত আখ্যান রচনা করেননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো সেই যুদ্ধের ভেতর সঙ্কটাপন্ন বাঙালির অসীম সাহসিকতার পরিচয় প্রদান এবং তাদের অপরাজেয় জীবনরূপ অঙ্কন। এই অপরাজেয় ভাবটিকে তিনি লালন করেছেন অন্যান্য সকল আখ্যান-উপাখ্যানে।সাহসী-বুনিয়াদে উপস্থাপন করে লেখক বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের সাহসের পরীক্ষা করেছেন। ফলত তাঁর চরিত্রগুলো সংগ্রামী – আপন অস্তিত্বের পাশাপাশি বিপদাপন্ন অন্য যে কারোর পাশে দাঁড়িয়ে তাকে উদ্ধার করতে সতত সচেতন। আর্থ-সামাজিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাকাঠামোতে তাদের অবস্থান কেন্দ্রীয় বা প্রান্তিক যা-ই হোক না কেন, মানবিক মমত্ববোধ তাঁর চরিত্রগুলোর মধ্যে সর্বদা ক্রিয়াশীল। বিশেষত প্রান্তবর্গীয় মানুষের অসামান্য সাহসিকতাপূর্ণ জীবনসংগ্রাম ও বেঁচে থাকার কৃৎ-কৌশল তিনি অনন্য দক্ষতায় অঙ্কন করেছেন। তাঁর দক্ষতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে তোরাপ সেখ, আবদুল করিম, নবাব, মোহাব্বত আলী জাদুগির, আকালু, টেপি, আবদুল মজিদ, বদু মাওলানা, মোহাম্মদ সেলিম, আসমান তারা হুরে জান্নাত, আবু ইব্রাহীম, মফিজুদ্দিন, মোল্লা নাসরউদ্দিন প্রভৃতি চরিত্র। কেন্দ্র-প্রান্তের দ্বন্দ্ব প্রদর্শনে নিজের সৃষ্টিমালায় এতাগুলো চরিত্রের ফুল গাঁথতে পারেননি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ব্যতীত অন্য কোনো বাংলাদেশ-পর্বের কথাশিল্পী। চরিত্রের পাশাপাশি বাংলাদেশের তিনটি ভৌগোলিক পরিসীমার (পুরান ঢাকা–সিরাজগঞ্জ ও চট্টগ্রামের সাতকানিয়া অঞ্চল) ভাষা-সংস্কৃতিও তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে স্বীয় রচনাকর্মে তুলে এনেছেন; যা তাঁর অসাধারণ পারঙ্গমতার অনন্য নিদর্শন।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে পরিবর্তমান বাংলাদেশে জীবনমানে যেমন ক্রমপরিবর্তন দৃশ্যমান হয়েছে, তেমনি ধীরে ধীরে শহীদুল জহিরের ভাষাদর্শনও বদলেছে; শুরুর দিকের বর্ণনভাষা শেষদিকে এসে আমূল রূপান্তরের দিকে এগিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত প্রমিত বাংলার বন্ধন ছিন্ন করে তিনি বাংলাদেশের মানুষের আঞ্চলিকতাদুষ্ট শব্দাবলিকে বর্ণনার ভাষায় প্রযুক্ত করেছেন। তাতে গড়ে উঠেছে তাঁর নিজস্ব বর্ণনা-শৈলী। উত্তরাধুনিক যুগের ঐতিহ্যপ্রীতি কিংবা উদারনৈতিক দর্শন, যা-ই হোক না কেন, লেখককে নিজের ভাষাবৈশিষ্ট্য অন্বেষণে প্ররোচিত করেছে; বিশেষত, তাঁর দ্বিতীয় পর্বের রচনাসমূহে এইসব ভাষিক লক্ষণ সুস্পষ্ট।

বিষয়ের অভিনবত্বে আর ভাষার চমৎকারিত্বে শহীদুল জহির যেসব আখ্যান রচনা করেছেন, সেসব বাংলা কথাসাহিত্যের অসামান্য সম্পদ। নতুন যুগের লেখকগণ হয়তো তাঁর এই এগিয়ে রাখা পথ থেকে যাত্রা শুরু করে এর অগ্রযাত্রাকে সাফল্যের সঙ্গে আরো সুদূর ভবিষ্যতে পরিচালিত করবে, তিনি থাকবেন পথপ্রদর্শকের ভূমিকায়, যে পথের সন্ধান শহীদুল জহির উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করেছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কাছ থেকে। এক্ষেত্রে শহীদুল জহির ব্যতিক্রম এখানে যে, তিনি শুধু দেশীয় পূর্বসূরিদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি, বিশ্বসাহিত্য-পাঠের অভিজ্ঞতা তাঁকে অনুবর্তী করেছিলো ইয়োরোপ-লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন স্বনামধন্য শিল্পী-সাহিত্যিক-দার্শনিকেরও। ফলত, বিষয় নির্ধারণ, কাহিনির আয়োজন ও প্রকরণ নির্বাচনে তিনি হয়ে উঠেছেন বিশ্বাভিসারী।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে যে আন্তর্জতিকতাবাদ প্রথমবারের মতো ধ্বনিত হয়েছিলো, শহীদুল জহিরের সৃজনকর্মে তা সংহত রূপ লাভ করেছে। উত্তরপ্রজন্ম তাঁর অর্জিত সেই সংহতি থেকে নবতর যাত্রায় অভিষিক্ত হবে, সেই যাত্রাপথের পাথেয় অন্বেষণই বক্ষ্যমান অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য। অকালপ্রয়াত এই অসামান্য কথাকারের রচনাকর্ম বাংলাসাহিত্যাকাশের অগণন তারকাদীপে স্বতন্ত্র বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল হয়ে থাক, দিক-নির্দেশী ভূমিকা পালনে হয়ে উঠুক নিয়ত অম্লান।

<u>গ্রন্থপঞ্জি</u>

গল্পগ্রন্থ:

পারাপার	: মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৮৫
ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প	: শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯
ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প	: মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৪
শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প	: পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৬

উপন্যাস:

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা	:হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
	: শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪
আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু	: প্রথম প্রকাশ 'নিপুণ' জুন ১৯৯১
	: মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৯
সে রাতে পূর্ণিমা ছিল	: শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫
মুখের দিকে দেখি	: মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৬
শহীদুল জহির নির্বাচিত উপন্যাস	: পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৭

সহায়ক গ্রন্থাবলি

অলোক রায় (সম্পাদিত) : সাহিত্যকোষ: কথাসাহিত্য, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০১০ (প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৬৭)

আফজালুল বাসার (অনূদিত) : ভিটগেনস্টাইনের ট্রাকটেটাস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০০১

আবু জাফর : সাহিত্যে সমাজ ভাবনা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৯৫

আলব্যের কামু : দ্য মিথ অব সিসিফাস (মনোজ চাকলাদার অনূদিত), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৪

কবীর চৌধুরী : সাহিত্য-কোষ, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০০৫

কুন্তল চট্টোপাধ্যায় : সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, কলকাতা, চতুর্থ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, অষ্টম মুদ্রণ: মে ২০১১

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস : সরলা এরেন্দিরা ও অন্যান্য গল্প (সালেহা চৌধুরী অনূদিত), সন্দেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০০৪

গিয়াস শামীম : বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০২

চঞ্চলকুমার বোস : বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০০৯

চিরঞ্জীব শূর (সংকলক) : প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনা, আলোচনা চক্র, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৬

দেবেশ রায় : উপন্যাস নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৩ (প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৯১)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : ছোটগল্পের সীমারেখা, বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৯৪

ফয়েজ আলম : উত্তর-উপনিবেশী মন, সংবেদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: মে ২০০৬

বিপ্লব মাজী : পোস্টমডার্নিজম: সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জুন ২০০৬

বিশ্বজিৎ ঘোষ : বাংলাদেশের সাহিত্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৯১

মহীবুল অজিজ : বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ২০০২

মো. আব্দুল মুহিত, ড. : ভাষা দর্শন, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১২

মো.মুস্তাফিজুর রহমান : বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন ২০০৯

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (সম্পাদিত) : শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১০

মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন : বাংলাদেশের ছোটগল্প: জীবন ও সমাজ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৯৭

রফিকউল্লাহ খান : শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০০

রাজীব হুমায়ুন : সমাজভাষাবিজ্ঞান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০১

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : ন্যারেটলজি: ছোটোগল্প: ছোটোদের গল্প, কোরক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪

র‍্যালফ ফক্স : উপন্যাস ও জনগণ (বদিউর রহমান অনূদিত), প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৫

শরীফ হারুন (অনূদিত) : জ্যাঁ-পল সার্তের অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

সাঈদ-উর-রহমান (সম্পাদিত) : বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০০৩

সালাহউদ্দিন আইয়ুব : আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৯৪

সিডনি শনবার্গ : ডেটলাইন বাংলাদেশ: নাইন্টিন সেভেন্টিওয়ান (মফিদুল হক অনূদিত), সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৯৫

সৌমিত্র শেখর, ড. : কথাশিল্প অন্বেষণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৬

সহায়ক জার্নাল/ লিটল ম্যাগাজিন

লোক (শহীদুল জহির সংখ্যা) : অনিকেত শামীম (সম্পাদিত), ৯ম বর্ষ : সংখ্যা ১২। ডিসেম্বর ২০০৮

শালুক (শহীদুল জহির বিশেষ সংখ্যা) : ওবায়েদ আকাশ (সম্পাদিত) ৯ম বর্ষ: সংখ্যা ১০। সেপ্টেম্বর ২০০৮